হেমচন্দ্র

"সেই কবি মোর মতে, কল্পনাসুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।"—মধুসূদন

তৃতীয় খণ্ড

(১৮৮২ খৃষ্টাব্দ—১৯০৩ খৃষ্টাব্দ)

কলিকাতা।

১৩৩০ বঙ্গাব্দ।

মূল্য দুই টাকা মাত্র

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মানসী প্রেস
১৪ এ রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

মহাকবি হেমচন্দ্রের এই বিংশতিতম সাম্বৎসরিক মৃত্যুদিবসে তাঁহার প্রতিভা-প্রোজ্জ্বল জীবন ও কাব্যের অসম্পূর্ণ পরিচয় সংবলিত এই প্রস্তাব সমাপ্ত করিয়া সাহিত্যানুরাগী পাঠকগণের হস্তে সমর্পণ করিতে আমার হর্ষের পরিবর্ত্তে বিষাদ উপস্থিত হইতেছে। কিঞ্চিদধিক পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যাহা সঙ্কল্পিত হইয়াছিল, হায়, তাহার কতটুকু আজি সংসাধিত হইল! যে গৌরবোজ্জ্বল মূর্ত্তি বঙ্গবাসীর মানস-নয়নের সম্মুখে সর্ব্বদা ভাসিতেছে এবং চিরদিন ভাসিবে, আমার এই অক্ষম তুলিকায় তাহার ক্ষীণতম প্রতিচ্ছায়াও ফুটিল কই? ভাবিয়াছিলাম, শ্রদ্ধাপ্রদীপের স্তিমিত আলোকের সাহায্যে, অন্ধকারময় অতীতের কক্ষে কক্ষে অন্বেষণ করিয়া আমি যথাসাধ্য স্বর্গীয় কবির স্মৃতিপূজার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিব, কিন্তু তাহা পারিলাম কই? গ্রন্থারম্ভের তিন মাসের মধ্যেই আমি রোগে আক্রান্ত হই এবং চিকিৎসকগণ চিরদিনের জন্য আমাকে সকল প্রকার পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য, বিশেষতঃ অধিক মানসিক

পরিশ্রম করিতে নিষেধ করেন। কর্ত্তব্যানুরোধে কর্ম্মস্থলে একদিনের জন্যও কঠোর পরিশ্রমের লাঘব হয় নাই। গৃহে, বিরলপ্রাপ্ত অবসরের মধ্যে যেটুকু সাহিত্য সেবা সম্ভবপর ছিল তাহাও অত্যধিক স্নেহশীলা অনন্যসন্তানবর্তী জননীর তীক্ষ্ণদৃষ্টির অন্তরালে ব্যতীত সাধিত হওয়া অসম্ভব ছিল। এইরূপ প্রতিকূল ঘটনা সমাবেশের মধ্যে ধীরে ধীরে গ্রন্থরচনাকার্য্য অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময়ে এক আকস্মিক বিপদে বজ্রাহতপ্রায় হইলাম। দুই বৎসর হইতে চলিল, (১৩২৮ সাল ২২শে জ্যৈষ্ঠ), যে দিন আমার জীবনে বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, আমার জীবনের সকল আশার কেন্দ্র, প্রাণের আনন্দ, আমার দেবশিশুসদৃশ সরল, উদার, অকলঙ্কচরিত্র, প্রিয়তম পুত্র অমলচন্দ্রকে জগজ্জননীর ক্রোড়ে প্রত্যর্পণ করিলাম, সেইদিন আমি মনে করি নাই যে আমার ভগ্ন হৃদয় ও ভগ্ন মন লইয়া আমি কর্ম্মক্ষেত্রে পুনরায় প্রবেশ করিতে পারিব। হায়, কেমন করিয়া বুঝাইব কিরূপ "নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার?" কিন্তু দুর্ব্বিষহ শোকে মুহ্যমান ব্যক্তিকেও দয়ালেশবর্জ্জিতা কঠোরতাময়ী কর্ত্তব্যদেবী কখনও কশাঘাত করিতে বিরত হন না। সেই কশাঘাতের তাড়নায় পুনরায় অসমাপ্ত কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য

দুর্ব্বল ও কম্পিত হস্তে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে, —কিন্তু কোথায় সেই আশা, সেই উৎসাহ, সেই পরিশ্রম করিবার প্রবৃত্তি? অবসাদগ্রস্ত হৃদয়ে যাহা সংসাধিত হইল তাহাতে কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। সেইজন্য বহুদিনসঙ্কল্পিত কার্য্যের অবসানে মনে হর্ষের পরিবর্ত্তে বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে। কর্ত্তব্য সম্পাদনে ত্রুটীজনিত আত্মগ্লানি আমাকে প্রতিনিয়ত যেরূপ পীড়িত করিতেছে, সমালোচনার তীক্ষ্ণতম শ্লেষ-বাণও সেরূপ ব্যথিত করিতে পারিবে না।

আমার এই গ্রন্থ রচনাবিষয়ে অনেকের নিকট হইতে উৎসাহ, উপদেশ বা উপকরণসংগ্রহে সাহায্য লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। গ্রন্থ সমাপ্ত হইবার অব্য বহিত পরেই মদীয় পরমশ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে যে 'স্মৃতি-কথা' প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা গ্রন্থের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল। ইতি

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ।

১।৩ কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট্
কলিকাতা, ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০।
(হেমচন্দ্রের বিংশতিতম সাম্বৎসরিক মৃত্যুদিবস)।

সূচীপত্র

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

পরিশিষ্ট

———*———

চিত্রসূচী

হেমচন্দ্র

(অন্ধাবস্থায়)

প্রথম পরিচ্ছেদ

——o——

ইলবার্ট বিলের আন্দোলন,—রাজনীতিক ও অন্যান্য সাময়িক কবিতা।

জয়মঙ্গল গীত। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে সমগ্র ভারতবর্ষ এক নূতন আশায় ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। লর্ড লিটনের শাসনকালে প্রচণ্ড আফগান সমর প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সাধারণ লোকমত উপেক্ষা করিয়া দেশীয় সংবাদপত্র সমূহের স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছিল, অস্ত্র আইন বিধিবদ্ধ হইয়া এতদ্দেশীয়গণের পক্ষে অস্ত্র রাখা দণ্ডযোগ্য বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিল, এবং এই সকল কারণে দেশে অশান্তি

এবং অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে যখন উদারনীতিক মার্কুইস্ অব রিপণ ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিবার জন্য এদেশে পদার্পণ করিলেন, তখন ভারতবর্ষ এক অপূর্ব্ব আশায় উদ্দীপিত হইয়া উঠিল, ভারতবাসী যথার্থই মনে করিল—

"বৃটিশের বেশে ঋষিতুল্য নর
এ দেশে উদয় যবে।
ভারতের লক্ষ্মী ফিরিয়ে আবার
ভারতে উদয় হবে॥"

—এবং এই আশা বিফল হয় নাই। বেণ্টিঙ্কের ও ক্যানিঙের নামের সহিত পুণ্যশ্লোক রিপণের নামও ভারতবাসী চিরদিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। তাঁহার সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি ও অপূর্ব্ব ন্যায়পরতা কৃতজ্ঞ ভারতবাসী কখনও বিস্মৃত হইবে না। রিপণের শাসনকালেই লিটন কর্ত্তৃক প্রজ্বালিত সমরানল নির্ব্বাপিত হইয়া শান্তি সংস্থাপিত হয়, দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতা পুনঃ প্রদত্ত হয়, শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত হইয়া

শিক্ষা বিস্তারের পথ প্রসারিত হয়, স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়।

যদিও পুণ্যস্মৃতি মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাবাণী অনুসারে রাজকর্ম্মে নিয়োগ বিষয়ে দেশীয় ও বিদেশীয়গণের মধ্যে পার্থক্য দূরীকৃত হইয়াছিল, যদিও ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে ভারতবাসী বিচারপতির পদে বৃত হইয়াছিল, তথাপি উক্ত ধর্ম্মাধিকরণে এ পর্য্যন্ত প্রধান বিচারপতির আসনে কোনও ভারতবাসীকে বরণ করা হয় নাই। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান বিচারপতি স্যর রিচার্ড গার্থ কিছুকালের জন্য অবকাশ গ্রহণ করিলে লর্ড রিপণ রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে উক্ত দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার প্রদান করেন। এই নিয়োগের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু যোগ্যতা থাকিলে লর্ড রিপণের নিকট দেশীয় ও বিদেশীয়ের পার্থক্য ছিল না। বলা বাহুল্য রমেশচন্দ্রের এই নিয়োগে ভারতবাসীমাত্রেই আনন্দিত এবং রিপণের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছিল। এই আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জাতীয় কবি হেমচন্দ্রের আন্তরিকতাপূর্ণ 'জয়মঙ্গল গীতে' প্রতিভাসিত হইয়াছিল—
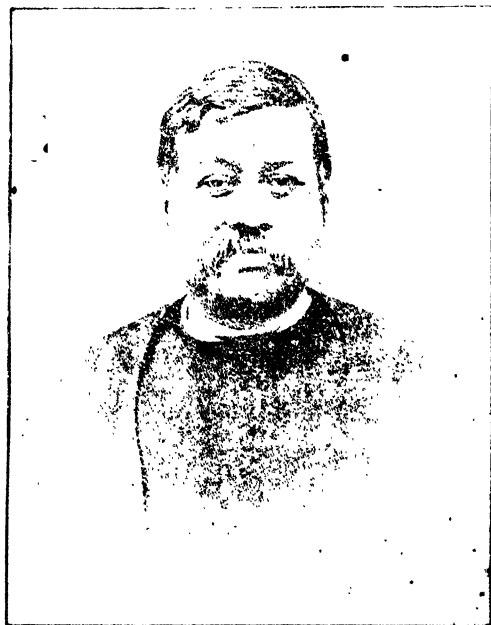
স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র

কাছে এসো ভাই   করি আশীর্ব্বাদ
চির সুখে হর কাল।
তোমার কল্যাণে   ভারত বিপিনে
উদিল চন্দ্রিকাজাল ॥
উজল আজি হে   বাঙালীর নাম
উজল ভারতভূমি।
বঙ্গের প্রধান   বিচার আসনে
আজি হে প্রধান তুমি ॥

*   *   *

আনন্দে বাজ্‌রে   মৃদঙ্গ মুরলী
আনন্দে বাজ্‌রে ভেরি।
"রিপণের জয়   রমেশের জয়"
সঘনে নিনাদ করি ॥

*   *   *

কৈ বরণ ডালা   আনো আনো আনো
ফুলসাজ আজ পরাব।
আগে দিব তুলে   রিপণের গলে
পরে প্রিয়জনে সাজাব ॥

বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গরমণীর উপাধি প্রাপ্তি।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু (এক্ষণে ডাক্তার

কাদম্বিনী গাঙ্গুলী নামে সুপরিচিতা) ও শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হেমচন্দ্র এতদ্দেশীয় মহিলাগণের মধ্যে উচ্চ শিক্ষাবিস্তারের জন্য চিরদিনই আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী অশিক্ষিতা ও বুদ্ধিহীনা ছিলেন বলিয়া তিনি নিরবচ্ছিন্ন দাম্পত্যসুখ লাভে বঞ্চিত ছিলেন। শিক্ষিতা মহিলাগণকে তিনি সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। বলা বাহুল্য এই দুইজন বঙ্গরমণী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ উপাধি লাভ করিলে হেমচন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই আনন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গরমণীর উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে রচিত উৎসাহপূর্ণ কবিতায় প্রতিফলিত হইয়াছিল—

সেদিন হবে কি ফিরে এ দেশে আবার
নারী হবে পুরুষের জীবন আধার।
গৃহরূপ কমলের কমলা আকারে,
ছড়াইবে সুখ রাশি চাহিয়া সবারে।—
হবে কি সেদিন, ফিরে যবে এ বাঙালী
অলকা পাইবে হাতে অভাগা কাঙালী।—
কি আশা জাগালি হৃদে, কে আর নিবারে?
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে!

৺সুরবালা দেবী

মধ্যমা কন্যার বিবাহ। লর্ড রিপণের শাসনকালে যে রাজনৈতিক ঘটনায় হেমচন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই ইলবার্ট বিলের মহা আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণিত করিবার পূর্ব্বে হেমচন্দ্রের পারিবারিক জীবনের একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিব। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে হেমচন্দ্রের মধ্যমা কন্যা সুরবালার সহিত কৃষ্ণনগরের ডেপুটি কলেক্টর যদুনাথ মুখোপাধ্যায় * মহাশয়ের মধ্যমপুত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (এক্ষণে মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট

---

* যদুনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

ইং ১৮২৮ সালে বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী মেমারী ষ্টেসনের নিকট বড়র নামক এক ক্ষুদ্রগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার আরও দুই সহোদর ছিলেন, ইনি কনিষ্ঠ। ইঁহার পিতা স্বকৃতভঙ্গ, বলরাম ঠাকুরের সন্তান ছিলেন, তাঁহার অনেকগুলি বিবাহ ছিল, সুতরাং যদুনাথ তাঁহার বৈবাহিক হেমচন্দ্রের ন্যায় মাতুলালয়ে লালিত পালিত হন। যদুনাথের মাতুলবংশ অতি সম্ভ্রান্ত ছিল এবং ঐ বংশের কয়েকজন তদানীন্তন উকীল ও সদর আমিন আলা (সবজজ) ছিলেন। তাঁহার এক মাতুল বাঁকুড়ায় ওকালতী করিতেন, সেইস্থানে থাকিয়া যদুনাথ বাঁকুড়া জেলাস্কুলে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন ও জুনিয়র স্কলার্শিপ
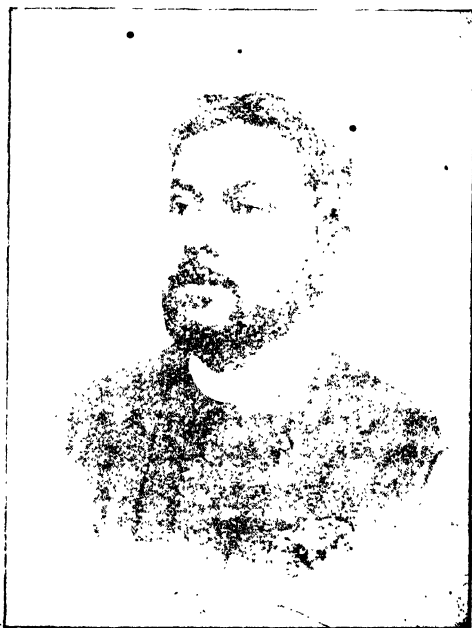
শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বোর্ডের সেক্রেটারী) মহাশয়ের শুভ বিবাহ সংঘটিত হয়। যদুনাথ হেমচন্দ্রের পুরাতন কুটুম্ব ছিলেন, কারণ, যদুনাথের এক নিকট জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে প্রবিষ্ট হন কিন্তু সিনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই অবস্থানুরোধে চাকুরীর চেষ্টা করিতে হয়। এই সময় তাঁহাকে বর্দ্ধমানে থাকিতে হয় এবং তথায় তিনি ৺রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও ৺রামতনু লাহিড়ীর সহিত পরিচিত হন এবং উভয়ের স্নেহ লাভ করেন। তিনি প্রথমে বর্দ্ধমান কলেক্টরীতে সামান্য কেরাণী হইয়া প্রবেশ করেন। কিন্তু অধ্যবসায় ও কর্ম্মদক্ষতাগুণে অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট উন্নতি করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে কলেক্টরের সেরেস্তাদার হন এবং দুই বৎসরের মধ্যেই ডেপুটী কলেক্টরের পদে উন্নীত হন। একাদিক্রমে ১৬ বৎসর মেদিনীপুরের Canal Revenue এর chargeএ ১৮৮২ সাল পর্য্যন্ত খ্যাতির সহিত চাকুরী করিয়া এবং তৎপরে কিছুদিন বৈদ্যনাথে ও কৃষ্ণনগরে থাকিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। চাকুরী উপলক্ষে বহুদিন মেদিনীপুরে অবস্থিতি করায় যদুবাবু সেই-খানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সেই-খানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি চারিত্রে গরীয়ান, ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান এবং দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। ইহাঁর তিন পুত্র গোবিন্দচন্দ্র, আশুতোষ ও সন্তোষনাথ। স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, রায়
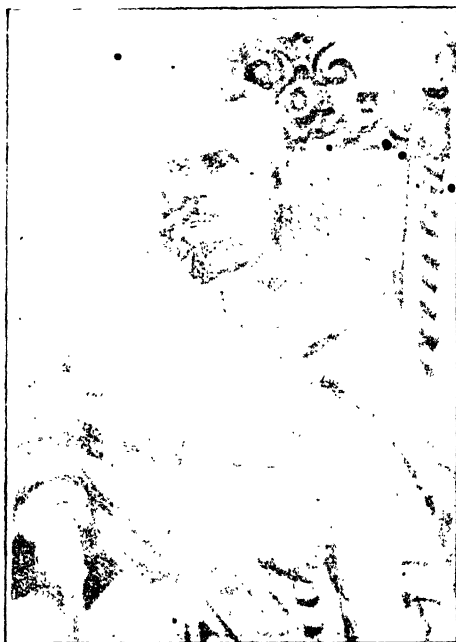
৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায়

নকুড়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় হেমচন্দ্রের ভগিনী নৃত্যকালীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যদুনাথের সহিত হেমচন্দ্রের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পর উভয়ে উভয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যদুনাথ হেমচন্দ্রকে আজীবন কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত দেখিতেন, হেমচন্দ্রও তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। যদুনাথ ইংরাজী, বাঙ্গলা, উর্দ্দু ও পারসী ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন এবং হেমচন্দ্রের কবিতার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

ইলবার্ট বিলের আন্দোলন। গত শতাব্দীতে এদেশে যে সকল রাজনৈতিক আন্দোলন হইয়াছে তন্মধ্যে বোধ হয় ইলবার্ট বিলের আন্দোলনে সমগ্র ভারতবর্ষ যেরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল সেরূপ আর

যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর প্রভৃতির সহপাঠী গোবিন্দচন্দ্র কিছুকাল মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্যত্ব করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র ইঁহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে অকালে ইঁহার মৃত্যু ঘটিলে হেমচন্দ্র মর্ম্মাহত হইয়া আশুতোষকে লিখিয়াছিলেন, "এমন বিপদ যেন পরম শত্রুরও কখনও না হয়।"

রমেশচন্দ্র দত্ত সি-আই-ই

কখনও হয় নাই। যদিও ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা-সচিব স্যর কোর্টনে ইলবার্টের নামের সহিত উহা জড়িত, তথাপি ইলবার্ট উহার যথার্থ প্রবর্ত্তক নহেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের সংস্কার যখন ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হইতেছিল, সেই সময়ে বিহারীলাল গুপ্ত কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এবং রমেশচন্দ্র দত্ত বাঁকুড়া জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তদানীন্তন ব্যবস্থানুসারে প্রেসি-ডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ য়ুরোপীয় আসামীর বিচার করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু কোনও মফঃস্বলস্থ দেশীয় ম্যাজি-ষ্ট্রেট য়ুরোপীয় আসামীর বিচার করিতে পারিতেন না। রমেশচন্দ্রের পূর্ব্বে আর কোনও দেশীয় ব্যক্তি জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট হন নাই, সুতরাং এতকাল কোন গোল-যোগ ঘটে নাই। কিন্তু যখন রমেশচন্দ্র ও বিহারীলাল—দুইজন দেশীয় ব্যক্তি—ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হইলেন, তখন এই ব্যবস্থার অসঙ্গতি স্পষ্টভাবে প্রতীত হইল। জিলার অধিবাসী য়ুরোপীয়গণ যদি জিলার শাসনকর্ত্তার শাসনাধীন না হন, তাহা হইলে সেই জিলায় কিরূপে তাঁহার পক্ষে শান্তিরক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে? অধিকন্তু দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনস্থ য়ুরোপীয় জয়েণ্ট

বিহারীলাল গুপ্ত

ম্যাজিষ্ট্রেটের যে ক্ষমতা থাকিবে, তাঁহার উর্দ্ধতন রাজ-কর্ম্মচারীর সে ক্ষমতা থাকিবে না, ইহাই বা কিরূপ সঙ্গত? ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংস্কারকালে রমেশ-চন্দ্র বিহারীলালকে এই অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়া দেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের এই অক্ষমতা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বিহারীলাল তখন কলিকাতাতেই প্রেসিডেন্সী ম্যাজি-ষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বাঙ্গালার তদানীন্তন লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সহৃদয় স্যর এশলি ইডেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ে আলোচনা করেন, এবং তাঁহারই পরামর্শে একটি সুচিন্তিত মন্তব্য লিখিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। বাক্ল্যাণ্ডের Bengal under the Lieutenant Governors নামক বহু-তথ্যপূর্ণ গ্রন্থে বিহারীলালের এই মন্তব্য অবিকল মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা কৌতূহলী পাঠকগণকে এই গ্রন্থে বর্ণিত ইলবার্ট বিলের ইতিহাসটি পাঠ করিতে অনু-রোধ করি। স্যর এশলি ইডেন বিহারীলালের মন্তব্যটি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ তারিখ সম্বলিত একটি পত্রের সহিত ভারতগবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন এবং বিহারীলালের যুক্তির সমর্থন করেন। বলা বাহুল্য

উদার-হৃদয় রিপণ দেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের এই অক্ষমতা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং ব্যবস্থাসচিব স্যর কোর্টনে ইলবার্ট সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ১৮৮৩ অব্দে ৩০শে জানুয়ারী দেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত একটি নূতন আইনের খসড়া প্রস্তুত করিলেন। এই খসড়াটি ইলবার্ট বিল নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

উক্ত বৎসর ৯ই ফেব্রুয়ারী দিবসে ইলবার্ট ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার প্রণীত খসড়াটি উপস্থাপিত করিলে স্থির হয় যে সাধারণে উহা বিস্তৃতভাবে সমালোচিত হইলে পরে উহার সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনা হইবে। এইরূপ করিবার কারণ এই যে ইতঃপূর্ব্বেই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র য়ুরোপীয় ও য়ুরেশীয় শক্তিশালী ব্যক্তিগণ ইলবার্টের বিলের ভয়ানক প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই বৎসর ২৮শে ফেব্রুয়ারী দিবসে কলিকাতা টাউন হলে য়ুরোপীয় ও য়ুরেশীয়গণ এই বিলের প্রতিবাদ কল্পে একটি বিরাট সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় মিঃ জে জে কেস্‌উইক্, মিঃ জে এইচ এ ব্রান্সন, এ বি মিলার প্রমুখ সঙ্কীর্ণচেতা এংলোইণ্ডিয়ান নেতৃগণ কটূক্তিপূর্ণ

বক্তৃতায় যে হলাহল উদ্গিরণ করেন, তাহার ফলে সমগ্র ভারতময় ঘোর বিদ্বেষ দাবানল পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। একজন নির্ভীক এবং স্পষ্টবাদী ইংরাজ লেখক উইলফ্রিড ব্লাণ্ট তদ্বিরচিত India under Ripon নামক গ্রন্থে এই যুক্তিহীন ও অন্যায় আন্দোলন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"The Ilbert Bill was in itself but a very poor instalment of that promised equality between her English and Indian subjects which he (Ripon) had been sent to give. Its object was to put a stop to the impunity with which non-official Englishmen, principally of the planter class, ill-treated and even on occasion did to death their native servants. It was to give for the first time jurisdiction over Englishmen in criminal cases to native judges instead of to judges and juries only of their own countrymen. Trifling remedy however though it was, it roused at once the anger of the class aimed at, and a press campaign was opened against Lord

Ripon of unusual violence in the Anglo-Indian journals. The Ilbert Bill was described as a revolutionary measure which would put every Englishman and every English woman at the mercy of native intrigue and native fanaticism. The attacks against Lord Ripon were certainly encouraged by the Anglo-Indian officials ; and presently they were repeated in the press at home and to the extent that the bill became a question in which the whole battle of India's future was being fought over and embittered. The "Times" took up the attack ; the cabinet was alarmed for its popularity, and the Queen was shaken in her opinion of her Viceroy's judgment. Lord Ripon was left practically alone to his fate."

উক্ত সভায় আর্মিনিয়ান ব্যারিষ্টার ব্রান্সনের বক্তৃতাই সর্ব্বাপেক্ষা অভদ্রোচিত ও কটূক্তিপূর্ণ হইয়াছিল। ঐ সকল দুর্ব্বাক্য ব্রান্সন সাহেব পরে প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সময়ান্তরে

পুনরায় উক্তবিধ মন্তব্য প্রকাশ করায়, বাগ্মিপ্রবর লালমোহন ঘোষ ঢাকা নগরীতে আহূত একটি সভায় তাহার যে বিরাশিসিক্কা ওজনের উত্তর দিয়াছিলেন তাহা এখনও অনেকের স্মৃতিপথে জাগরূক আছে এবং এতদ্দেশীয় বাগ্মিতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ব্রান্সন সাহেবকে আর অধিকদিন এদেশে ব্যারিষ্টারী করিতে হয় নাই। দেশীয় উকীল ও এটর্নিগণ সকলে মিলিত হইয়া তাঁহাকে বয়কট করেন * এবং বৎসর-

---

* "কলিকাতা হাইকোর্টের উকীলেরা সভা করিয়া ব্যারিষ্টার ব্রান্সন সাহেবকে কাজ দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। আবার দেশীয় আটর্ণিরা মঙ্গলবার একটী সভা করিয়া উক্তরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা নিম্নলিখিত বিষয়ে রেজলিউসন করিয়াছেন। যথা :—

"গত ২৮এ ফেব্রুয়ারী টাউনহলের সভায় ব্রান্সন সাহেব দেশীয় বিশেষতঃ বাঙ্গালীদিগের বিদ্বেষপূর্ণ যে বক্তৃতা করেন, এই সভা সেই অন্যায় নিন্দাবাদের জন্য তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইতেছেন। ব্রান্সন এই কটূক্তির নিমিত্ত গত ৩রা মার্চ্চ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মত যে ভ্রমাত্মক তাহা স্বীকার করেন নাই বলিয়া সভা তাঁহাকে ক্ষমা করা উচিত বিবেচনা করেন না। ফলতঃ তিনি দেশীয়দিগকে যেরূপ অপমান করিয়াছেন, তজ্জন্য সভা

লালমোহন ঘোষ

কালের মধ্যেই তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হয়। *

প্রতিজ্ঞা করিতেছেন তাঁহারা কোন প্রকারে তাঁহার সহিত কোন বিষয়ের সংস্রব রাখিবেন না।" সোমপ্রকাশ, ২৯এ ফাল্গুন ১২৮৯ ; ইং ১৮৮৩, ১২ মার্চ্চ।

* "কেবল সোমপ্রকাশের নয়, যাবতীয় সংবাদ পত্রেরই পাঠকবর্গকে আর পরিচয় করিয়া দিতে হইবে না যে,—ব্রান্সন সাহেবটী কে ? ইনি ন্যায় অন্যায় বিবেকশূন্য, ইলবার্ট বিলের ঘোরতর বিরোধী, পক্ষপাতদোষে ইঁহার হৃদয় মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার নিশির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আছে ; ইনিই হিতাহিত বোধহীন হইয়া কলিকাতার টাউনহলে ভারতবাসিদের নিন্দাবাদ করিয়া স্বদেশীয় আত্মীয় বন্ধু কুটুম্ববর্গের মনোরঞ্জন করেন। ইনিই অন্যায় পক্ষ সমর্থন করিয়া ইলবার্ট-বিদ্বেষী ইংরাজদিগের উকীল হইয়াছিলেন, সেই অপরাধে ইনিই ভারতবাসীর অশ্রদ্ধেয় হইয়া হা অন্ন যো অন্ন করিতে করিতে জাহাজে চড়িয়া তর্ তর্ করিয়া ভাসিতে ভাসিতে আজ সাগরপারে চলিয়া যাইতেছেন।

"আহা! ব্রান্সন সাহেবের শেষ দশাটা ভাবিলে প্রাণের ভিতর কাঁদিয়া উঠে। এতকাল হাইকোর্টে থাকিয়া যিনি তর্কবিদ্যায় অসামান্য পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন,—তাঁর অন্তিমদশায় এই ঘটিল। অর্থ যাঁহাকে অহরহঃ অনুসন্ধান

ব্রাঞ্সন প্রমুখ যুরেশীয় নেতৃবর্গের উক্ত প্রতিবাদ সভা এবং ইংলিশম্যান প্রভৃতি এংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদ পত্রের যুক্তিহীন আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া হেমচন্দ্রের "নেভার—নেভার" কবিতা রচিত হয় †—

> গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান,
> ডাক ছাড়ে ব্রান্‌সন্, কেশ্‌উয়ক, মিলার—
> "নেটিবের কাছে খাড়া, নেভার—নেভার!"

করিত, রাশি রাশি মকদ্দমা দিবার জন্য লোক যাঁহার কত আরাধনা করিত, সেই ব্রাঞ্সন অবশেষে আর একটিও মকদ্দমা পাইলেন না; গললগ্ন বস্ত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তবু তাঁহার অদৃষ্টচক্র আর ঘুরিয়া আসিল না। সুতরাং দিনপাতের আর উপায় কি?—কাজেই তিনি বিলাত যাত্রা করিলেন।"—সোম-প্রকাশ, ২৫এ বৈশাখ ১২৯০, ইং ১৮৮৩, ৭ই মে।

† 'বাজিমাতে'র কবির রাজনীতি বিষয়ক ইহাই প্রথম রহস্য-কবিতা নহে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সার রিচার্ড টেম্পল মিউনিপ্যাল আইন বিধিবদ্ধ করিলে হেমচন্দ্র "সাবাস হুজুক আজব সহরে" শীর্ষক যে রহস্যপূর্ণ কবিতা রচনা করেন তাহা আজিও ভোটপ্রদানকালে বাঙ্গালীর মনে পড়ে;

> "ছেলাম টেম্পল চাচা, আচ্ছা মজা নিলে।
> ভোজং দিয়ে ভোটিং খুলে, মিউনিসিপ্যাল বিলে॥"

নেভার—সে অপমান, হতমান বিবিজান,
মেটিবে পারে সম্মান, আমাদের জানানা!
বিবিজান! দেহে প্রাণ, কখনো তা হবে না।

লালমোহন তাঁহার ঢাকার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে ব্রান্সনের নাম কেবল আমাদের কবির গানে চির স্মরণীয় হইবে—

"Our poets shall sing of his infamy until his name shall become a bye word and a hissing reproach to after-ages and to generations yet unborn."

রামশর্ম্মার (নবকৃষ্ণ ঘোষ) ইংরাজী ও হেমচন্দ্রের বাঙ্গালা কবিতাবলীতে উক্ত কথার সার্থকতা প্রমাণিত হইতেছে।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইলবার্ট বিল সম্বন্ধে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের অভিমতাদি সংগৃহীত হয়। যে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট উদার ও সমদর্শী সার এশলি ইডেন মহোদয়ের শাসনকালে উক্ত বিলের সূচনা করিয়াছিলেন, সেই বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টই এক্ষণে সঙ্কীর্ণ মতাবলম্বী সার রিভার্স টমসনের আমলে য়ুরোপীয় ও

য়ুরোপীয় আন্দোলনকারিদিগের অন্যায় প্ররোচনায় উক্ত বিলের ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। সে সময়ে উক্ত আন্দোলনকারিগণ যে কিরূপ উন্মত্তপ্রায় ও কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য হইয়াছিল তাহা ভারতবন্ধু সার হেনরি কটন মহোদয়ের Indian and Home Memories নামক পুস্তকে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"A public meeting of protest by the European community was held at the Town Hall in Calcutta, members of the Bar abandoned the noble traditions of their profession, and speakers and audience frenzied with excitement were lost to all sense of moderation and propriety. The Viceroy was personally insulted at the gates of Government House. A gathering of tea-planters assembled and hooted him at a Railway Station as he was returning from Darjiling, when "Bill" Beresford, then an A. D. C. was with difficulty restrained from leaping from the Railway carriage into their midst to avenge the insult to his chief. The non-official European community

almost to a man boycotted the entertainments at Government House. Matters had reached such a pitch that a conspiracy was formed by a number of men in Calcutta, who bound themselves, in the event of Government adhering to the proposed legislation, to overpower the sentries at Government House, put the Viceroy on board a steamer at Chandpal Ghat, and deport him to England round the Cape."

এই আন্দোলনের বিশাল তরঙ্গ উচ্চপদস্থ ইংরাজ সিভিলিয়ান কর্ম্মচারিগণের উত্তেজনা-পবনে স্ফীত হইয়া কেবলমাত্র ভারতবর্ষকে প্লাবিত করে নাই, পরন্তু ইংলণ্ডের শক্তিশালী সংবাদপত্র সমূহকে এবং মন্ত্রি-সভাকে পর্য্যন্ত উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে লর্ড রিপণের মঙ্গল চেষ্টা সমস্তই ব্যর্থ হইল এবং সার অকল্যাণ্ড কল্‌ভিন্‌ ভারতীয় রাজস্বসচিবের পদপ্রাপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্ট এবং য়ুরোপীয় সমাজের মধ্যে Concordat নামক সন্ধি স্থাপন করিলেন। ১৮৮৪ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমভাগে ইলবার্ট বিল সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাদানুবাদ হয় এবং অবশেষে

২৮শে জানুয়ারি তারিখে যে আকারে বিলটি বিধিবদ্ধ হইল তাহাতে বিলটী প্রথমে যে উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বিফলীকৃত হয়। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও সেশন জজগণ জাতি নির্ব্বিশেষে য়ুরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাগণের অপরাধ বিচারের অধিকার পাইলেন বটে, কিন্তু ইংরাজ অপরাধিগণ যে কোন লঘু অপরাধে অভিযুক্ত হউক না কেন, ইচ্ছা করিলেই জুরিগণের দ্বারা বিচারিত হইবার দাবি করিতে পারিবে এবং উক্ত জুরিগণের মধ্যে অর্দ্ধেকের উপর য়ুরোপীয় বা আমেরিকান হওয়া আবশ্যক এইরূপ বিধান হইল। সুদূর মফঃস্বলে য়ুরোপীয় ও আমেরিকানের সংখ্যা অতি অল্প। সুতরাং জুরিদ্বারা বিচারের প্রার্থনা হইলে সেই জেলায় উপযুক্ত সংখ্যক জুরির অভাবে অনেক সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা জজকে বাধ্য হইয়া মোকদ্দমাটি অন্য জিলায় পাঠাইতে হয়। ইহাতে বিচার ও শাসন কার্য্যের কত দূর ব্যাঘাত ও বিড়ম্বনা হইবার সম্ভাবনা তাহা পাঠকগণ অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারেন। ভারতবাসিগণ ইলবার্ট বিলের এই বিপরীত পরিণাম দর্শনে নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও আশাহত হইয়াছিলেন। হেমচন্দ্র এই ব্যাপারে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই পরাজয়ের মধ্যেও দেশ-

বাসিগণের শিক্ষার উপকরণ আহরণ করিয়া ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্দেশ করিতে বিস্মৃত হন নাই। 'মন্ত্রের সাধন' নামক কবিতাটি এই সময়ে তাঁহার লেখনী হইতে নিঃসৃত হয়।

সুধন্য ইংরাজ তোমার মহিমা।
সুধন্য তোমার স্ববীর্য্য-গরিমা।

দিলে শিক্ষাদান ভারত-নন্দনে
দিব্যচক্ষু দিয়া—কি মন্ত্র সাধনে
পরাধীন জাতি, পরাধীন জনে
বাসনা সফল করিতে পায়।

শিখিবে ভারত—শিখিবে এ কথা
চিরদিন তরে না হবে অন্যথা—
একদিকে কোটী প্রাণী কাতরতা
শ্বেতাঙ্গ কজন বিপক্ষ তায়।

তবুও কজনে চরণে দলিল
রাজপ্রতিনিধি রাজমন্ত্রিদল---
স্বজাতি-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিল
এমনি তাদের অমিত বল।

শেখরে এখন ভারত-সন্তান
শ্বেতাঙ্গ নিকটে তৃণের সমান
সমগ্র ভারত জাতি কুলমান—
রাজস্তুতি গান সব বিফল।

যে মন্ত্র সাধনে সুপটু উহারা
সেই বীরব্রত---একতার ধারা,
সে সাহস উৎস—সে উৎসাহ ধারা,
হৃদয়-কন্দরে গাঁথিয়া রাখো—

তবে অগ্রসর হৈও কভু আর
করিতে এরূপে স্বজাতি উদ্ধার
পণে যদি দাও প্রাণ আপনার—
নতুবা যা আছ তাহাই থাকো॥*

এই কবিতাটির শেষভাগে কবি মনের দুঃখে লর্ড রিপণের প্রতি কিঞ্চিৎ ভৎর্সনা করিয়া লিখিয়াছিলেন—

* হেমচন্দ্রের মধ্যম জামাতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেন যে এই কবিতাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়া মেদিনীপুরে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে "publicএর উপর ইহার কি effect হয় বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে বলিয়াছিলেন।"

"শুনহে রিপণ---ভারতের লাট,
আর নাহি করো এ তাণ্ডব নাট
বিষময় ফল—বিষম বিরাট
মনুষ্য-হৃদয় সহিত খেলা।

অতি হীনবল—ঘোর কৃষ্ণকায়
সে জাতিও যদি আশার দোলায়
দুলে বহুক্ষণে—আশা না জুড়ায়,
সে নিরাশাঘাত রোধে না বেলা॥

সুধাছলে তুমি দিলে হলাহল
সম্প্রীতি করিলে সহ নিজ দল
বাড়ালে তাদের শতগুণ বল
"পৃটোরিয়া" গার্ড রোমেতে যথা।"

কিন্তু লর্ড রিপণ যেরূপ দশচক্রে পড়িয়া তাঁহার উচ্চ অভীপ্সিত পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহা হেমচন্দ্রের অবিদিত ছিল না। তিনি বহুদিন পরে তাঁহার মধ্যম জামাতার সহিত কথোপকথন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "এ অবস্থায় বেচারা আর কি করিতে পারিত?"

'রিপণ উৎসব।' ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু, পুণ্যশ্লোক

মার্কুইস অব রিপণ ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সঙ্কীর্ণমতাবলম্বী কর্ম্মচারিবৃন্দ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া—প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়া—যদিও উদার-হৃদয় রিপণ ইচ্ছামত শাসন-সংস্কারাদি সাধিত করিতে সমর্থ হন নাই, তথাপি তাঁহার প্রত্যেক বাক্যে ও প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য, অকৃত্রিম সহানুভূতি ও অপূর্ব্ব ন্যায়পরতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ভারতবাসিগণ তাঁহাকে দেবতার আসনে বসাইয়াছিল। অনেকে মনে করেন যে ইলবার্ট বিলের সময়ে যে জাতিবিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, রিপণের প্রতি দেশবাসীর এইরূপ গভীর ও আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি না থাকিলে সেই অনলরাশি বহুদূর বিস্তৃত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর ফল উৎপাদিত করিত। বাস্তবিক রিপণের ন্যায় কোনও বিদেশীয় শাসনকর্ত্তা দেশবাসীর নিকট এরূপ হৃদয়ের পূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না সন্দেহ। ইলবার্ট বিলের আন্দোলনকালে ভারতবাসিগণের হৃদয়ে যে একতার স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল, রিপণের বিদায়গ্রহণ কালে সেই একতা আরও সুস্পষ্ট ভাবে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সমস্ত নগরে ও গ্রামে, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দেশবাসিগণ মিলিত হইয়া রিপণের প্রতি কৃতজ্ঞতার

যে উৎস উৎসারিত করিয়াছিলেন তাহার অনুরূপ বিবরণ কৃতজ্ঞতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ ভারতবাসীর ইতিহাসেও বিরল। স্যর হেনরি কটন লিখিয়াছেন—

"The date of his (Lord Ripon's) departure is the natal day of a New India. 'His journey from Simla to Bombay', writes Meredith Townsend, 'was a triumphal march, such as India has never witnessed—a long procession in which seventy millions of people sang hosannas to their friend!' The homage that was tendered to Lord Ripon by all classes and creeds was never before tendered to any foreign ruler. The spectacle of a whole nation stirred by one common impulse of gratitude was never before beheld in Indian history. I took my share in the great demonstration in Calcutta. No public movement could have been more characterised by unanimity and spontaneity. No sign could have shown more clearly that the germ of nationality had already sprung into life."

রিপণের এই বিদায় উপলক্ষে, হেমচন্দ্রের "রিপণ উৎসব—ভারতের নিদ্রাভঙ্গ" রচিত হয়। হেমচন্দ্রের মধ্যম জামাতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত কবিতাটির রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"লর্ড রিপণের বিদায় উপলক্ষে কলিকাতায় এক বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়। এই উপলক্ষে এক বিরাট শোভাযাত্রাও বাহির হইয়াছিল। কলিকাতার ছাত্রবর্গ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া এক একজন বয়স্ক ছাত্রের নেতৃত্বে শিক্ষিত প্রথায় পদক্ষেপ করিতে করিতে শিয়ালদহ হইতে গবর্ণমেণ্ট হাউস অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। আমিও সেই সময় একদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া এই সঙ্গে চলিয়াছিলাম। হেমচন্দ্র শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর বাড়ীতে বসিয়া ইহা দেখিয়াছিলেন। তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলেন 'তোমরা যখন দলবদ্ধ হইয়া ভারতের জয়গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিলে তখন আমার মনের অবস্থা যে কিরূপ হইতেছিল তাহা বর্ণনাতীত। সে দৃশ্য দেখিয়া আমার অন্তরে ভারতের ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত

হইয়া গিয়াছে।' ইহার পরেই 'রিপণ উৎসব—ভারতের নিদ্রাভঙ্গ' কবিতাটি লিখিত হয়।"

'রিপণ-উৎসব' ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবনের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় (১২৯১ বঙ্গাব্দ, পৌষ) প্রকাশিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র এই কবিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "পায়োনিয়ারে সর জন ষ্ট্রাচি কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ অবলম্বনে 'রিপণ-উৎসব' ভারতের নিদ্রাভঙ্গ, ১২৯১ সালের পৌষে নবজীবনে প্রকাশিত হয়।" কিন্তু কবিবর স্বয়ং দেশবাসীর নিদ্রাভঙ্গ দেখিয়া যে কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এইরূপ অনুমান করাই কি সঙ্গত নহে? স্যর জন ষ্ট্রাচি রিপণ উৎসবের চারি বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন এবং তিনি যে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণের পর এই সময়ে পায়োনিয়রে কোনও প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুনা যায় ভারতবর্ষের রাজস্বসচিব স্যর অক্ল্যাণ্ড কল্‌ভিন্—(যিনি বহুদিন হইতেই পায়োনিয়রের লেখকরূপে সংসৃষ্ট ছিলেন *)—এই সময়ে ভারতবাসীর অপূর্ব্ব একতা সন্দর্শন করিয়া

---

* See Blunt's 'India under Ripon."

"If it be real what does it mean ?" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পায়োনিয়রে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, কিন্তু পায়োনিয়রের প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া যে কবিবর হেমচন্দ্র তাঁহার কবিতা রচনা করিয়াছিলেন এরূপ অনুমানের কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

রিপণ-উৎসবে কবি হেমচন্দ্র কেবল ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হন নাই, কিন্তু যে ভারতবাসীর নিদ্রাভঙ্গের উদ্দেশ্যে বহুদিন হইতে তাঁহার পাঞ্চজন্যের গভীর আরাব উত্থিত হইয়াছিল, সেই ভারতবাসীর শব-পঞ্জরে জীবনের স্পন্দন সন্দর্শন করিয়া কবি আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উদ্দীপনাময়ী ভাষায় দেশবাসিগণকে চিরদিন একতাসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন :—

আর ঘুমাইওনা বলে কতদিন
কেঁদেছি---কেঁদেছে কত সে আর,
আজি জন্মভূমি জীবন সার্থক---
তোমার কণ্ঠে এ মিলন হার ॥

জীবনের বিন্দু না হেরি কোথায়
সব শূন্যময়—সকলি খালি
চারিদিকে যত নরাস্থি কঙ্কাল,
চারিদিকে ধূ ধূ করিছে খালি ॥

উঠ গো জননী দেখ চক্ষু মেলি
সেই অস্থিগুলি নড়িছে ধীরে,
মৃদুল হিল্লোলে দেখো কি নিশ্বাস
সে শব-পঞ্জরে বহিছে ফিরে ॥

ভুলো না ভারত 'রিপণ-উৎসব'
ছিঁড়োনা যে ডোরে মিলেছ আজ,
এক বাণী ধর ভারত সন্তান
যেখানে যে থাকো—পরো যে সাজ ॥

মনে কর সবে নিভৃতে—উৎসবে
'রিপণ বিদায়' নহে এ খালি,
সম আশা ভয় ভারত অন্তরে
এ মিলন তার প্রকাশ্য ডালি ॥

দূরদর্শী কবির এই উপদেশবাণী নিরর্থক হয় নাই। 'রিপন বিদায়ে'র সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ঐক্য লক্ষিত হইয়াছিল, সেই এক-

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
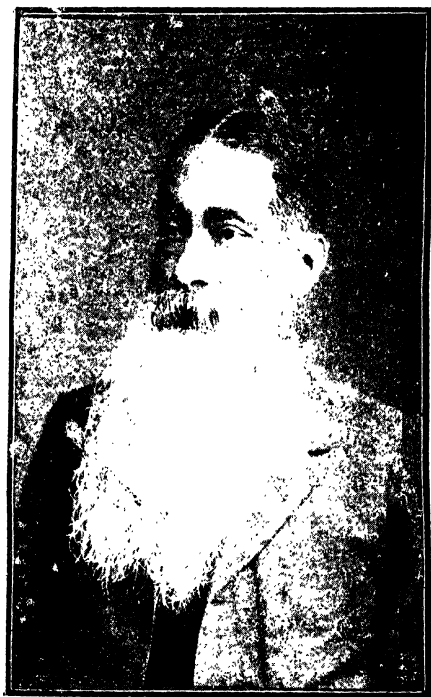
তার বলে পর বৎসর (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) হেমচন্দ্রের অন্যতম বন্ধু ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে শিক্ষিত ভারতবাসিগণ কর্তৃক জাতীয় মহা সমিতির (কংগ্রেসের) ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—○*○—

'নবজীবন' ও 'প্রচার'। দোঁহাবলী।

'নবজীবন'। ১২৯১ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ মাসে ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় 'নবজীবন' মাসিকপত্র প্রবর্ত্তিত করেন। উহার ইতিহাস সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র তদীয় আত্মচরিতে লিখিয়াছেন :—

"সেই সময়ে কলিকাতায় কলুটোলায় বঙ্গ সাহিত্যের সম্রাটরূপে বঙ্কিমবাবু বিরাজমান। শশধর তর্কচূড়ামণি মুঙ্গের হইতে আসিয়া পথিমধ্যে বর্দ্ধমান বিজয় করিয়া কলিকাতায় শিবির স্থাপন করিতেছেন। বঙ্কিম বাবুর বৈঠকখানায় প্রতি রবিবারে সাহিত্য-সঙ্গত হয়। থাকেন চন্দ্রনাথ বাবু দাদা মহাশয়, এখন পরলোকগত তখন বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সরকারী অনুবাদক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, খিদির পুরের দুই মহাত্মা, কবিবর হেমচন্দ্র এবং কোমৎশিষ্য যোগেন্দ্রনাথ (চন্দ্র ?) ঘোষ—বঙ্কিমবাবুর প্রতিবাসী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম, কেশব বাবুর সহোদর কৃষ্ণবিহারী সেন, পরে কটক কলেজের

প্রিন্সিপাল নীলকণ্ঠ মজুমদার প্রভৃতি। মধ্যে মধ্যে আসেন বারাসতের ডেপুটী তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বর্দ্ধমানের ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও গোবিন্দ চন্দ্র দাস প্রভৃতি। বঙ্কিমবাবু ত অবশ্যই থাকিতেন। কলিকাতায় বাসা করার পর প্রতি রবিবার অপরাহ্নে ত বটেই, অন্য অন্য সময়েও সেইখানে যাইতাম। চূড়ামণি মহাশয়ও এক এক দিন থাকিতেন। সাহিত্যসেবার সভায় ধর্ম্মের কাহিনী উঠিল। চূড়ামণি মহাশয় আলবার্ট হলে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। শাস্ত্রসঙ্গত ধর্ম্ম ব্যাখ্যার সঙ্গে তিনি বিজ্ঞানের দোহাই জাঁকাইয়া দিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম বিজ্ঞানের উপর দাঁড়াইবে. কথাটা নিতান্ত উল্‌টা কথা বলিয়াই আমার বোধ হয়। সাধারণীতে এই মতের প্রতিবাদ করিলাম। ধর্ম্মই সকলের আশ্রয়, ধর্ম্মই সকলের অবলম্বন, ধর্ম্ম আবার বিজ্ঞানের আশ্রয় লইবে কেন? এই সকল কথার আলোচনার ফলে নবজীবন প্রকাশিত হইল। * * * বঙ্গের মহামহারথিগণ প্রায় সকলেই লিখিতে লাগিলেন।"

এই মহামহারথিগণের মধ্যে হেমচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রগণ্য। হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা' প্রকাশের পর

বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্কিম-মণ্ডলের অন্যান্য জ্যোতিষ্কগুলির সাহিত্যকক্ষে নির্দ্দিষ্ট গতির বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। যে অপূর্ব্ব মায়াবী উপন্যাসের এক অভিনব সাম্রাজ্য সৃজিত করিয়া বাঙ্গালীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন, তিনিই কাহার অলক্ষ্য প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া এক নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উদার হিন্দুধর্ম্মের বিজ্ঞানেতিহাসসম্মত ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অনুসন্ধানের যোগ্য।

পরপরিচ্ছেদে বর্ণিত নানা পারিবারিক কারণ বশতঃ হেমচন্দ্র ইচ্ছাসত্ত্বেও 'নবজীবনে' অধিক লিখিতে পারেন নাই। 'নবজীবনে' তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়:—

সন ১২৯১, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা—শ্রাবণ—(১) মদন পূজা।

৩য় সংখ্যা—আশ্বিন—(২) হুতোম প্যাঁচার গান।

৬ষ্ঠ সংখ্যা—পৌষ—(৩) রীপণ উৎসব।

১২৯২, ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা—অগ্রহায়ণ—(৪) হরিদ্বার।

হেমচন্দ্র

১২৯৩—৯৪, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষ—এই বর্ষদ্বয়ের লেখকগণের মধ্যে হেমচন্দ্রের নামোল্লেখ আছে—কিন্তু উহাতে উল্লেখযোগ্য কোনও কবিতা প্রকাশিত হয় নাই।

'মদন পূজায়' কবি মদনের যথার্থ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন:

> চিনেছি এখন, মদন তোমায় অনঙ্গ কেবলি নাম।
> বসন্ত-সমীর, তুয়া নিশোআস্, কুসুম লাবণ্য ঠাম,
> সুবাদ্য ঝঙ্কার, সঙ্গীত উচ্ছ্বাস বচন তুহারি মানি,
> হিয়ার মাঝারে, প্রেমের নিঝর তুহারি পরাণ জানি;
> অবহি পূজিব, অনঙ্গ তুহারে, তুহ সে পরম প্রাণী।

'রিপণ উৎসবে'র বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল তাহা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'হরিদ্বার' শীর্ষক কবিতাটীর স্থানে স্থানে কবি পরে কিছু পরিবর্ত্তন করেন এবং সংশোধিত কবিতাটী ৪র্থ বর্ষের "মানসী"তে (কার্ত্তিক ১৩১৯) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। 'হুতোম প্যাঁচা'র গানের বিস্তৃততর পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক।

'হুতোম প্যাঁচা'র গান। 'হুতোম প্যাঁচার' গান বা কলির সহর কলিকাতা, ১২৯১ সালে আশ্বিন

মাসে 'নবজীবনে' এবং পরে স্বতন্ত্র ভাবে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। উহাতে হেমচন্দ্রের স্বাক্ষর ছিল না, শ্রীরসিক মোল্লা বিরচিত বলিয়া লেখা ছিল। অক্ষয়-চন্দ্র যথার্থ ই বলিয়াছেন যে এই "পদ্য সাধারণত রসের ভাষায় কলিকাতার পৃষ্ঠে কশাঘাত বটে, কিন্তু উহাতে মেকির তিরস্কার অপেক্ষা খাঁটীর পুরস্কারই অধিক আছে।" কবিতাটী হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর কোনও সংস্করণে এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই, সেই জন্য উহা হইতে 'আসর বর্ণন' পালাটি সমগ্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা অক্ষয়চন্দ্রের উক্ত মন্তব্যের সমর্থন করিব। আসরে উপস্থিত ব্যক্তিগণকে নবীন পাঠকগণ যদি চিনিতে না পারেন, সেই জন্য আমরা গ্রন্থমধ্যে তাঁহাদের কয়েক জনের আলেখ্যময়ী প্রতিমূর্ত্তি ও পাদটীকায় বাকীগুলির নাম সন্নিবিষ্ট করিলাম।

এসো এসো সবার আগে ঠাকুর বাড়ীর চাঁই,
বুল্‌বুলি পাগ শিরে বাঁধা তালপাতা সেপাই।
পাথরঘাটায় রাজগীজারি "সার" মহারাজ নাম,
মুন্সী-আনায় জেঁকে গেছে ছ্যাতলা ধরা থাম।
সিঁতির মাঠে কুঞ্জবিহার দীপ্ত মরকত,
কুঞ্জ-মাঝে 'গটো'গহ্বর মাটীতে পর্ব্বত।

বংশ যশে 'লেজিশলেটিভ' রংমহলে চড়ে
রাজ-মহারাজ নাগরা পিটে মাথায় পগ্‌গ নেড়ে।
মিষ্টি বোলে মিছরি ঘোঁটা সবটুকু সে ছাঁকা;
(যার) অভ্যুদয়ের ছায়া লেগে সহরখানা ঢাকা!
এসো এসো ভারত মাজী কসে ধরো হাল,
বিলিতি বাতাসে ভ্যালা উড়ায়েছ পাল।!

এসো এসো দাদার পরে গলায় পরে হার,
অদ্বিতীয় ধরা মাঝে 'মিউজিক ডাক্তার'।*
'অর্ডার অফ সি আই ই, অ্যাণ্ড রাজা—কম;
'অর্ডার অফ লিওপোল্ড কিংডম বেলজিয়ম,'
'অর্ডার অফ ফ্রান্সে জোসেফ এম্পাইয়ার অষ্ট্রিয়া,'
'অর্ডার অফ ডলার ব্রোগ' ডেনমার্ক-নিয়া,
'অর্ডার অফ অ্যালবার্ট অ্যাণ্ড স্যাক্‌সনী,
অর্ডার অফ মেলুসাইন মেরী লুসিগনানী,'
'অর্ডার অফ মলটা রোডস্ ফ্রাঙ্ক সিভেলার,'
অর্ডার ডিউ টেম্পেল ডিউ সেন্টসেপলকার,'
'ইম্পিরিয়েল অর্ডার অফ পাউসিং চাইনার,
'সেকেন কেলাস ইম্পিরিয়েল লাইয়ন এণ্ড সন্,'
'সেকেন কেলাস ইম্পিরিয়েল মেহেদিজি স্থলতান,'
'অর্ডার অফ গুর্খা-তারা দিয়েছে নেপাল,
'শ্যামদেশের বসবামালা পারস্য সা-জাদা,

---

* রাজা স্তর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

(বুলবুলি পাখ. শিরে বাঁধা তালপাতা সেপাই)

এর ওপরে আরো কত এটসেটেরার গাদা ॥
সত্যই এ সকলগুলি রাজশ্রীর হার,
সাক্ষী দেখো সব কেতাবের মলাটে বিস্তার ॥
(এখন) সরো সরো ছোট বড় রাজা মহাশয়,
আসর নিতে 'আউআর কজিন' হচ্চেন উদয় ।

এসো এসো দেব অংশ এসো শীঘ্র করে,
তুমি না আসিলে শোভা হয় কি আসরে ?
স্বয়ংসিদ্ধ মহারাজা সহর শোভন,
যথা গিরি গোবর্দ্ধন গোকুলের ধন ।
তোমার তুলনা দেব তুমিই আপনি,
গঙ্গার উপমা আহা গঙ্গাই যেমনি ।
সভাস্থলে টাউনহলে বক্তৃতার চোটে,
ভাদুরে নদীর জলে ফেণা যেন ফোটে ।
সেকেলে কেষ্টের মত ধড়া পরা ঠিক,
খালি সে চুড়োটী নাই তিলক কৌলিক ।
মাথার চুলের ভাজে খেলে জোয়ার ভাটা,
সমুখে বাগানো তেড়ি ঘাড়ে দেখি ছাটা ।
শ্রীহরি শ্রীহরি স্মরি ঠাওরে না পাই,
কাশী মক্কা পাশাপাশি কোন্ দিকে তাকাই ।
এসো এসো মহারাজ আরো ঘেসে যাও :
আতর গোলাপ পাস্ লে-আও লে-আও ।

মহারাজ স্যর নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব

(সেকেলে কৃষ্ণের মত ধড়া পরা ঠিক)

এসো হে বণিকপতি এসো তো এবার,
করতো জাকায়ে বসে আসর গুল্‌জার।
নেটিবের সদাগর বেনেদের নাক,
কমলার কলকাটী সোণার মৌচাক।
দেশকুল-মুখোজ্জ্বল ব্যাপারে হুন্নুরি,
বাজারে যাহার হালে বড়ই জাহিরি।
বড় 'লকী' জাদুগীর দাঁত বাঁধা 'চ্যাপ,'
হানা-বাড়ী হাতে নিলে হয় সোণাচাপ।
এর কাছে আর যত ঝুটো পোখরাজ,
গিল্‌টি-সোণা দাগী চুনি ব্যকে মারে লাজ।
সহরে সবার কাছে শুনি এর নাম,
আক্‌বরী আসরফী যেন দরে দুনো দাম।
অল্পভাষী 'বোভো হোমো' কাঁচামিঠে ঝাজ
গরমে পচেনি আজো টাটকা আছে মাজ॥
তারি মত ছোট ভাই গায়ে নাহি তাৎ,
সাবাস ত্রিমূর্ত্তি লাহা * কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ।

তার পর গুড়ি গুড়ি এসো বুড়ো শিব,
গঙ্গার ওপারে বাড়ী অদ্ভুত 'নসীব'। †
জমিদারী মিণ্টে ঢালা আদোৎ 'মডেল',
বাঙ্গালার কাদাহোড়ে পাথুরে পাটকেল।

---

* মহারাজ দুর্গাচরণ, শ্যামাচরণ ও জয়গোবিন্দ লাহা।

† জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বয়েসে অনাদি-লিঙ্গ 'জরাসিন্ধ' বলে,
দাপোটে এখনো যার হুগলি জেলা টলে ॥
মাল্‌ আইনে তোদর মল রোখে হাইদর আলী,
কৌশলে চাণক্য দ্বিজ, বিদ্যাদানে বলি।
গুষ্টী বহু, বাস্তুভূমি যেন লঙ্কাপুরী,
ইন্দ্রজিৎ সম পুত্র কৌঁসলে মুহুরি।
দিগ্বিজয়ী দণ্ডধর রাষ্ট্রযুড়ে নাম,
ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ চরণে প্রণাম।

এইত গেলো কল্‌কাতা তোর কঙ্কাপরার দল,
দেখবো এবার গোটাকত দিকপাল আসল।
দেখবো এবার আসর মাঝে মনের রাজা যারা,
সব আসরে যাঁদের শিরে জ্বলে সোণার তারা।
তফাৎ সরো তফাৎ সরো ফড়িং ফিঙের পাল,
আসর নিতে আসছে এবে বাজপাখী "রয়াল"।

আসছে দেখো সবার আগে বুদ্ধি সুগভীর,
বিদ্যের সাগর খ্যাতি জ্ঞানের মিহির।
বঙ্গের সাহিত্য-গুরু শিষ্ট সদালাপী
দীক্ষাপথে বুদ্ধঠাকুর স্নেহে জ্ঞানবাপী।
উৎসাহে গ্যাসের শিখা, ব্রাত্যে শালকড়ি
কাঙাল-বিধবা-বন্ধু অনাথের নড়ি।
প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম, দাতাকর্ণ দানে,
স্বাতন্ত্র্যে শেকুল-কাঁটা পারিজাত ঘ্রাণে।

বিদ্যাসাগর

(ইংরিজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত ডিস্)

হেমচন্দ্র

ইংরিজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত ডিস্'
টোল-স্কুলী অধ্যাপক দুয়েরই ফিনিস।
এসো হে দ্বিজের চূড়া বঙ্গ অলঙ্কার।
দিক্‌পাল তোমার মত দেশে নাই আর।
দেখাও দেখি সাহেব-চাটা সহুরে রাজায়
কার শোভাতে জলুস বেশী আসর যুড়ে যায়।

কার শোভাতে জলুস বেশী আসর যুড়ে যায়?
পাঁও লাগে বাচস্পতি এসোতো সভায়।
জীবন্ত ভাষার কোষ পাণিনির মই
শাস্ত্রেতে সুপক্ক রুই নহে টুলো কই।
স্মৃতি দরশনে দৃষ্টি তর্কের মার্জ্জার
মোক্ষমূলর ল্যাসেনের মুণ্ডের টোপর।
ব্যাকরণে ব্যোপদেব ভ্রাতর মামাতো
সংস্কৃত বিদ্যা দাঁড়ে হরবোলা কাকাতো
শিক্কাধারী খর্ব্বদেহ দর্শনে দুর্ব্বাসা
আলাপে তালের শাঁস কিম্বা শশা খাসা।
পাতা পেতে ছানা ক্ষীর দিতে সাধ যায়
এসো এসো বাচস্পতি পাঁও লাগে পায়।
অনেকে তো নৈবিদ্যির ভাগ সরাতে জড়।
বলো তো জলুস কার সভার মাঝে বড়?

বলো তো সভার শোভা এবার কেমন
নমস্কার নমস্কার [illegible]।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি

(জীবন্ত ভাষার কোষ পাণিনির মই)

ফুটেছ ব্রাহ্মণ কুলে আপনার বাসে,
বুকেতে বেঁধেছো 'চাপ' প্রকৃতির 'পাসে'।
থানের চাদর পরা থানধুতি মোটা
কালোমুখে জ্বলে আলো প্রতিভার ছটা।
নিজগুণে নিজপণে রাঢ়ে বঙ্গে মান
পৈতৃক মকরধ্বজে নহ অনুপান।
সাহেব করেছো বশ বিদ্যারসে তাজা
বাসে তব ভাসে কত ফেদার-ধারী রাজা।
স্বভাবে মিঠেন প্রাণ মিঠেন বচন
শুমোরে গৃহিণী পাশে করো না গর্জ্জন।
মুখে মিঠে বুকে কটু নহ নিন্দাভাষী।
উপদেশে পরজনে প্রকৃত বিশ্বাসী॥
মজলিসেতে বাবুর পোষাক ঐটি কেলেঙ্কার
তবু হ্যাদে খাঁটি বাসে তুল্য কে তোমার?

এসো এসো তাহার পরে রেগুরেগু সাজ
বন্দ্যকুল চূড়ামণি মানোআরী জাহাজ।
শুভ্রভুরু শুভ্র কেশ শুভ্র দাড়ি চেরা
গিরীক ল্যাটিন হিব্রু ইংরিজি ফোয়ারা।
মাকাল বনের মাঝে পাকা আম্রফল
স্বধর্ম্ম তেয়াগী তবু স্বজাতির দল।
মিষ্টভাষী বঙ্গষষ্ঠী হৃদে মাখা চিনি
বয়েস খুজিতে গেলে চক্ষে ধরে ঝিনি।

মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন
(কালো মুখে জ্বলে আলো প্রতিভার ছটা)

দ্বাপুরে ভুষুণ্ডী বুড়ো সবেতে মহৎ
বাঙ্গালীর মাঝে যেন ধবলা পর্ব্বত।
রাংতা জরি চাকৃতি মারা নকিব ফুকার
বলোতো এমন আলো তোমাদের কার ?

পথ ছাড়ো পথ ছাড়ো আসিছে এবার
গদাধর পাদপদ্মে মতি গতি যার।
তালপত্র তাম্রপত্র পুথিপত্র থোকা
বগলে পুট লি বাঁধা কেতাবের পোকা
এসো মিত্র লালে লাল মজলিস জাঁকাও
কেদারা ঠেসান দিয়ে খোড়াসা হেলাও।
প্রত্নতত্ত্ব তল্লাসীতে দিগগজ মসনদ
খড়ি মাড় নাই খাপে—আধোয়া গরদ।

'সাবাস হুজুক আজব সহরে' শীর্ষক রহস্য কবিতায় রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, এই চিত্রের সহিত তাহার তুলনা করুন :–

কেহ বলে আমি চাই অই সুব্রাহ্মণ।
পাকা দাড়ী সাদা চুল ঋষিটি যেমন ॥
বিদ্যের জাহাজ বুড়ো বৃদ্ধের নবীন।
খ্রীষ্টানের মুখপাৎ চোখানো সঙ্গিন ॥
আমার পছন্দ অই খ্রীষ্ট ভেকধারী।
সাপোর্টে দিলাম ভোট জিতি আর হারি ॥

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(দ্বাপুরে ভুষুণ্ডি বুড়ো সবেতে মহৎ)

আচার আমের সত্ব কুলকুটো ভাঁজ
যখন যেদিকে হাত তাতে ধড়িবাজ।
বাক্‌যুদ্ধে বাগ্মিতায় লেখার লড়ায়ে
রাজনীতি রচনায় সুর বাজখেঁয়ে।
ইংরিজি বিদ্যা বাগানে ফাষ্টরেট মালী
ইউরোপের কালীঘাটে পড়ে যার ডালি।
সকল বিদ্যার খই বুদ্ধি ভাজা খোলা
বিধি বিড়ম্বনে আজ কাণে গোঁজা শোলা।
অহংত্ব বড় বেশী নহিলে হাজার
রাজার মাথার চূড়ো তুল্য কে উহার ? †

আসর জাঁকায়ে বসো তুমি অতঃপর
গাল জোড়া ফ্যাসা গোঁপ বুড়ো প্যাগম্বর।
চুচুড়ার কিনারায় যার পীঠস্থান
হৃদয় ক্ষীরের খনি আকারে পাঠান।
হাঁসারণ্ডা খাসা বুড়ো মাথা জ্ঞানগুড়ে
নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের ঝাড়ে।

† সাবাস হুজুক আজব সহরে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের চিত্র দেখুন—

কোন জন বলে সাহেব ঐটী আমায় দাও ॥
কেঁড়ে কেতাব উড়ে কীর্ত্তি বগলে যাহার।
এলেম্ ভরা ডি-এল মারা পছন্দ আমার ॥

ডাঃ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সি-আই-ই
(বগলে পুঁটুলি বাঁধা কেতাবের পোকা)

হেমচন্দ্র

ইংরিজি শিক্ষার ফুল বাঙালী শিকড়ে
স্বতেজে উঠেছে উচ্চ শিখরের চূড়ে।
তর্কেতে তক্ষক যেন তেজে তেজপাতা
শিক্ষাব্রত সিদ্ধকামে শিক্ষকের মাথা।
বচন বটের ফল ধীরে ধীরে পড়ে
দেশের দোছোট বটো---মোদ্দা কথা পড়ে
ধনে মানে কুলে যশে পদে পাকা তাল
সেকেলের মাঝে এক সুন্দর প্রবাল।
নবগ্রহ পুজা কালে আগে যার ভাগ
দেখো হে পুতুল রাজা বাঙালীর বাঘ।

তুমিও আসরে এসে বসো একবার
কলিতে কাঁসারী কুলে প্রভা জ্বলে যার। *
কণ্ঠে তুলসীর মালা দীনহীন বেশ
কাঁধেতে চাদর ফেলা পোষাকের শেষ।
সহরের দীন দুঃখী দরিদ্র অনাথ
আনন্দে দু'হাত তোলে যখনি সাক্ষাৎ
চাহিয়া তোমার দিকে তাকায় আকাশে
শিশুর চক্ষুর ধারা মুছে চীর বাসে ।
ভয় নাই এসো তুমি আছে অধিকার
বসিতে এদের পাশে "ছাড়" বিধাতার,

---

* তারকনাথ প্রামাণিক।

ভুদেব মুখোপাধ্যায় সি-আই-ই

কি হবে কোমর পেটী কে চায় চাপরাস্।
অনাথ তারক নামে পেয়েছো যে 'পাশ'
তরে যাবে তারি গুণে সকল দুয়ার।

কবিতাটির শেষভাগে কবি লিখিয়াছিলেন :—

আসর বর্ণনা আদ্য ইপ আমার।
"বড় বড় বুড়ে, বুড়ো চুনে নিনু কটা।
ফিরে ত', বার আসর নেবো মাথায় বেঁধে ফ্যাটা॥
গাইব তখন আবার শুনো গুণটা যেমন যার
আল্লা গৌর বলো এখন বেলা দুপুর পার।
শ্রীপাঠ কলকাতা তন্ত্রে অধ্যায় প্রথম
হুতোম প্যাচার গান নরম গরম॥"

কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা ও পারিবারিক অশান্তি নিবন্ধন কবি আর ফ্যাটা বাঁধিয়া আসরে নামেন নাই।

'প্রচার।' যে সময়ে নবজীবন পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় সেই সময়েই (অর্থাৎ ১২৯১ সালে ১৫ই শ্রাবণ) বঙ্কিম চন্দ্র অক্ষয় চন্দ্রের "মহাদৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া" "সত্য, ধর্ম্ম, এবং আনন্দের প্রচারের জন্য" প্রচার নামক মাসিকপত্র প্রবর্ত্তিত করেন।

প্রথমে উক্ত পত্রের শিরোভাগে সম্পাদকের নাম থাকিত না, কারণ বঙ্কিমচন্দ্র পত্র সূচনায় লিখিয়াছিলেন, "সম্পাদক কে, পাঠকের জানিবার কোন প্রয়োজন নাই ; কেননা পাঠকেরা প্রবন্ধ পড়িবেন, সম্পাদককে পড়িবেন না।" পরে বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম সম্পাদক বলিয়া উল্লেখিত হইত, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ংই উক্ত পত্রের যথার্থ সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গদর্শন বিলুপ্ত করিয়া নূতন মাসিকপত্র প্রচার করিবার কারণও পত্রসূচনায় বঙ্কিমচন্দ্রই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—"সমুদ্রে জাহাজও আছে, ডিঙ্গীও আছে। তবে ডিঙ্গীর এই গুণ, জাহাজ সব স্থানে চলে না, ডিঙ্গী সব স্থানে চলে। যেখানে জাহাজ চলে না, আমরা সেইখানে ডিঙ্গী চালাইব। চড়ায় ঠেকিয়া বঙ্গদর্শন জাহাজ বানচাল হইয়া গেল—প্রচার ডিঙ্গী, এ হাঁটু জলেও নির্ব্বিঘ্নে ভাসিয়া যাইবে ভরসা আছে।"

"প্রচারে" বঙ্কিমচন্দ্র সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় কৃষ্ণ-চরিত্র এবং অন্যান্য ধর্ম্ম বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রচারের আকার অতি ক্ষুদ্র ছিল—১২ পেজী তিন ফর্ম্মা মাত্র। এই ক্ষুদ্র আকার করিবার

জন্য সম্পাদক নিম্নলিখিত কারণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন :—

"যাঁহাদিগকে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে হয়, অর্থচিন্তায় এবং সংসারের জ্বালায় শশব্যস্ত, মহাজনের তাড়নায় বিব্রত, এক মাসে ছয় ফর্ম্মা পড়া তাঁহারা বিড়ম্বনা মনে করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই টাকা দিয়া বা না দিয়া ছয় ফর্ম্মার মাসিকপত্র লইয়া দুই একবার চক্ষু বুলাইয়া তক্তপোষের উপর ফেলিয়া রাখেন। তারপর সেই জ্ঞানবুদ্ধিবিস্তারসপরিপূর্ণ মাসিক পত্রখণ্ড ক্রমে ক্রমে গড়াইতে গড়াইতে তক্তপোষের নীচে পড়িয়া যায়। ক্ষরমান দীপতৈল তাহাকে নিষিক্ত করিতে থাকে। বুভুক্ষু পিপীলিকা জাতি তদুপরি বিহার করিতে থাকে। এবং পরিশেষে তাহা বালকেরা অধিকৃত করিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া, লেজ বাঁধিয়া দিয়া, ঘুড়ী করিয়া উড়াইয়া দেয়—হেমবাবু রবীন্দ্র বাবু, নবীন বাবুর কবিতা, দ্বিজেন্দ্র বাবু, যোগেন্দ্র বাবুর দর্শনশাস্ত্র ; বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস, চন্দ্রবাবুর সমালোচন, কালীপ্রসন্ন বাবুর চিন্তা সূত্রবদ্ধ হইয়া পবন পথে উত্থানপূর্ব্বক বালকমণ্ডলীর নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতে থাকে। আর যে খণ্ড সৌভাগ্যশালী হইয়া অন্তঃপুর

মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার ত কথাই নাই। উনন ধরান, মশলা বাঁধা, মোছা মাজা ঘসা প্রভৃতি নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সে পত্র নিজ সাময়িক জীবন চরিতার্থ করে। এমন হইতে পারে যে, ইহা সাময়িক পত্রের পক্ষে সদ্গতি বটে এবং ছয় ফর্ম্মার স্থানে তিন ফর্ম্মা আদেশ করিয়া প্রচার যে গত্যন্তর প্রাপ্ত হইবেন, এমন বোধ হয় না; গত্যন্তরও বেনের দোকান ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। তবে তিন ফর্ম্মায় এই ভরসা করা যাইতে পারে যে, ছেলের ঘুড়ী হইবার আগে বাপের পড়া হইতে পারে; এবং পাক-শালের কার্য্য নির্ব্বাহে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে গৃহিণী-দিগের সহিত প্রচারের কিছু সদালাপ হইতে পারে।"

অনুরুদ্ধ হইয়া হেমচন্দ্র প্রচারেও কতকগুলি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১২৯১—সংসার।

৩য় সংখ্যা, আশ্বিন —দেশলাইএর স্তব।

২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা, কার্ত্তিক ১২৯২—গঙ্গার স্তোত্র।

(হরিদ্বারের নিকট গঙ্গাদর্শনে)

৪র্থ খণ্ড ১১-২২শ সংখ্যা, ফাল্গুন চৈত্র, ১২৯৫।

বন্দে মাতর্গঙ্গে—

কবি সংসারের নানাবিধ দুঃখ ক্লেশ অশান্তি ভোগ করিয়াও "সংসার" শীর্ষক কবিতায় বলিতেছেন—

"আমারে চরণ তলে, মথিস যতই বলে,
যতই গরল তুই করিস উদ্গার,
সংসার, তোরই ওমুখে চাহিয়ে থাকিব দুখে
তোরে ছাড়ি এ জগতে কি দেখিব আর?
তুই এ ব্রহ্মাণ্ড মাঝে সত্যের সাকার।
সংসার তোরই ও মুখে হেরিব আবার সুখে
হেরিব যেরূপ ভাবি আশাপথ চাই।
'আমি যার সে আমার' এই বাক্য যবে সার,
হবে এই ভবতলে, সবার সবাই।
সংসার তোতেই আমি ব্রহ্মরূপ পাই।

'দেশলাইএর স্তব' একটি রহস্য কবিতা,—অক্ষয় চন্দ্রের মতে 'বিড়ম্বনা'—কারণ, বোধ হয়, উহা 'নব জীবনে' প্রকাশিত না হইয়া 'প্রচারে' প্রকাশিত হইয়াছিল। ডেপুটী বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত "প্রচারে" কবি দেশলাইএর রূপ বর্ণনায় বলিয়াছেন—

হেমচন্দ্র

"যেন বা ডিপুটী খাঁটী একহারা চেহারা
মাথায় শালের বিঁড়ে---রাগে প্রাণভরা।

*　　*　　*　　*

শান্ত সভ্য অতি ধীর শুয়ে যতক্ষণ"
গা ঘেঁষিলে চটে লাল---গৌরাঙ্গ যেমন।"

'গঙ্গার স্তোত্রটি' হরিদ্বারের নিকট গঙ্গাদর্শনে লিখিত। হেমচন্দ্রের বাল্যবন্ধু নীলমণি কুমার মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে উহা সম্পূর্ণ অচিন্তিতপূর্ব্ব এবং যথার্থই গঙ্গাতীরে বসিয়া সদ্য সদ্য (Extempore) রচিত হয়। ব্রাহ্মণ কবি হেমচন্দ্র পূতসলিলা গঙ্গার যথার্থই একজন উপাসক ছিলেন। তাঁহার গঙ্গাবিষয়ক কবিতাগুলি সমস্তই অতি মধুর এবং সনাতন ধর্ম্মভাবোদ্দীপক। অন্ততঃ হিন্দুর নিকট তদ্বিরচিত গঙ্গার মহিমা-গাথা চিরদিনই মধুর বলিয়া প্রতীত হইবে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভগবান শঙ্করাচার্য্য দেবভাষায় যে উদাত্তস্বরে গঙ্গার মহিমা গাহিয়াছিলেন, সেই ধ্বনি "বন্দে মাতর্গঙ্গে" শীর্ষক কবিতার স্থানে স্থানে জাতীয় কবি হেমচন্দ্র তাঁহার অমর ভাষায় প্রতিধ্বনিত করিয়া স্বজাতিকে মাতাইয়াছেন। এই কবিতার শেষভাগে কবি যে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা কি আন্তরিকতাপূর্ণ!—

গঙ্গে অঙ্কে তব অন্তে কি স্থান পাব দেহ মিলাব মাগো
তব পুণ্য তোয়ে,
ভ্রান্ত নিতান্ত মা দিও পদচ্ছায়া তাপতপ্ত কায়া
ষড়রিপু রঙ্গে,
সর্ব্ব পাতক হয়া গঙ্গে রুদ্রশেখরা স্বর্গসরিদ্বরা
লৈও মা সঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।

এই চিরমধুর ধ্বনি সেদিনও আমরা হেমচন্দ্রের মানস সন্তান, আর্য্যগাথার স্বজাতিপ্রেমিক কবি দ্বিজেন্দ্র-লালের মুখে শুনিয়াছি—

পরিহরি ভবসুখদুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে,
মা ভাগীরথি। জাহ্নবি। সুরধুনি। কলকল্লোলিনি গঙ্গে।

গ্রন্থাবলী প্রকাশ। এই সময়ে বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান কবি হেমচন্দ্রের কাব্যের কিরূপ আদর হইয়াছিল পাঠক-গণ পূর্ব্বেই তাহার আভাস পাইয়াছেন। কবিতাবলী ও বৃত্রসংহারের তিনটি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া এই সময়ে নিঃশেষিতপ্রায় হয় এবং তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলী একত্রে প্রকাশিত হইবার অভাব অনুভূত হয়। ক্যানিং

লাইব্রেরীর সুযোগ্য স্বত্বাধিকারী, বহু সদ্‌গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হেমচন্দ্রের অনুমতি গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকগণের এই অভাব দূরীকরণার্থ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে (সন ১২৯১ সালে) হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত করেন। উহাতে হেমচন্দ্রের পূর্ব্বপ্রকাশিত সমস্ত কাব্যগ্রন্থ, এবং 'নবজীবন' ও 'প্রচারে' নবপ্রকাশিত—'দেশলাইএর স্তব' 'সংসার' ও 'মদন পূজা' এই কবিতাত্রয় প্রকাশিত হয়। উহাতে হিন্দী হইতে হেমচন্দ্র কর্ত্তৃক বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত কতকগুলি দোঁহাও "দোঁহাবলী" নামে প্রকাশিত হয়। এই দোঁহাবলী রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"হেমচন্দ্রের বাড়ীতে বিখ্যাত মনীষী যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সহিত আমার পরিচয় হয়। ৺নীলকণ্ঠ মজুমদার পরিচয় করাইয়া দেন। একদিন কথায় কথায় —'তুলসীদাস' ও 'কবীরের' দোঁহার কথা উঠিল। আমি গোটাকয়েক দোঁহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলাম। হেমচন্দ্র বলিলেন—"এগুলির ত বাঙ্গালা করিলে হয়।" আমি বলিলাম,—"হইবে না কেন? একটু চেষ্টা

করিলেই হয়!" অমনি সঙ্গে সঙ্গে কাশীতে ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের নিকট পত্র লেখা হইল, তিনি যেন ফেরত ডাকে তুলসীদাসের ছাপা দোঁহাবলী সকল পাঠাইয়া দেন। সেই ঝোঁকেই যে কয়টা দোঁহার অনুবাদ হইয়াছিল, পরে আর হয় নাই। হেমচন্দ্র ঝোঁকের উপর সব লিখিতেন। যখন কিছু লিখিতে বসিতেন, তখন যেন বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। ঝোঁক ছুটিলেই সব যাইত। তাঁহার বাড়ীতে যে কত অসম্পূর্ণ কবিতা আমি দেখিয়াছি তাহা আর বলিতে পারি না। সে সব যে কোথায় গেল, কে জানে?"

এক একটি দোঁহার অনুবাদ অতি সুন্দর। আমাদের এই মতের সমর্থনে নিম্নে দুইটি মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল :—

সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে, জ্ঞান করে উপদেশ।
তও কোয়লা কি ময়লা ছোটে, যও আগ করে পরবেশ।

সদ্‌গুরু যদি হয়, ভাব ভেঙ্গে জ্ঞান দেয়, উপদেশে যদি বসে মন।
সব মলা ঘুচে যায়, কালো আঙ্গারের প্রায় অগ্নি তায় প্রবেশে যখন।

হেমচন্দ্র

তুলসী যব জগমে আয়ো, জগো হসে তোম রোয় ।
অ্যায়সে কর্ণি কর্‌চলো কি, তোম্ হসো জগো রোয় ॥

তুলসী সংসার মাঝে, আইলে যখন ।
জগৎ হেসেছে, তুমি করেছ ক্রন্দন ॥
হেন কাজ করে চলো. জগৎ মাঝার ।
তুমি হেসে চলে যাবে, কাঁদিবে সংসার ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—:•:—

পারিবারিক দুঃখ ও অশান্তি। 'নাকে খৎ।'

পারিবারিক দুঃখ ও অশান্তি। সংসারাশ্রমে মানুষকে অনেক দুঃখক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যাঁহার হৃদয় স্নেহ ও মমতায় পরিপূর্ণ, যাঁহার হৃদয় কুসুমাপেক্ষা কোমল, তাঁহার উপর সাংসারিক বিপদ ও দুঃখের ঝঞ্ঝাবাত প্রবল ভাবে পরাক্রম প্রকাশ করে। কবি হেমচন্দ্রের হৃদয় কুসুমাপেক্ষা কোমল ছিল, সুতরাং সংসারে তাঁহাকে অনেক দুঃখ ও অশান্তির অসহ্য কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি পুরুষোচিত ধৈর্য্যের সহিত এই সকল ক্লেশ সহ্য করিয়া যদিও বলিয়াছিলেন

"আমারে চরণ তলে, মথিস যতই বলে
যতই গরল তুই করিস উদ্গার
সংসার তোরই ও মুখে চাহিয়ে থাকিব দুখে
তোরে ছাড়ি এ জগতে কি দেখিব

তথাপি সময়ে সময়ে এক একটি পারিবারিক দুর্ঘটনায় তাঁহার হৃদয়ের এক একটি পঞ্জর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। হেমচন্দ্রের পরিবার বৃহৎ ছিল। তাঁহার ভ্রাতা, ভগিনী এবং দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়গণের পরিবারও তাঁহারই পরিবারের অন্তর্গত ছিল। বিশ্বপ্রেমে পাগল কবি ত কথনও পাঁচ জনের ন্যায় নিজ স্বার্থান্বেষণে ব্যাপৃত হন নাই, আত্মপর প্রভেদ করেন নাই—

লোকে করে যা আমি করি না
লোকে ভাবে যা আমি ভাবি না
পাঁচের মত নই হতে পারি না
পারিলাম(ও)না এ ভূতলে।
আর যত সবে কত সুখে ধায়
কত আশা করে কত দিকে যায়,
দুখ শূলে বেঁধা তবু সুখময়
ভাবে সকলে।
তারা জানে না পর-বেদনা,
কভু ভাবেনা নিজ যাতনা
হৃদি তাড়না সহে বাসনা
কু-ছলে।

হেমচন্দ্রের বৃহৎ পরিবারে বহুবার রোগ ও মৃত্যুর ছায়া পতিত হইয়াছে, এবং হেমচন্দ্রের কোমল হৃদয়কে

ব্যথিত ও সন্তপ্ত করিয়াছে। জীবনপ্রভাতে যে কবি লিখিয়াছিলেন "ভেবেছিনু সমুদয় পৃথিবীর সুখময়" তিনিই জীবনের অপরাহ্নে লিখিয়াছিলেন—

যে ছবি হৃদয়ে ধরে ফিরেছি ভুবন পরে,
এসেছি বসেছি ঘরে কটি তার জাগিছে?
আশায় মোহের ছল বাহুতে দিয়াছে বল
এবে তার আছে কটি—কটি তার ফুটিছে?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হেমচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী অশিক্ষিতা ও বুদ্ধিহীনা রমণী ছিলেন, সুতরাং এই সকল সাংসারিক বিপদে হেমচন্দ্রকেই সকল দিক দেখিতে হইত। আমাদের সংগৃহীত হেমচন্দ্র ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্রের কতকগুলি পত্র হইতে এই সময়ের কতকগুলি পারিবারিক ঘটনা জানিতে পারা যায়।

২১শে জুলাই ১৮৮২ সালে লিখিত, ঈশানচন্দ্রের একখানি পত্রে, তাঁহার একটি সন্তানবিয়োগের সংবাদ আছে। (পত্রখানি হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত।)

হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলা দেবী প্রায়ই পিতৃগৃহে আসিতেন এবং তাঁহার পুত্রকন্যাগণের রোগ হেমচন্দ্রকে কম উদ্বিগ্ন করিত না। বিচারালয়ে উপস্থিত

না হইয়া স্নেহশীল মাতামহ, দৌহিত্র দৌহিত্রীদিগের রোগশয্যার পার্শ্বে উদ্বিগ্নচিত্তে বসিয়া থাকিতেন :—

13th Sept. 82

My dear Benode

Following is the budget of news for you.

বড়খুকি—Very nearly all right.

মেজখুকি—Better—the bronchitis still troublesome at night.

খোকা—Comparatively much better. Fever has not completely left but much less and the child is much quieter.

Dr. Soorjee Babu did not come yesterday. But I have written to him with an urgent request and I have no doubt he will come today. I do not go to court on purpose to meet Soorjee Babu.

Pray do come over and see the children for yourself

Yours affly

(Sd.) Hem C. Banerjee.

হেমচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীর সামাজিক কর্ত্তব্যে অবহেলার জন্য আত্মীয়গণের নিকট হেমচন্দ্রকেই তিরস্কার ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। তাঁহাকেই পদে পদে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইত। নিম্নোদ্ধৃত পত্রে হেমচন্দ্রের পারিবারিক অশান্তির আভাস পাওয়া যায়।

Kidderpore
12 12 82

My dear Behye

I confess to being defeated—thoroughly defeated—in my efforts to get the ladies here (at least some of them) transported to your place. These stupid things are so very unreasonable and filled with old world ideas that I am thoroughly disgusted with them. All I can do to atone for this is to beg your humble pardon. Do for goodness not get annoyed and have some pity for me, I trust Benode too, his mother and wife will be disposed to be lenient to me knowing my unhappy position in the family.

Yours affly
(Sd.) Hem Chandra Banerjee

বলা বাহুল্য হেমচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীর সামাজিক কর্ত্তব্যে অবহেলার জন্য আত্মীয়ারা সময়ে সময়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। ইঁহাদিগের মর্যাদারক্ষার ভার হেমচন্দ্রকেই গ্রহণ করিতে হইত।

হেমচন্দ্র স্বয়ং সামাজিক কর্ত্তব্যে কখনও অবহেলা করিতেন না। মধ্যমা কন্যার বিবাহের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত একবার এক দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বৈবাহিকগৃহে নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া বৈবাহিকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা-পূর্ব্বক যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

15 12 82

My dear Behye

Believe me I am a very unfortunate man. The more I wish to avoid giving offence in any shape the greater culprit circumstances make me appear to be. I am, my dear Gopal Babu, placed between Scylla and Charybdis and I see no escape from the difficulty. I am obliged again to

ask your indulgence. I had thought of positively joining you on Sunday next, as I am in duty bound, on the *Annoprasan* occasion, rather the feast, and thus make up my shortcomings in other respects of which I am only too painfully conscious. But to do this and be back *in time* to receive the party from Baniatollah (who are coming to see my daughter Goolee the very Sunday between 2 & 3 P. M.) is, I am afraid, impossible. My absence from home on that day would throw everything out of joint here ; neither could I be easy in mind, nor doing my duty by you on an occasion such as this, if I were simply to run over to you and come back the moment after in the forenoon. You know my dear friend, in what a harrowing state of mind I am (at any rate you have my solemn assurance for it) about the disposal of my poor unfortunate Goolee. If you can find no pity in your heart for me, do have some pity for the poor girl and excuse me for this apparent incivility

for her sake. The sooner this match is settled the better for the little thing. I could not venture, under all these circumstances to ask them to postpone the visit to some other day, nor could I tell you of this when last we met as the appointment was made by the bridegroom's father only last Wednesday.

My dear Behye, I have truly and candidly spoken out my mind and tried to give an honest explanation—not a mere apology or excuse. It remains for you, your good wife, and my daughter to accept it or not. If it be I shall consider myself happy to find that I am not *disbelieved* whatever my shortcomings in other respects ; if it be not and I am not forgiven I shall consider the recurrence of such an obstacle as only too unfortunate. But I hope to be pardoned by you all. I have apologised separately to Benode.

Yours in all sincerity
(Sd.) Hem C. Banerjee.

হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলা দেবীর একটী সন্তান ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে গতাসু হয়। এই ঘটনায় হেমচন্দ্র কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য।

কিন্তু পর বৎসর হেমচন্দ্র আরও একটী ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হন। তাহার বিষয় বলিতেছি।

মাতৃবিয়োগ। পিতৃবিয়োগের পরে লিখিত একটি কবিতায় হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

সাধের বাগান ভাঙ্গা চেয়ে দেখ হায়।
ছায়া করে ছিল তাহে যেই দুটী তরু,
বসিতাম তলে যার যবে ভার গুরু
একটি তাহার হায়, সমূলে ভাঙ্গিয়া
গিয়াছে কোথায় চলে সঙ্গিনী ছাড়িয়া।
বল্মীকেতে জরজর নীরস শরীর,
সেও হায় গতপ্রায় বজ্রাহত শির।
রোপিনু যে এত সাধে ফুলতরু কাঁধে কাঁধে
কটি তরু আছে বল তার?
কটি বল ফুটে আছে দাঁড়াইলে কার কাছে
সেই ঘ্রাণ ছোটে পুনর্ব্বার।

যাঁহার ছায়ায় বসিয়া হেমচন্দ্র সংসারের সকল শোক, দুঃখ, বিপদ ও যন্ত্রণার কথা বিস্মৃত হইতেন

সেই স্নেহময়ী জননী আনন্দময়ীর কাল পূর্ণ হইয়াছিল। মাতৃভক্ত কবি হেমচন্দ্রের রচনাবলীর নানাস্থানে মাতৃস্নেহের যে অপার্থিব চিত্র অঙ্কিত আছে সে চিত্রের আদর্শের জন্য হেমচন্দ্র জননীর নিকট ঋণী। 'আশা-কাননে' কবি লিখিয়াছিলেন—

মাতার স্নেহের হ্রদ
সুধা হইতে মিষ্ট সলিল ইহার বিনাশে সর্ব্ব বিপদ ;
কেহ কোন কালে এ সুধা সলিলে বঞ্চিত নহে অদ্যাপি,
চিরকাল ইহা আছে এইরূপ অগাধ অক্ষয় বাপী।
অই যে দেখিছ মাধুরীর রাশি নারীরূপ নিরুপমা,
দেবীমূর্ত্তি ধরি জননীর স্নেহ প্রকাশে হের সুষমা,
প্রকাশি এখানে বিতরে সলিল রাখিতে প্রাণীর কুল,
জগৎ ভিতরে এই সুধানীর এ মূর্ত্তি নিত্য অতুল।

—এই মাতার স্নেহের হ্রদ অকস্মাৎ শুকাইয়া গেল, যে সুধা পান করিয়া কবি সকল বিপদ জয় করিয়াছিলেন সেই সুধা হইতে তিনি বঞ্চিত হইলেন। হেমচন্দ্রের মাতৃবিয়োগ সম্বন্ধে তদীয় বন্ধু রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুরের রোজনামচা হইতে দুইটী পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

1. 1, 85. Go to Khidderpore and see Hem. His mother has met with an accident.

22. 1. 85. Present at Sradh of Hem's mother.

হেমচন্দ্রের জননী আনন্দময়ীর মৃত্যুসম্বন্ধে হেমচন্দ্রের মধ্যম জামাতা নিম্নলিখিত বিবরণ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন :—

"হেমচন্দ্রের মাতা প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে পাড়ার অন্যান্য স্ত্রীলোকের সহিত গঙ্গাস্নানে যাইতেন। একদিন ঐরূপ যাইতেছেন এমন সময় আড়গড়ার একখানা ব্রেক তাঁহার পশ্চাৎ ভাগে আসিয়া পড়ে। আনন্দময়ী ভয়ে অভিভূত হইয়া পার্শ্বস্থিত road ballast এর গাদার উপর পড়িয়া গিয়া বিষম আঘাত প্রাপ্ত হয়েন। সেই সূত্রে দিন কয়েক পরে খিদিরপুর পুলের নীচে আদিগঙ্গার তীরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র পূর্ণচন্দ্র বারাণসী হইতে আসিয়া তাঁহাকে তীরস্থ করেন। সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী ইহাতে এত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন যে সন্ধ্যার সময় রোগী দেখিতে আসিয়া তাঁহাকে তীরস্থ করান হইয়াছে শুনিয়া তিনি

বারম্বার বলিতে লাগিলেন, "I shall never forget this—Purna will be responsible for this act—আমি আর কখনও তাহার মুখ দেখিতে পারিব না।" হেমচন্দ্র অনেক করিয়া বুঝাইলেন, বলিলেন, "দেখ সূর্য্য, পূর্ণরও ত মা কেবল আমাদেরই নয়। কেন এত রাগ কর? সে বুঝিয়াছে তাই করিয়াছে।" সূর্য্য বাবুর কিন্তু দুঃখ রাখিবার স্থান ছিল না। ফলে কিন্তু পূর্ণ বাবুর কথাই ফলিল। তীরস্থ করিবার পর দিনেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তখন সূর্য্য বাবু একটু লজ্জিত হইয়াছিলেন।"

বলা বাহুল্য স্নেহময়ী জননীর পরলোক গমনে মাতৃভক্ত হেমচন্দ্র নিরতিশয় শোকাভিভূত হন। কিছু পূর্ব্বে একজন জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে হেমচন্দ্র শেষ জীবনে মহাদুঃখে পতিত হইবেন। হেমচন্দ্র এই ঘটনাতেই জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে মনে করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "জীবনে ইহার অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?"

হেমচন্দ্র মহাসমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয়

করিয়াছিলেন। তখনকার সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি উক্ত শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার বাটীতে সমাগত হইয়াছিলেন। জননীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ হেমচন্দ্র গঙ্গায় একটি ঘাটও নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

মাতৃবিয়োগের পর হেমচন্দ্র হরিদ্বার প্রভৃতি নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার শোকানল নির্ব্বাপিত হয় নাই। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর দিবসে রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর ডায়েরিতে লিখিয়াছেন—

I see poet and friend Hem at his house at Khidderpore. Nilmoney joins. We talk. Hem reads his poem on তপোবন and Moonrise in the Himalayas. He visited Hardwar in October and has put down his thoughts in writing etc. He presents me a complete edition of his works. *He talks of life despondingly and I am much moved.* Take tiffin at his. Jogendra joins.

"হরিদ্বার" ও "হরিদ্বারের নিকট গঙ্গাদর্শনে" শীর্ষক কবিতাদ্বয়ের বিষয় পূর্ব্বপরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে। "তপোবন ও হিমালয়ে চন্দ্রোদয়" সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের কোন

কবিতা আমাদের নয়নগোচর হয় নাই, কিন্তু 'নবজীবনে' তপোবন ও হিমালয়ে চন্দ্রোদয় বিষয়ক ঈশানচন্দ্রের একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। হেমচন্দ্রকে পাঠ করিতে শুনিয়া ঈশানচন্দ্রের কবিতাটিই হেমচন্দ্রের রচিত বলিয়া কালিকাদাস অনুমান করিয়াছিলেন, কিংবা ঐ বিষয়ে হেমচন্দ্র একটি স্বতন্ত্র কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহা ঠিক বলা যায় না।

এই সময়ে হেমচন্দ্র "লছমন্ ঝোলা" শীর্ষক একটি কবিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উহা কবিবরের মৃত্যুর বহুদিন পরে "নাট্যমন্দির" নামক মাসিকপত্রে ১৩১৯ সালে শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'নাকে খৎ।' মাতৃবিয়োগকাতর হেমচন্দ্রের বন্ধুগণ তাঁহাকে প্রফুল্ল রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। হেমচন্দ্র রঙ্গরহস্য ভালবাসিতেন এবং সময়ে সময়ে কৌতুক রহস্যে যোগদান করিতেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময় অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেন।

এই ঘটনার পর একবার মাত্র 'বাজী মাতে'র কবির লেখনী হইতে একটি প্রহসন বিনির্গত হইয়াছিল।

প্রহসনটীর নাম 'নাকে খৎ'। ইহার ইতিহাস সম্বন্ধে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন—

"হাইকোর্টের উকিলদিগকে প্রতিবৎসর আদালতে পঞ্চাশ টাকা জমা দিতে হয়। আমি একবার ভুলক্রমে পঞ্চাশ টাকার পরিবর্ত্তে একখানা পাঁচশত টাকার নোট জমা দিবার জন্য উমাকালীর (উমাকালী মুখোপাধ্যায়) হস্তে দিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস আমি পঞ্চাশ টাকাই দিয়াছি। উমাকালী খুব সাকুব লোক, সে তৎক্ষণাৎ আমার ভুল বুঝিতে পারিয়া আমাকে কিছু না বলিয়া, সেই নোটখানি লইয়া হেমবাবুর নিকটে যায়। হেমবাবু এই ব্যাপারটি অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক রচনা করিয়া ফেলেন।"

এই রহস্যকাব্যটি শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত অধুনাবিলুপ্ত "আর্য্যাবর্ত্ত" নামক মাসিকপত্রে এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "পুরাতন প্রসঙ্গে"র পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে উহার বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করা অনাবশ্যক।

শারীরিক অসুস্থতা ও আয় হানি। এই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতেই হেমচন্দ্র স্বয়ং অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। মাননীয় প্রভাসচন্দ্র মিত্র সি-আই-ই মহোদয়ের নিকট শুনিয়াছি যে তিনি বাত রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রায় এক বৎসরকাল নিয়মিত ভাবে হাইকোর্টে উপস্থিত হইতে পারিতেন না। এই কারণে তাঁহার আয়ও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টে আর একজন উকীলকে বিচারপতির পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়। এই সময়ে হেমচন্দ্রকে উক্ত পদ প্রদান করিলে তিনি নিশ্চয়ই আনন্দের সহিত উহা গ্রহণ করিতেন। ৺নীলমণি কুমারের নিকট শুনিয়াছি হেমচন্দ্রের কোন কোন বন্ধু পরামর্শ দেন, "হেম, এই সময়ে—র ন্যায় একটু উদ্যোগী হইয়া উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের সহিত সাক্ষাৎ কর।" হেমচন্দ্র তদুত্তরে বলেন, "হেম বাঁড়ুয্যের দ্বারা ঐ কাজটি কোন মতেই হবে না।" সেবার স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন।

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিপত্তি। পারিবারিক দুঃখ ও অশান্তি এবং শারীরিক অসুস্থতা, কর্ম্মক্ষেত্রে

নৈরাশ্য ও আয়ের হ্রাস প্রাপ্তি, প্রভৃতি নানা কারণে হেমচন্দ্র ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। যে প্রোজ্জ্বল প্রতিভা কি গীতিকাব্য রচনায়, কি মহাকাব্য প্রণয়নে কি রহস্য কবিতার সৃজনে, কি আধ্যাত্মিক কাব্য সৃষ্টিতে, কাব্যজগতের সমস্ত দিকেই অপূর্ব্ব আলোক বিকীরিত করিয়াছিল, এই সকল কারণে সেই প্রতিভা মেঘান্তরালবর্ত্তী সূর্য্যের ন্যায় অকস্মাৎ ক্ষীণপ্রভ হইয়া গেল। ভারত সঙ্গীত, বৃত্রসংহার বা দশমহাবিদ্যার ন্যায় আর কোন কাব্য হেমচন্দ্রের লেখনী হইতে অতঃপর বিনির্গত হয় নাই। মধ্যে মধ্যে দুই একস্থানে সেই উজ্জ্বলা প্রতিভার বিদ্যুদ্বিকাশ পরিদৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত যশোরশ্মির সহিত তুলনীয় নহে। নূতন কাব্যাদি রচনা না করিলেও এই সময়ে সাহিত্যক্ষেত্রে হেমচন্দ্রের ন্যায় প্রতিপত্তি আর কাহারও ছিল না। এই সময়েই তাঁহার গ্রন্থাবলী গৃহে গৃহে আদরের সহিত পঠিত হইত। এই সময়ে নূতন কবিগণ হেমচন্দ্রের অনুকরণে কবিতা রচনা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখকগণ স্বকীয় গ্রন্থাদি সম্বন্ধে কবিসম্রাট্ হেমচন্দ্রের অভিমত জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেন,

তাঁহার অনুকূল অভিমতে প্রোৎসাহিত হইতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ৺উমাকালী মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের একখানি পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতে পারে।

20, Beadon Street.
8th Dec. 1885

* * * Believe me, I have read with very great pleasure your opinion and those of Romesh Babu and Hem Babu about my novels. Praise from such men is worth having—it is what I have looked for, it is what I have ever regarded as my highest reward. * * * *

I remain, yours sinly.
Sd. R. C. Dutt.

দুহিতৃবিয়োগ। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র আর একটি শোকের ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হন। এই বৎসর নভেম্বর মাসে তাঁহার মধ্যমা কন্তা সুরবালা দেবী অকালে—মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে—সূতিকারোগে কাল-কবলে পতিত হন। হেমচন্দ্র কন্যাগণকে প্রাণাপেক্ষা

ভাল বাসিতেন। এই আঘাতে তাঁহার হৃদয় একবারে ভাঙ্গিয়া যায়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "আমার স্ত্রীর মৃত্যুর বহুদিবস পরে একবার আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। সে সময় তিনি David Copperfield নামক পুস্তকখানি পাঠ করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া বলেন "কে আশু? ভাল আছ? বস।" আমি বসিলাম; কিন্তু তিনি আর আমার সহিত একটি কথাও কহিতে পারিলেন না—বইখানি বক্ষের উপর তুলিয়া ধরিলেন। —থর্ থর্ করিয়া এরূপ হাত কাঁপিতে লাগিল যে আমি আর সে দৃশ্য দেখিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া "আমি এখন আসি" বলিয়া উঠিয়া আসিলাম। তিনি জড়িত স্বরে উত্তর করিলেন, "আসবে? আচ্ছা এসো।" *

* সুরবালা দেবীর মৃত্যু সম্বন্ধীয় একটি ঘটনা তাঁহার স্বামী আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। যাঁহারা পরলোক-তত্ত্বের আলোচনা করেন, উহা তাঁহাদিগের অকিঞ্চিৎকর মনে না হইতে পারে এই বিবেচনায় নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"তাঁহার মৃত্যুর দুই একদিন পরেই আমি কলিকাতা হইতে মেদিনীপুরে চলিয়া আসি। তখন ষ্টীমার যোগে যাতায়াত

হেমচন্দ্র

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে হেমচন্দ্রের ভগ্নবীণায় আর ভারত সঙ্গীতের ন্যায় উদ্দীপনাময়ী গীতি ঝঙ্কৃত হয়

হইত। রেলপথ হয় নাই। আমার সঙ্গে আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন। আমি একটি পৃথক ক্যাবিনে ইচ্ছাপূর্ব্বক শুইয়াছিলাম মধ্যে মধ্যে একটু একটু তন্দ্রা আসিতেছিল। এই অবস্থায় রাত্রির এক ভাগে স্বপ্নে দেখিলাম যে আমার স্ত্রী যেন আমার উপরিভাগে hover করিয়া আমাকে একখানি পত্র দিবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু দিতে পারিতেছেন না। পরে যেন সেই পত্র আমার হস্তগত হইল, আমি খামখানি ছিঁড়িয়া তাহার contents পড়িয়া দেখিলাম যে তিনি আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া এই পত্র লিখিয়াছেন এবং তাহাতে হরিগুণকথা লিখিত আছে। ঘুম ভাঙ্গিয়া আমার জ্যেষ্ঠকে এই কথা বলিলাম ও আপন মনে কাঁদিলাম। পরে বাড়ী আসিয়া সকল আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে এই কথা বলিয়াছিলাম। এই ঘটনার আন্দাজ প্রায় দেড় বৎসর পরে আমি আবার কলিকাতায় পড়িতে যাই ও আমার ভায়রাভাই বিনোদ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার মানসে তাঁহাকে পত্র লিখি। পত্র পাইয়া বিনোদবাবু আমাদের মেসে আসেন ও একথা সেকথার পর বলেন যে "আসিবার সময় তোমার ঠাকুরঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তোমার ভগিনীর এমন কোনও জিনিস momento দিতে পার যাহা আমি আশুকে দিতে পারি? তিনি বলিলেন যে তাঁহার (আমার স্ত্রীর) বাক্সের মধ্যে আশুর নামের একখানি পত্র

নাই; আর বাজিমাতের ন্যায় রহস্যপূর্ণ কবিতায় বাঙ্গালী হাস্যরসের স্রোতে ভাসে নাই; আর বৃত্র-সংহারের ন্যায় মহাকাব্য দেশবাসীকে নূতন জীবনে উদ্বোধিত করে নাই; আর দশমহাবিদ্যায় ন্যায় স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত কাব্য মানবের কর্ত্তব্যপথ আলোকিত করে নাই। কিন্তু ইহার কারণ কি—কি নিমিত্ত হেমচন্দ্রের অলোকসামান্য প্রতিভার অবনতি ঘটিল তাহা বলিতে হইবে কি? অনেক স্থলে কবির জীবনের সহিত তাঁহার রচনার কিছু মাত্র সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কবি থাকিতে পারেন যাঁহার ধর্ম্মে কিছু মাত্র ভক্তি নাই, পরিবারের প্রতি কিছুমাত্র মমতা নাই, অথচ তিনি আত্মসুখ ও বিলাসিতার মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত, মানবের মঙ্গলের জন্য মহান আদর্শ অঙ্কনে নিযুক্ত। এমন কবি থাকিতে পারেন যিনি জীবনে নানা ধর্ম্ম-

লিখা ছিল কিন্তু হঠাৎ প্রসববেদনা উপস্থিত হওয়ায় সে পত্র ডাকে দেওয়া ঘটে নাই। তাহাতে বিশেষ কিছু লেখা ছিল না কেবল গুলি (আমার স্ত্রীর ডাক নাম) এ যাত্রা বাঁচিবে না মনে করিয়া আশুর নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছিল। তাহা নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে।" আমি তখন বিনোদ বাবুকে সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি শুনিয়া বিস্মিত হইলেন।"

বিগর্হিত অসৎ কার্য্য করিয়া কাব্য মধ্যে উচ্চকণ্ঠে ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের লেখনী কখনও গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করে নাই। তাঁহার কাব্যের উৎস হৃদয়ের অন্তস্তলে। এই হৃদয় যখন আনন্দে উচ্ছ্বসিত তখন কাব্যেও সেই আনন্দ প্রতিফলিত হইয়াছে, এই হৃদয় যখন দুঃখে বিগলিত তখন কাব্যেও সেই দুঃখ প্রতিভাসিত হইয়াছে, এই হৃদয় যখন উচ্চ সঙ্কল্পে অটল তখন কাব্যেও সেই দৃঢ়তা অভিব্যক্ত হইয়াছে, এই হৃদয় যখন ঈশ্বরে অসীম নির্ভরশীলতায় আত্মহারা তখন কাব্যেও সেই অসীম নির্ভর প্রকাশ পাইয়াছে। যখন কবির হৃদয় নৈরাশ্য ও শোকভারে অবনত হইয়াছে তখন কবির সেই অনন্য-সাধারণ প্রতিভারও অবনতি ঘটিয়াছে। সরস্বতীর বরপুত্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া যেন কমলা তাঁহার সাধের বীণাটী বলপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া দিলেন। কোনও বিশ্ব-বিশ্রুত সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ইতিহাস পাঠ করিতে যেরূপ, হেমচন্দ্রের কবিজীবনের শেষ অধ্যায়গুলি আলোচনা করিতে গেলেও সেইরূপ, নয়নদ্বয় অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। আমরা সংক্ষেপে সেই বিষাদময় জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—○:*:○—

জুবিলী উৎসব ও রাখীবন্ধন। পারিবারিক জীবন

জুবিলী উৎসব। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পুণ্যস্মৃতি মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বস্থানে মঙ্গল বাদ্য বাজিয়া উঠিল। ভারত-ভিক্ষা-রচয়িতার ভগ্নবীণাও ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব এই সময়ে রচিত হয়। উহার প্রকাশ কালে কলিকাতা গেজেটে নিম্নোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয়—

পুস্তকের নাম 'ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব' (The auspicious Jubilee of Her Majesty the Queen Empress) বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় রচিত কবিতা—ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে আই সি বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও পিপলস প্রেস হইতে নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশের তারিখ ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭। পত্রসংখ্যা ১১ ডিমাই আট পেজী। প্রথম সংস্করণ ১০০০ খণ্ড

মুদ্রিত হইল। মূল্য এক আনা মাত্র। গ্রন্থসত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—শ্রীহেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় খিদিরপুর। মন্তব্য—"Expresses loyalty to Her Majesty on the auspicious occasion of the completion of the 50th year of her reign. The writer expatiates on the vastness of her Empire and on the rarity of such celebrations."

উপহারের জন্য এই কবিতাগ্রন্থের একটি রাজ-সংস্করণও রয়েল ৪ পেজী আকারে নানাবর্ণের কালীতে অতিপরিপাটিভাবে মুদ্রিতহইয়াছিল। উক্ত সংস্করণে এক পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা মূল কবিতা ও পরপৃষ্ঠায় ইংরাজী কবিতায় উহার ভাবানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছিল। মহারাণীকে উপহার প্রদান করিবার জন্যই ইংরাজী অনুবাদটি মুদ্রিত হইয়াছিল।

ইংরাজী অনুবাদটি হেমচন্দ্রের নহে। হেমচন্দ্র কখনও ইংরাজী কবিতা লিখিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক প্রথম সম্পাদক গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুর পর এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক 'বেঙ্গলী'

পত্রের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কিছুকাল উক্ত পত্রের তাৎকালীন কার্য্যাধ্যক্ষ বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হেমচন্দ্রের বন্ধু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি দ্বারা সম্পাদকীয় প্রবন্ধাদি লিখাইয়া লইতেন। এই সময়ে উক্ত পত্রে "H" স্বাক্ষরিত দুই একটি ইংরাজী কবিতা উক্ত পত্রে প্রকাশিত হয়। উহা হেমচন্দ্রের রচিত বলিয়া সন্দেহ হয়, কিন্তু তাঁহার লিখিত কি না ঠিক বলা যায় না। হেমচন্দ্রের এক জামাতা বলেন যে তাঁহার নিকট চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে ইংরাজী কবিতায় লিখিত হেমচন্দ্রের একখানি পত্র ছিল "পত্রখানি তিনি মধুপুর হইতে লিখিয়া ছিলেন। তাহাতে নানা ঠাট্টা তামাসার মধ্যে একস্থানে অন্য পুস্তক অভাবে Macaulay's Essays পড়িয়া সময় কাটাইতে হইতেছে লিখিয়াছেন আর সেইখানে Lord Macaulayর উপর তাঁহার যে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল তাহা কয়েক পংক্তিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কথাগুলি আমার ঠিক স্মরণ আছে—

"Lord Macaulay's fibs and lies,
Which fools do so much love and prize."

আর এক জায়গায় লিখিয়াছিলেন—

"Lord Macaulay's frothy flash."

জুবিলী উৎসব উপলক্ষে রচিত কবিতাটি ভারত সম্রাজ্ঞীকে প্রেরণ করিবেন বলিয়া হেমচন্দ্র উহার অনুবাদের ভার ইংরাজী কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত কোনও খ্যাতনামা লেখককে প্রদান করেন। হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রোজনামচা হইতে অবগত হওয়া যায় যে প্রথমে তিনি প্রসিদ্ধ ইংরাজী কবিতা লেখক রাম শর্ম্মাকে (নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়কে) কবিতাটির অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন এবং তিনি অসম্মত হইলে, পরে তাঁহারই পরামর্শে Indian Echo নামক ইংরাজী পত্রের সম্পাদক (S J Padshw) পাদশাহকে উহা অনুবাদ করিতে দেন। পাদশাহের অনুবাদটি যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পরম বন্ধু বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন চীফ সেক্রেটারী ভারত হিতৈষী স্যর হেনরী কটন মহোদয় কর্ত্তৃক সংশোধিত হইলে উহা গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হয়। -

বিনোদবাবুর রোজনামচা পাঠে প্রতীত হয় যে এই কবিতাটি স্যর হেন্‌রি কটন ও লর্ড রিপণের সহায়তায় ভারত সম্রাজ্ঞীকে প্রেরিত হইয়াছিল।

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া

(১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে)

হেমচন্দ্র

জুবিলী সঙ্গীতটি হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সকল সংস্করণে মুদ্রিত হয় নাই। উহা 'ভারতভিক্ষার' ন্যায় বিখ্যাত না হইলেও, 'ভারত-ভিক্ষা'-রচয়িতার একান্ত অনুপযুক্ত হয় নাই। একটি অংশ উদ্ধৃত হইল—

দেখো চেয়ে দেখো বৃটন জননী
দেখোগো চলেছে কি সাজে সেজে
তব প্রজাবৃন্দ—চারি ভূমণ্ডলে—
কেন্দ্র হতে কেন্দ্রে অমিত তেজে।
দূর-সিন্ধু-জল, ধরাধর-শৃঙ্গ
ধরণীর-প্রান্ত-দ্বীপ-মালায়
ইউরোপ, আসিয়া, আফ্রিক, আম্রিকে
কিবা হাস্যমুখে সুখে বেড়ায়
কোথা স্যাণ্ডউইচ, সেণ্ট-হেলেনা
নিউ জিলণ্ড দ্বীপ কোথায়
নাহি স্থল জল ভূমণ্ডল অঙ্কে
জয়ডঙ্কা যেথা নাহি বাজায়।
হে ভারতেশ্বরি, কখনও কিগো
আমাদের ভাগ্যে হবে সেদিন?
ওদেরি মতন অভয় হৃদয়ে
তব নাম মুখে লয়ে যেদিন
ভ্রমিব ভুরূপে, অমনি সাহসে
অমনি উৎসাহে জাগ্রত রব?

৺স্যর হেন্‌রি কটন

অসীম বাণিজ্যে বাঁধিয়ে কমলা
অমনি প্রভাবে মণ্ডিত হব ?
যাবো দেশে দেশে অমনি উল্লাসে,
দেখাবো তুলিয়া ভুজের রশ্মি ?
নিঃশঙ্ক হৃদয় মরু, গিরি, বনে—
স্বদেশ স্বজাতি স্মরণে লক্ষ্য !
এ ধরামণ্ডলে না পারিবে কেহ
পরশিতে দেহ প্রাণের ভয়ে,
স্বনাম-গৌরবে সতত গর্ব্বিত
স্বদেশ অথবা বিদেশে রয়ে।
থাকি বা একাকী দুরন্ত প্রান্তরে
নগরে পল্লীতে, কিবা মশানে,
রাজ্য-দেশ-নামে সবে সশঙ্কিত,—
পশুপক্ষিগণও ত্রাসিত প্রাণে !
কবে গো আমরা—হবে কি সে দিন ?
ওদেরি মতন সহাস্য-মুখে
অমনি করিয়া সদর্পে আসিয়া,
দাঁড়াবো জননি, তব সম্মুখে ?

কবিতাটির শেষভাগে সাম্যবাদী কবি বলিতেছেন-

এ 'জুবিলি' দিনে 'বৃটন' জননি,
কি ভয় বলিতে মা'কে ?—

৺লর্ড রিপণ

এ মহা যজ্ঞের প্রাচীন পদ্ধতি
স্মরণে যেন গো থাকে।—
থাকে যেন মনে, এ আনন্দ-দিনে
য়িহুদি জগতময়
দাসত্ব কলঙ্ক থাকিত না কারো,
প্রভু ভৃত্য এক হয়।

রাখিবন্ধন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কলিকাতা মহানগরীতে জাতীয় মহাসমিতির (Indian National Congress) দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। মহাত্মা দাদাভাই নৌরোজী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই মহাসভায় ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ হইতে অসংখ্য প্রতিনিধিবর্গ সমবেত হইয়া ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্য প্রদর্শিত করেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ডাঃ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেই বিরাট জনসঙ্ঘ অবলোকন করিয়া আনন্দোদ্বেলিত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন—

"It has been the dream of my life that the scattered units of my race may some day coalesce and come together, that instead of living merely as individuals, we may some day so combine as to be

able to live as a nation. In this meeting I behold the commencement of such coalescence."

"ভারত-সঙ্গীতে"র কবির হৃদয়েও এই ঘটনা নূতন আশা উদ্দীপিত করিল—

"যে নীরদ উঠি 'রীপণ' মিলনে
শুষ্ক তরুডালে সলিল সিঞ্চনে
আশার অঙ্কুর তুলিল পরাণে
সে আশা আজিয়ে ফুটিল।"

এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া কবি আর একবার তাঁহার ভগ্নবীণা তুলিয়া লইলেন। ভারত সঙ্গীতের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র যে মাতৃ-স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, হেমচন্দ্রের বীণায় সেই "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি ঝঙ্কৃত হইয়া সমগ্র জাতিকে মাতাইল, যে অপূর্ব্ব সঙ্গীতের মাধুর্য্য নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণও সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, * হেম-

* আমি তখন উহার ("বন্দেমাতরম্" গীতের) অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া বলিলাম যে উহার মাঝে মাঝে বাঙ্গলা লাইন-গুলি বসাইয়া তিনি গীতটি মাটি করিয়াছেন। ঐ লাইনগুলি

চন্দ্রের বীণায় ঝঙ্কৃত হইয়া সেই সঙ্গীত দেশবাসীর হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিল, যে বন্দেমাতরম্ মন্ত্র আজি হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারত-বাসীকে এক সূত্রে বাঁধিয়াছে, সেই মন্ত্র হেমচন্দ্রই নবীন ভারতে ওজস্বী ও নির্ভীক কণ্ঠে বিঘোষিত করিলেন—

ভারত জননী জাগিল।
পূরব, বাঙ্গা, মগধ, বিহার,
দেরাইস্মাইল, হিমাদ্রির ধার,

গীতটির প্রাণ ও গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়াছে। উহা আমার মোটেই ভাল লাগে না। কেমন খাপছাড়া বোধ হয়। আগা গোড়া সরল সংস্কৃত হইলে ভাল হইত।

তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) বলিলেন, "বাঙ্গালা লাইনগুলি তোমার ভাল না লাগে, উহাদের তুমি বাদ দিয়া পড়িও।"

আমি বলিলাম, "আপনার ঐ দেমাকেই আমরা মারা গেলাম।"

তখন তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি গানটী গাইতে শুনিয়াছ কি?"

আমি বলিলাম, "না"।

তিনি—"গাইতে শুনিলে তুমি এরূপ বলিবে না।"

(নবীনচন্দ্রের "আমার জীবন")

করাচি, মান্দ্রাজ, সহর বোম্বাই,
সুরাট, গুজরাটী, মহারাঠী ভাই,
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল

প্রেম আলিঙ্গনে করে রাখি কর
খুলে দেছে হৃদিহৃদি পরস্পর,
এক প্রাণ সবে এক কণ্ঠস্বর
সুখে জয়ধ্বনি ঘিরিল।

প্রণয় বিহ্বলে ধরে গলে গলে
গাহিল সকলে মধুর কাকলে
গাহিল—"বন্দে মাতরং,
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরং।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্ল-কুসুমিত—দ্রুমদল শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরং,
বহুবল ধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদল-বারিণীং মাতরম্।"
উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে—
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে
ভারত জগৎ মাতিল।

আনন্দ উচ্ছ্বাস ফুটেছে বদনে
মায়েরে বসায়ে হৃদি সিংহাসনে,
চরণযুগল ধরি জনে জনে
একতার হার পরিল।

বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে 'বন্দেমাতরং" সঙ্গীতটি আজি সর্ব্বত্র যে সমাদর লাভ করিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিত কালে উহা সাধারণ্যে সে সমাদর লাভ করে নাই। কিন্তু উহার রচয়িতা জানিতেন, এবং দেশাত্মবোধের যে মহাকবির উন্মাদনী সঙ্গীতের উহা প্রতিধ্বনি তিনিও জানিতেন, একদিন উহা সমগ্র ভারতবর্ষকে উদ্বেলিত করিবে।

এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় কর্ত্তৃক বর্ণিত একটি ঘটনা উদ্ধৃত করিব। ১৩১৩ সনে জ্ঞনেন্দ্রলাল লিখিতেছেন—

"প্রায় চব্বিশ বৎসর হইল, আমি একদিন স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তখন তিনি বৌবাজারের বাসায় থাকিতেন। রাত্রি প্রায় আটটা। বঙ্কিম বাবু, স্বর্গীয় কবি হেমচন্দ্র, স্বর্গীয় ডাক্তার বেহারিলাল ভাদুড়ী, স্বর্গীয় সঞ্জীবচন্দ্র বসিয়া আছেন। একটু পরে গরম গরম লুচি ও তপসীমাছ ভাজা

আসিল। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন খোলাখুলি করিয়া বেশ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এ কথা সে কথার পরে কবি হেমচন্দ্র বলিলেন, "বর্ত্তমান সময়ে যে সকল স্বদেশপ্রেমঘটিত কবিতা বাহির হইতেছে, তাহা বাহির না হইলেই ভাল হয়।"

বঙ্কিমচন্দ্র—কেন?

হেমবাবু—যে স্বদেশপ্রেম, যে বীরত্ব বাক্যে পর্য্যবসিত, তাহা ঘৃণার বস্তু, তাহা একরকম ভণ্ডামি।

বঙ্কিম বাবু—তবে তুমি তোমার 'ভারত-সঙ্গীত' 'ভারতবিলাপ' লিখিয়াছিলে কেন?"

হেমচন্দ্র—আমি লিখিয়া অতি অন্যায় কাজ করিয়াছি, আমি তাহার জন্য অনুতপ্ত। হায়, বঙ্গদেশে একটা লোক নাই যে কার্য্যে বীরত্ব দেখাইতে পারে, একটা লোক নাই যে প্রয়োজন হইলে দেশের জন্য নিজের জীবনটা দিতে পারে। যে দেশের লোকের অবস্থা এইরূপ, সে দেশের লোক জাতীয়সঙ্গীত লেখে কেন, স্বদেশ প্রেমের বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা করে কেন?

বঙ্কিম বাবু—তুমি কি বলিতে চাও, সাহিত্য দ্বারা কার্য্যত দেশের কোন মঙ্গল হয় না? যদি তা বল, তাহা হইলে আমি তোমার কথা কখন অনুমোদন

করিতে পারিব না। যদি সাহিত্য দ্বারা স্বদেশের মঙ্গল সাধন করা যায় না মনে করিতাম, তাহা হইলে আমি আনন্দমঠ লিখিতাম না। আমার বিশ্বাস; আমার আনন্দমঠে স্বদেশের একদিন উপকার হইবে।"

বুদ্ধিমান পাঠকগণকে বলা নিষ্প্রয়োজন যে হেমচন্দ্র অতি দুঃখেই অভিমান করিয়া বলিয়াছিলেন এদেশে স্বদেশপ্রেম ঘটিত কবিতা প্রকাশিত না হইলেই ভাল। বঙ্কিমচন্দ্রও কিছুদিন পরে 'আনন্দমঠের' ব্যাখ্যাতা সাহিত্যবান্ধব রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরকে লিখিয়া ছিলেন—

"আমিই বা আনন্দমঠ লিখিয়া কি করিব, আপনিই বা তাহার মূলতত্ত্ব বুঝাইয়া কি করিবেন? এ ঈর্ষা-পরবশ আত্মাদরপরায়ণ জাতির উন্নতি নাই। বল 'বন্দে উদরম্।'"

কিন্তু উভয়ের জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত স্বদেশের উন্নতি চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। আজিও সেই দুইজন অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমিকের অবিনশ্বর শক্তি লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর হৃদয়ে কতদূর প্রভাব বিস্তৃত করিয়া আছে তাহা বলা অনাবশ্যক।

হেমচন্দ্রের কোন কোন বন্ধু 'রাখীবন্ধনের' উচ্চ

প্রশংসা করিয়াছিলেন। উমাকালী মুখোপাধ্যায় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারী দিবসে রোজনামচায় লিখিয়াছেন—

Hem's excellent poem জাতীয় সমিতি written in reference to the Congress.

কিন্তু জাতীয় মহাসমিতির এই অধিবেশন কবি হেমচন্দ্রের হৃদয়ে যে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক করিয়াছিল, ভাষায় তিনি তাহা ইচ্ছানুরূপভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। রাখিবন্ধন কবিতাটি তাঁহার নিজের মনঃপুত হয় নাই। এই জন্য কবিতাটি অন্তরঙ্গ বন্ধু ও আত্মীয়গণের মধ্যেও বিতরণ করেন নাই। হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারি দিবসের রোজনামচা হইতে জানা যায় যে কবিতাটি হেম বাবুর নিজেরই মনঃপুত হয় নাই, তাই তিনি তাঁহার কোন বন্ধুবান্ধবকে উহা উপহারও দেন নাই!

পারিবারিক ঘটনা। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে কবি সহধর্ম্মিণী কামিনী দেবী উত্তম গৃহিণী ছিলেন না এবং পারিবারিক শোক তাপের মধ্যে হেমচন্দ্রকে সকল কর্ত্তব্য একাকী সম্পাদিত করিতে হইত। হেম

হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ইংরাজি রোজ নামচার নিম্নোদ্ধৃত অনুবাদ হইতে হেমচন্দ্রের পারিবারিক জীবনের আভাস পাওয়া যায়। ইহা হইতে প্রতীতি হয় যে প্রিয়তমা কনিষ্ঠা কন্যার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়াও হেমচন্দ্র সামাজিক কর্ত্তব্য পালনে কিরূপ মনোযোগী—

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৪—আজ জামাই ষষ্ঠী, বেলা ২টার পর আফিস হইতে খিদিরপুর গেলাম। তনির এখনও খুব অসুখ, বিপদের আশঙ্কা এখনও কাটে নাই। হেম বাবু বলিলেন, আজ আমাদের আহ্বান করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু পাছে আমরা কেহ রাগ করি, তাই করিয়াছেন। মেনা † এখানেই রহিয়াছে। ইঁহারা আমায় থাকিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু আমি চলিয়া আসিলাম, রাত্রি ১০টায় বাড়ী পৌঁছিলাম। হেমবাবু বলিলেন, পীড়িতা কন্যাটির সেবা শুশ্রূষা ইত্যাদি সবই তাঁহাকে করিতে হইতেছে, কারণ তাঁহার পত্নী জীবিতা অথবা মৃতা ইহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না।*

---

* কবির কনিষ্ঠা কন্যা অনুশীলা দেবীর ডাকনাম।

† কবির ভাগিনেয়ী মৃণালিনী দেবী।

হেমচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে নিজের সন্তানাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ হইতে দৃষ্ট হইবে যে তাঁহাদের রোগে বা মৃত্যুতে তিনি তাঁহাদের মাতাপিতা অপেক্ষা অধিকতর সন্তপ্ত হইতেন।

বিনোদ বাবু তাঁহার রোজনামচায় ২০শে জুন ১৮৮৭ তারিখে লিখিয়াছেন—

"হঠাৎ হেমবাবুর পত্র পাইলাম, তিনি লিখিয়াছেন যে বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন; যদি সম্ভব হয় ত আমি-যেন একবার আসি। পত্র পড়িয়া আমিত স্তম্ভিত হইলাম। কি বিপদ প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তার পর স্থির করিলাম, ঈশানের কোনও ছেলে মারা গিয়াছে। আহারাদির পর (খিদিরপুর) গেলাম, ঈশানের দ্বিতীয় পুত্র কালো গত শুক্রবার মারা গিয়াছে; বিমান এবং কনিষ্ঠ পুত্রটিও সেই একই ব্যারামে শয্যাগত। বিমানের অবস্থা খুব খারাপ, সে বাঁচিবে কি না খুব সন্দেহ।"

পরদিনের রোজনামচায় বিনোদবাবু লিখিয়াছেন, "বিমান একটু ভাল আছে, ছেলেটি বাঁচিতে পারে। ছোট ছেলেটির অবস্থাও সেইরূপ। পুত্রের মৃত্যুশোক

ঈশান বাবু খুব ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়াছেন। হেম বাবু বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার মুখখানি অন্ধকার।"

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে যে, হেমচন্দ্রের আয় ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছিল। তিনি কখনও সঞ্চয় করিতে জানিতেন না। তাঁহার অর্জ্জিত ধনের উপর সকলেরই যেন সমান অধিকার ছিল। তিনি হাইকোর্ট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পকেট ঝাড়িয়া সমস্ত টাকা তাঁহার মাতুল সম্পর্কীয় রায় মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিয়া উপরে চলিয়া যাইতেন। রায় মহাশয় টাকার হিসাব রাখিতেন। যাঁহার যাহা প্রয়োজন হইত তিনি তাহা লইতেন। হেমচন্দ্র অকাতরে দান করিতেন। কোনও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি যে, একবার একজন দরিদ্র ভদ্র ব্যক্তি কন্যাদায় জানাইয়া হেমচন্দ্রকে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে অনুরোধ করেন। হেমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ রায় মহাশয়কে ডাকাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আজ যে ৫০০ টাকার নোটখানি আনিয়াছি সেইখানি লইয়া আসুন।" নোটখানি সেই কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিয়া বিদায় দিলে রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাতায় খরচটি কিরূপে লিখিব?"

হেমচন্দ্র উত্তর দিলেন, "লিখবেন, নোটখানি খোয়া গিয়াছে।" আশ্রিত অনুগত সকলেই তাঁহার বাটীতে রাজভোগ খাইতেন। অর্থের প্রতি হেমচন্দ্রের কোনও মমতা ছিল না। অর্থাভাবে যে কখনও তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হইবে এ কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। যখন পরিবার ও আশ্রিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আয় হ্রাস পাইতে লাগিল, স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল, এবং যে পুত্র-গণের উপর তিনি অনেক আশা রাখিয়াছিলেন তাঁহারা কেহই তাঁহার যোগ্য হইলেন না, তখন হেমচন্দ্রের হৃদয় নৈরাশ্যসাগরে ভাসিয়া গেল। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন দিবসে হেমচন্দ্রের বাল্যবন্ধু রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর সি-আই-ই মহাশয় রোজ নামচায় লিখিয়াছেন—

"Go next to Kidderpore. Hem seems to be unhappy. He has saved no money and his health is bad. He gives expression to his bitter feelings, and I am much moved."

হেমচন্দ্রের শেষ জীবনের দুঃখের সর্ব্বপ্রধান কারণ, তাঁহার পুত্রগণ। কোমলহৃদয় হেমচন্দ্র চিরদিন তাঁহার পুত্রগণকে যথোচিত সুখে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন,

কখনও তাঁহাদিগকে কঠোর শাসনে সংযত করিতে পারেন নাই। পুত্রগণ বাল্যকাল হইতেই বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের যাহা সাধ্য, তিনি পুত্রগণের উন্নতির জন্য তাহা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্রগণ যে কেহই মানুষ হইলেন না, এজন্য তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে দায়ী করিতেন। তিনি বলিতেন যে যদি কামিনী দেবী সুগৃহিণী হইতেন, তাহা হইলে কখনই পুত্রগণ এরূপ হইত না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের (প্রতুলচন্দ্র ও অনুকূলচন্দ্র) শিক্ষার জন্য হেমচন্দ্র একজন সচ্চরিত্র ও সবিদ্বান যুবককে উপযুক্ত বেতনে গৃহশিক্ষক রাখিয়াছিলেন। ইনি হেমচন্দ্রের গৃহে অবস্থান করতঃ অনুক্ষণ পুত্রগণের তত্ত্বাবধান করিতেন। ইনি এক্ষণে সমাজের একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি—ইহার নাম প্রকাশ করিবার আমরা অনুমতি পাই নাই। আজি কালি ধনীব্যক্তিগণের নিকট তাঁহাদের পুত্রগণের গৃহশিক্ষকেরা সচরাচর কিরূপ সমাদর লাভ করেন তাহা না বলিলেও চলে। হেমচন্দ্র তাঁহার পুত্রগণের বেতনভোগী গৃহশিক্ষককে পরমোপকারক বন্ধু বলিয়া ভাবিতেন। একবার সেই গৃহশিক্ষক পাণ চাহিলে দাসী (বোধ হয় কিছু গর্ব্বিত ভাবেই) বলিয়াছিল "আজ

হেমচন্দ্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র

প্রতুলচন্দ্র ও অনুকুলচন্দ্র

পাণ পাইবেন না।" ইহাতে শিক্ষক মহাশয় অপমান বোধ করিয়া হেমচন্দ্রের গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। দাসীর উদ্ধত উত্তরের জন্য প্রভু কিরূপ বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন দেখুন:—

My dear—

Forgive me if anything improper has been said by any one. I beg of you out of kindness to me to forgive me. I shall reprimand the maidservant duly. But do not listen, I pray you, to what these mean wretches may say. What do they know of how much to value you? Do pray forget and forgive me this time.

—H. C. B

একবার এই গৃহশিক্ষক কার্য্যানুরোধে তাঁহার পল্লী-গ্রামস্থ বাটীতে গমন করিলে, পুত্রের উন্নতির জন্য আগ্রহশীল হেমচন্দ্র কিরূপভাবে তাঁহাকে খিদিরপুরে প্রত্যাগমন করিয়া পুত্রের শিক্ষা ও চরিত্র সংশোধনের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা

পাঠ করিলে পুত্রের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য পালনে তিনি কতদূর সচেষ্ট ছিলেন তাহা প্রতীয়মান হইবে।—

My dear—

The arrangement made by you with Raj Kristo has come to nothing. He has not been attending from the very day you left here. His plea up to today is illness (fever), but from what I can judge of him by his manner of proceeding, I am afraid that he would be of little use even if he were not ill or when he recovers. I am placed in a very anxious position. My chief object was to keep constant guard on * * * so that he may not go out of the house. In this you have succeeded to some extent. But it. is just the beginning of his reformation if I may so hope. If now the street guard that was kept on him for the last few days is

removed or slackened, the boy is sure to be ruined. My dear— do help me in this. I can understand your necessity, but with me the issue is *now or never*. I would therefore earnestly beg of you to shorten your stay at home as much as possible and come back at the end of a week. If you have any pity for me, oblige me *for this once* by according to my request.

Yours sincerely.
Hem Chandra Banerjee.

তাঁহার কোনও পুত্রকে পারিপার্শ্বিক কুপ্রভাব হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত হেমচন্দ্র কিছুকাল এই গৃহ-শিক্ষককে মাসিক ৪০৲ বেতন প্রদান করিয়া কলিকাতায় একটি মেসে পুত্রকে লইয়া থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। পুত্রের শিক্ষা ও চরিত্রোৎকর্ষের নিমিত্ত হেমচন্দ্র কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয়

প্রদানের জন্য উক্ত গৃহশিক্ষককে লিখিত আর একখানি মাত্র পত্র উদ্ধৃত করিব।—

29 8-89

My dear—

The assurances you give me is a great relief to me. I shall be only too happy to find that one at least of my sons has been saved from ruin, and if your efforts succeed in saving this child, believe me, I shall be eternally indebted to you. Why talk of remuneration in connection with your efforts in this respect? Is there any remuneration in the world for such services as you are doing me? And do I not know that your zealous efforts in this respect are wholly without any regard to the matter of remuneratlon? That you are doing all in your power just as you would do for a younger brother of your own? Believe me, I know all this, and value your services accordingly. The reason why I said the other day that perhaps there has been a

little slackening of attention was because I thought * * * was not so very attentive to his books *latterly in your absence from the boys,* for however short a period. No sooner you leave them to themselves, they run away from the room or play or do any thing but apply themselves to their duties. I thought this was because you left them more to themselves believing that they were acting according to you advice—that you had thought that they were or rather * * * was so far broken into regular habits that such street supervision that you kept him under *at first* was no longer necessary. I only feared you might have thought so. I only meant to say that it would be a mistake to think so. For * * * *had become so* vicious that it would be necessary to keep up in his case the most *rigid supervision and vigilant watching even for some time to come.* This was my impression. I am glad to learn that it was an erroneous impression and *that your have not in the least relaxed*

your efforts and vigilance. Over and above this, I latterly also noticed that he had begun to go out to this invitation and that (all mere pretences) and thus to leave the house without your or my permission. The other day only he was absent from the house for nearly the whole day going out to the Botanical gardens or some friend's house (God knows where). These things, I feared were the beginnings of his *relapse into his former habits and the association with his former wicked friends.* And then came this matter of the fine of four rupees. Such a heavy fine, I thought, must have been for some very gross misconduct—I find from what you have written, *that it was so.* You know I am apt to get alarmed at these things and *therefore become depressed.* Excuse me *if I have wronged you, even in thought. Have pity on me. I am sore at heart on account of my children. Keep an ever vigilant eye on* * * * *Do not believe him yet cured.* I only give expression to my

own fears in saying all this and nothing more. *Lastly I am quite willing to assist you*—only tell me what I am to do. Do not feel the least hesitation in distinctly pointing out to me and *in fact directing me explicitly in what I am to do, and I will try to follow out your directions as best I can.* My dear—, I have given him entirely into your hands—knowing *this* do what you think proper. Do not hesitate even to *command me so far as my duties to him are concerned.* You are yet sanguine in your hopes. May God bless them with success.

Yours affly
Hem C. Banerjee.

Pray do not mind if I happen to say anything wrong to you in my extreme anxiety and fear.

প্রফুল্লচন্দ্রের চরিত্র সংশোধনের জন্য হেমচন্দ্র ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি দিবসে হুগলী নিবাসী রামকৃষ্ণ

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কন্যার সহিত বিবাহ দেন। পুত্রগণের উন্নতির জন্য এতাদৃশী চেষ্টা যে বিফল হইয়াছিল, তাহা কবিবরের প্রতি কমলার নিগ্রহ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? হেমচন্দ্রের জীবনের সর্ব্বপ্রধান দুঃখ যে তিনি তাঁহার পুত্রগণকে 'মানুষ' করিতে পারেন নাই। তিনি প্রায়ই জামাতাদিগকে বলিতেন, "তোমরাই আমার পুত্র—আমার আর পুত্র নাই।" কিন্তু বহু দুঃখেই তাঁহার মুখ হইতে এই সকল কথা নির্গত হইত। তিনি মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত পুত্রগণকে যে কিরূপ স্নেহ করিতেন তাহার পরিচয় পরে প্রদান করিব।

পুত্রগণের অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যই বোধ হয় কবি তাঁহার কন্যাগণকে অত্যধিক ভালবাসিতেন। মধ্যমা কন্যার অকাল বিয়োগে তিনি যে কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলা দেবী পিত্রালয়ে আসিলে হেমচন্দ্র শীঘ্র তাহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতেন না। কন্যারা যাহাতে সুখী হন তজ্জন্য হেমচন্দ্র প্রখর দৃষ্টি রাখিতেন।

বলা বাহুল্য দৌহিত্র দৌহিত্রীরা হেমচন্দ্রের প্রাণা-পেক্ষা প্রিয় ছিলেন। সুশীলা দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা

হেমচন্দ্রের প্রিয় দৌহিত্রী

৺প্রমদা দেবী

প্রমদা দেবী কবিবরের বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন। প্রমদাদেবীর স্বামী লিখিয়াছেন যে, তিনি হেমচন্দ্রের ভগিনী নৃত্যকালীর মুখে শুনিয়াছিলেন, "১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রমদা দেবী ভুমিষ্ঠ হইলে হেমচন্দ্র পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন 'গোপাল বাবু যেমন আমার কাছ থেকে ৭০০০৲ নিয়েছেন,তেমনি সুশীলার সাতটি মেয়ে হবে।' কন্যা সুলক্ষণা বলিয়া খুব শাঁক ঘণ্টা বাজান হয়। কন্যার কি নাম রাখা হইবে কথা উঠায় হেমচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, হতাশের আক্ষেপে যে প্রমদাকে ডাকিয়াছিলাম, সে এতদিনে আসিয়াছে। কন্যার নাম রাখা হইল প্রমদাসুন্দরী।" ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রমদার সহিত মমিনপুর নিবাসী শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্রের শুভ বিবাহ সংঘটিত হয়। এই সময়ে হেমচন্দ্রের আয়ের অল্পতা ও ব্যয়ের অতিশয় আধিক্য বশতঃ তিনি দৌহিত্রীকে উপযুক্ত যৌতুকাদি প্রদান করিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। হেমচন্দ্র দৌহিত্রীকে একটি সিঁথি উপহার দেন।

আয়ের অনুপাতে হেমচন্দ্রের ব্যয় কত বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সিঁথির মুল্য
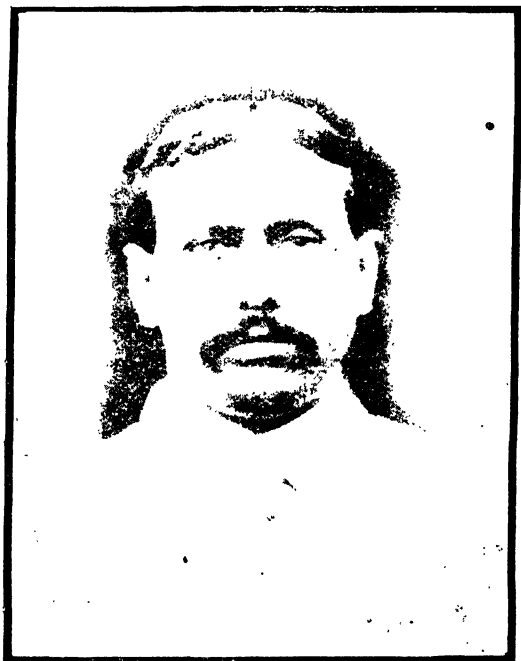
শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনি একবারে দিতে পারেন নাই। বিনোদবিহারীর হিসাবের খাতায় দুই মাসে উহার জমাখরচ দেখিতে পাওয়া যায়—

August 1888 হেমবাবু প্রমর সিংএর দরুন
১১৪।/০ মধ্যে——৭৫৲
November 1888 হেমবাবু————৩৯।/০

বিবাহের পর দৌহিত্রী ও দৌহিত্রীপতিকে (অতুল চন্দ্রকে) প্রায়ই হেমচন্দ্র স্বীয়ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। অতুল বাবু বলেন যে, শ্বশুরবাড়ী অপেক্ষা হেমচন্দ্রের বাড়ীতে তিনি অধিক আদর যত্ন পাইতেন। শ্রীমান অতুলচন্দ্র বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তিনি তাঁহার নিকট অতুলচন্দ্রকে আর্টিকল্‌ড করিয়া লন। অতুল বাবু এক্ষণে বর্দ্ধমানের সবজজ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

এই সময়ে বিনোদবিহারীর চেষ্টায় হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র অতুলচন্দ্র সৈন্য সংক্রান্ত হিসাব বিভাগে একটি কর্ম্ম প্রাপ্ত হন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—–o—–

‘আলো ও ছায়া’র ভূমিকা। সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লিডার।

‘আলো ও ছায়া’র ভূমিকা। হেমচন্দ্রের গুণগ্রাহিতার পরিচয় পাঠকগণ পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। যখন মাইকেল মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের অসাধারণ দোষগুলি প্রদর্শিত করিবার জন্য বাঙ্গালার সমালোচকগণ উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন, তখন নবীন কবি হেমচন্দ্রই স্বভাবসিদ্ধ উদারতা ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক মাইকেলের কাব্যের অসাধারণ গুণগুলির প্রতি বঙ্গীয় পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। যে প্রতিভাশালিনী মহিলাকবির নাম আজি প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর গৃহে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে, যাঁহার অমূল্য কাব্যগ্রন্থাবলী বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান সম্পদ, সেই সরস্বতী-প্রতিম কবিরাণী শ্রীমতী কামিনী রায় (তখন

কুমারী কামিনী সেন) মহাশয়ার প্রম গ্রন্থ 'আলো ও ছায়া'ও হেমচন্দ্রের আশীর্ব্বাদপূত। হেমচন্দ্রই সর্ব্ব প্রথমে বাঙ্গালার পাঠক সম্প্রদায়ের সহিত 'আলো ও ছায়া'-রচয়িত্রীর পরিচয় করাইয়া দেন। তাঁহার উৎসাহ-বাক্য—তাঁহার আশীর্ব্বচন—উচ্চারিত না হইলে, নারী-সুলভ লজ্জা ও সঙ্কোচ হয়ত এই অপূর্ব্ব কবিতাকুসুম-গুলি বিজনেই ঝরাইয়া দিত, বাঙ্গালার কাব্যকুঞ্জ এই স্বর্গীয় পারিজাতের সৌরভ হইতে চিরবঞ্চিত হইত। কি সূত্রে হেমচন্দ্র 'আলো ও ছায়া'র ভূমিকা লিখিয়াছিলেন এবং হেমচন্দ্রের উৎসাহবাক্যে 'আলো ও ছায়া' রচয়িত্রী যে কতদূর উৎসাহিত হইয়াছিলেন, আমাদিগকে লিখিত মাননীয়া শ্রীযুক্তা কামিনী রায় মহোদয়ার একখানি পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহারই ভাষায় পাঠকগণকে তাহার পরিচয় দিব :—

"আপনি কবিবর হেমচন্দ্রের জীবনচরিত লিখিবেন জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু আমি তাঁহার জীবনের কথা কিছুই জানি না। বাল্যকাল হইতে তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়াই তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় তিনি আমার পিতৃদেবের 'বন্ধু' ছিলেন ঠিক একথাও বলা যায় না। পিতৃদেবের পাঠ্যাবস্থায় তিনি হেম বাবুর

শ্রীমতী কামিনী রায়

নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য পাইয়াছেন, এই কথা শুনিয়াছি। আমি জীবনে একদিন মাত্র তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি। তখন 'আলো ও ছায়া' যন্ত্রস্থ।

"আমার পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয় ইতিপূর্ব্বে আমার কবিতার খাতাগুলি লইয়া তাঁহাকে দেখিতে দেন এবং তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। আমি অবশ্য ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না। খাতাগুলি আমি ডাক্তার পি কে রায়কে দেখিতে দিয়াছিলাম। কবিবর কতকগুলি কবিতার উপরে 'সুন্দর' 'Beautiful' ইত্যাদি এবং খাতার উপরে A true poet লিখিয়া দুর্গামোহন বাবুর হাতে ফিরাইয়া দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ছেলেটি কে হে?" দুর্গামোহন বাবু বলিলেন, 'ছেলে নয়, মেয়ে।' তিনি অতিশয় আনন্দ এবং বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

"আমার কবিতা তাঁহার মত লোকের ভাল লাগিয়াছে জানিয়া আমার ভয় এবং সঙ্কোচ কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। তিনি ভূমিকা লিখিয়া দিবেন জানিয়া কবিতাগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইতেও আর দ্বিধা রহিল না। যখন কয়েক ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে, একদিন সকালবেলা

মিসেস পি, কে, রায় (দুর্গামোহন দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা) আমার জন্য গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার পত্রে জানিলাম আমার সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে কবিবরকে তাঁহারা আহারে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমি কলেজের কায হইতে ছুটী লইয়া তাঁহাদের রডন ষ্ট্রীটস্থ ভবনে আসিলাম। সেখানে হেমচন্দ্রের সহিত উমাকালী মুখোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়েরা আসিয়াছিলেন। কবি তাঁহার নবরচিত গঙ্গা স্তোত্রটি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। আহারের পর উমাকালী বাবু তাঁহাকে তাঁহার নিজের কোন কবিতা আবৃত্তি করিতে বলিলেন। তিনি কবিতাবলী হইতে 'হায় বসুন্ধরা তোমার কপালে" ইত্যাদি কয়েক ছত্র পড়িয়া বলিলেন, 'না, মিস্ সেনের কবিতা পড়ি।' তখন খুব ভাবের সহিত 'বর্ষসঙ্গীত' পড়িয়া শুনাইলেন।

"এই দেখা সাক্ষাতের পর তিনি আমাকে কয়েক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সে স্নেহপূর্ণ চিঠিগুলি সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি আমার চিঠি পড়িয়া আমার কবিতার মত আমার গদ্য রচনারও খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। আসল কথা

তিনি দোষ খুঁজিতেন না, গুণ খুঁজিতেন; সৌন্দর্য্য দেখিবার চেষ্টা থাকিলে সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

"তাঁহার প্রথম লিখিত ভূমিকাতে আমার নারীত্বের উল্লেখ ছিল বলিয়া উহাতে আমার আপত্তি হয়। তিনি সেই জন্য দ্বিতীয়বার ভূমিকা লিখিয়া দিলেন, উহাই 'আলো ও ছায়া'র দিকে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, আমার এই বিশ্বাস।

"তিনি অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত 'আলো ও ছায়া'র সমালোচনাগুলির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন এবং কোন কাগজে সমালোচনা বাহির হইলে সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মত আমাকে জানাইতেন। * * *

"আমি বাল্যকালে কল্পনাজগতে, আমার দিবাস্বপ্নে তাঁহাকে আমার পিতা বলিয়া কল্পনা করিতাম। সত্য সত্যই তিনি আমার মানস-পিতা। কিন্তু তিনি যে আমার কবিতা পড়িবেন এবং প্রশংসা করিবেন একথা আমার 'নিশার স্বপ্নের'ও অগোচর ছিল। কি সূত্রে তাঁহার উজ্জ্বল নাম আমার প্রথম পুস্তকের সহিত গ্রথিত হইল মনে করিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়।

"আমি তাঁহার সম্বন্ধে কখনও কিছু লিখি নাই, অথচ আমার হৃদয় তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায়

হেমচন্দ্র

পূর্ণ। তাঁহার বাক্যেই আমার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তাই বিশ বৎসর পরে 'আলো ও ছায়া'র ৬ষ্ঠ সংস্করণের সময় তাঁহার নামেই 'আলো ও ছায়া' উৎসর্গ করিলাম।"

যদিও পাঠকগণ অনেকেই বোধ হয় 'আলো ও ছায়া'-রচয়িত্রীর সেই উৎসর্গ পত্রটি পাঠ করিয়াছেন, তথাপি আমরা এস্থলে উহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"পিতৃপ্রতিম ভক্তিভাজন

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পূজ্যপাদেষু—

বিশাল তরুর ঘন পল্লব মাঝার,
লুকাইয়া ক্ষুদ্র তনু ঢালে গীতধার
ব্যাধের অলক্ষ্যে থাকি, যথা ক্ষুদ্র পাখী
সেইরূপ আপনারে লুকাইয়া রাখি
তব স্নেহ পত্রচ্ছায়ে পেয়েছিল গান
লাজুক এ ভীরু কবি খুলি কণ্ঠ প্রাণ।
তোমার আশ্বাস দেব আশীর্ব্বাদ তব
সমুজ্জ্বল প্রভা দিয়া রাখিয়াছে নব

বিংশতি বরষ ধরি যেই গীত হায়,
আজ লোকান্তর হতে তাই উপহার
লহ এ ভক্তের হাতে ;--আজ মনে হয়
তবে বুঝি নিতান্তই অযোগ্য তা নয়,
বিংশ বরষের মম পুরাতন গীত
ভকতি-চন্দন-লিপ্ত, নব-সুবাসিত
পাবে তুমি, আশা এই। আছে আশা আর
পৌঁছে ধরণীর বার্ত্তা মৃত্যুর ওপার ॥"

'আলো ও ছায়া'র ভূমিকায় হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "আমার বিশ্বাস এই যে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই এ পুস্তকের অধিকাংশ স্থলে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্ম্মলতা এবং সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিতা গুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি। পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারকে মনে মনে কতই সাধুবাদ প্রদান করিয়াছি, আর, বলিতেই বা কি স্থলবিশেষে হিংসারও উদ্রেক হইয়াছে।" উপসংহারে কবিবর লিখিয়াছিলেন, "একদিন আমি কবিবর মাইকেলের প্রশংসা করিয়া অনেকের নিকট নিন্দাভাগী হইয়াছিলাম; এস্থলেও যদি আবার তাহাই ঘটে, তবে সে সকল নিন্দাবাদেও

আমার কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হইবে না। তৎকালে মাইকেলের পুস্তক পাঠে আমার মনে যে আনন্দ ও সুখের উদ্রেক হইয়াছিল, আমি কেবল তাহাই প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখানেও তাহাই করিতেছি ; সমালোচ-কের 'সিংহাসন' গ্রহণ করি নাই।"

'সাহিত্য-সেবক ৺নিত্যকৃষ্ণ বসু মহাশয় ডায়েরীতে 'আলো ও ছায়া'র ভূমিকায় গুণগ্রাহী হেমচন্দ্রের মুক্ত-কণ্ঠ প্রশংসার প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত করিয়া লিখিয়াছেন—

"শ্রীমতী কামিনী সেনের 'আলো ও ছায়া'র আলো-চনা করিতেছিলাম। সেন কন্যাকে বর্ত্তমান বাঙ্গালার মহিলা-কবিকুলের উপর নিঃসংশয়ে প্রাধান্য দিতে পারা যায়। কিন্তু কোনও কোনও সমালোচক তাঁহাকে যে একেবারে সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া দিয়াছেন, আমি কিছুতেই সে অপকর্ম্মের সমর্থন করিতে পারি না। পঞ্চক, ভালবাসার ইতিহাস, চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ, যৌবন-তপস্যা প্রভৃতি কবিতা যে একজন প্রতিভান্বিত কবির পরিচয় দিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সর্ব্বস্থানে ভাষায় ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্য্য দেখিতে পাই না, সে ত্রুটি, কবির স্বভাবকোমল জাতিত্বের কথা ভাবিয়া

উপেক্ষা করাই উচিত। তিনি যে এই অধম বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এতটাও করিতে পারিয়াছেন, ইহাই তাঁহার যথেষ্ট বাহাদুরীর কথা। গ্রন্থকর্ত্রীকে সার্টিফিকেট দিতে গিয়া কবিবর হেমচন্দ্র তাঁহার 'সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিতা গুণের' প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু আমার বোধ হয়, গ্রন্থমধ্যে এই অবশ্যপ্রয়োজনীয় গুণের একটু অভাব আছে। আর একটা কথা, হেম-বাবু বর্ত্তমান কবিকে ডিপ্লোমা দিবার কালে মহাকবি মাইকেলের নামোল্লেখ করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছেন। ইহা শুধু অন্যায় নহে, অদূরদর্শিতাও বটে। কারণ ইহাতে শ্রীমতী কামিনী সেনের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। কেহ কেহ কামিনী কবির অমিত্রাক্ষরে গ্রথিত আখ্যান কবিতা দুইটির অতিরিক্ত প্রশংসা করেন। কেহ বা এইখানেই নবীন কবির প্রবীণতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় উহাদের ছন্দের গঠন কতকটা অপরিপক্ব; কারণ অমিত্রাক্ষরের যে স্বাধীন, স্বাভাবিক স্রোতোগতি, উহাতে তাহার সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।"

নিত্যকৃষ্ণ বসু মহাশয় 'আলো ও ছায়া'র কবিতা-গুলির হৃদয়গ্রাহিতা গুণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তৎ-

সম্বন্ধে এস্থলে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে, কিন্তু হেমচন্দ্রের প্রশংসা যে কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে তাহা কালের বিচারে প্রতিপন্ন হইয়াছে। মাইকেলের নামোল্লেখ করিয়া হেমচন্দ্র কেন অপরাধী হইয়াছেন, তাহাও আমাদিগের বোধগম্য হয় নাই। শ্রীযুক্তা কামিনী রায় যে মাইকেলের সমকক্ষ বা মাইকেল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এরূপ অভিমত ভূমিকায় সূচিত হয় নাই। উঁহাদের মধ্যে কোনওরূপ তুলনা করাও হেমচন্দ্রের অভিপ্রেত ছিল না। হেমচন্দ্র বাঙ্গালার দুইখানি শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। মেঘনাদবধের ভূমিকায় তিনি কাব্যপাঠের আনন্দ ও সুখ ব্যক্ত করিয়া অনেকের নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার জন্য কখনও অনুতাপ করেন নাই। আলো ও ছায়ার ভূমিকাতেও তিনি তাঁহার আনন্দই অকুণ্ঠিতচিত্তে ব্যক্ত করিয়াছেন। এবং এই আনন্দের অংশ কোন্ বাঙ্গালী উপভোগ করে নাই? আমাদিগের বিশ্বাস, ডায়েরীতে কোনও তরল মুহূর্ত্তে অসতর্কভাবে লিখিত নিত্যকৃষ্ণের উপরি উদ্ধৃত অভিমত আদৌ বিচারসহ নহে।

সালিসীকার্য্য। এই সময়ে হেমচন্দ্র একটি ব্যাপারে বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়েন। হেমচন্দ্রের প্রতিবেশী ও পরম বন্ধু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। যোগেন্দ্র বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীশচন্দ্রের আত্মহত্যা উপলক্ষে যে হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ চিন্তাতরঙ্গিণী রচিত হয় তাহাও পাঠকগণ অবগত আছেন। এই সময়ে যোগেন্দ্রচন্দ্র এবং শ্রীশচন্দ্রের পুত্র তারাপদ ঘোষ মহাশয় (বকু সাহেব) বিষয়াদি বিভক্ত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হন। তাঁহাদের অতুল সম্পত্তি বিভক্ত করিবার জন্য মোকদ্দমা করিলে উভয় পক্ষেরই বিশেষ অর্থহানির সম্ভাবনা,এই জন্য বন্ধুভাবে হেমচন্দ্র উঁহাদিগকে আপোষে বিষয় ভাগ করিয়া লইতে পরামর্শ দেন। অবশেষে উভয়পক্ষ হেমচন্দ্রকেই মধ্যস্থ মানিয়া লন। যোগেন্দ্রচন্দ্র মনে করিয়াছিলেন, বন্ধু হেমচন্দ্র তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাতী হইবেন। কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্র হেমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু হইলেও হেমচন্দ্র উভয় পক্ষের মঙ্গল লক্ষ্য করিয়া এরূপ নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে ন্যায়সঙ্গত ও সতর্ক বিচার করেন যে, যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁহার বন্ধুকে প্রতিপক্ষের পক্ষপাতী

৺যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

বলিয়া সন্দেহ করেন এবং এই জন্য [illegible]
তাঁহার কিছু মনোমালিন্য হয়। বলাবাহুল্য হেমচন্দ্র
কেবল গৃহবিবাদ মিটাইবার জন্য এবং উভয় পক্ষকে
অনর্থক অর্থহানি হইতে রক্ষা করিবার জন্যই এই
অপ্রীতিকর কার্য্য নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন।
যোগেন্দ্রচন্দ্রের সহিত বন্ধুত্ব বিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিয়া
যে তিনি কিরূপ কাতর হইয়াছিলেন এবং ন্যায়ের
তিনি কতদূর পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা উমাকালী মুখো-
পাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত কয়েকখানি পত্র পাঠ করিলে
প্রতীত হয়। নিম্নে একখানিমাত্র পত্র উদ্ধৃত হইল।

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায় ২৮ আগষ্ট

ভাই উমাকালী

তুমি যা বল্‌চ তা সব সত্য বটে—যে এই
শালিসী কার্য্য ভালয় ভালয় শেষ না হইলে সকলের
পক্ষে বড়ই কষ্টকর ও বেলেল্লারি হইবে। কিন্তু ভালয়
ভালয় শেষ হয় কেমন করে? সে দিন যোগেন্দ্রের
কথায় বার্ত্তায় যেরূপ বোধ হইল, তাহাতে এ কাযে
হাত দিতে আর আমার সাহস হয় না। তাঁহার ইচ্ছা

-যে পদে পদে সকল কথায় অতি সূক্ষ্মরূপে বিচার হইয়া এ কার্য্য করা হয় এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের এই বিশ্বাস যে কায যতটুকু এগিয়েছে তাহাতেই তাঁহার সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। এমত স্থলে এ কার্য্য আমার দ্বারা সমাধা হওয়া সুকঠিন। তিনি যেরূপ সূক্ষ্ম বিচার চান তাহা কেবল আদালতের সাধ্য, এবং তাঁহার যে সংস্কার জন্মিয়াছে সে বড় ভয়ানক কথা। আমা কর্তৃক কায হইতে গেলেই আমার বিদ্যাবুদ্ধি ও সংস্কার অনুসারে একটা মোটামুটি রকম মধ্যস্থের মীমাংসা হইবে, অত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার হইবে না। তাহাতে যোগেন্দ্রের যে সংস্কার জন্মিয়াছে তাহা ক্রমশ বাড়িবে বই কমিবে না। এ বড় গুরুতর কথা,—এমত স্থলে এ কাযে আমার আর লিপ্ত থাকা উচিত কি? আমার বিবেচনায় উচিত নয়। অতএব তুমি যোগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিবে যে তিনি কি চান্। আদালতের সূক্ষ্ম বিচার চান্, না মোটামুটী সালিস মধ্যস্থে যেরূপ মীমাংসা করিয়া থাকে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন, যে হেতু এ কাযে আমার আর বেশীদূর হাত দেওয়া না দেওয়া তাহারই উপর নির্ভর করিতেছে। আর তাঁহার মনের সংস্কার যখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে তখন

ইহাতেই বা কিরূপে আর লিপ্ত হইতে পারি? সত্য বটে তুমি লিখিয়াছ যে আমা কর্ত্তৃক তাঁহার ক্ষতি হওয়া তিনি বলেন না, এবং আমি যাহা করিয়া দিব, তিনি, সন্তুষ্ট হউন আর অসন্তুষ্ট হউন, তাহা স্বীকার করিবেন, তিনি এমন কথা বলেন। কিন্তু তুমি কি একটু অনুধাবন করিয়া বুঝিতেছ না যে ইহার পরিণাম কি? আজ তিনি এ কথা বলিতেছেন, কিন্তু চিরকালের জন্য তাঁহার মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার সম্পর্কীয় লোকদিগকে অহোরাত্র যন্ত্রণা দিতে থাকিবে। ইহা কি আমার পক্ষে বড় সুখজনক হইবে? এ কথাগুলি বড় গুরুতর; তাই আমার একান্ত অনুরোধ যে এই সকল কথা তোমরা (তুমি ও যোগেন্দর) বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া আমাকে পরামর্শ দেও যে আমার কি করা উচিত। সত্য বলিতেছি—আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি, কোন সুরাহাই দেখিতেছি না। ইতি ইং ১৮৮৯

শ্রীহেমচন্দ্র।"

এই সালিসী কার্য্যে হেমচন্দ্রকে বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল এবং বাল্যবন্ধু যোগেন্দ্রের সহিত

মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী হেমচন্দ্রের কর্ম্মকুশলতায় কার্য্যটী নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছিল এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, এই রূপে উভয় পক্ষের মোকদ্দমায় লক্ষাধিক মুদ্রা বাঁচিয়া যায়। কিন্তু হেমচন্দ্রের সাংসারিক নানা বিপদ ও অশান্তির উপর প্রতিবেশী বন্ধুদিগের গৃহবিবাদ যৎপরোনাস্তি উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তাবৃদ্ধির কারণ হইয়াছিল।

সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লীডার। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি কানিংহাম অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার স্থানে এক জন দেশীয় বিচারপতি নিযুক্ত করা স্থির হয়। এবারেও হেমচন্দ্র উপেক্ষিত হইলেন, ডাক্তার (পরে স্যর) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইলেন। স্যর গুরুদাস আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, হেমচন্দ্র তাঁহার অপেক্ষা প্রবীণ ও বহুদর্শী, প্রথম শ্রেণীর উকিল ছিলেন, সুতরাং এইরূপ নিয়োগে তাঁহার সমপদস্থ অন্য লোকের ঈর্ষা জন্মিতে পারিত, কিন্তু হেমচন্দ্র এরূপ উচ্চান্তঃকরণ ও উদার ছিলেন যে

শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষ

তিনি এই ঘটনায় আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্যর গুরুদাস বলেন যে, "হেমবাবুর ন্যায় উদারতা আমি অল্প লোকেরই দেখিয়াছি। যখন হাইকোর্টের বিচারপতির পদে আমার নিয়োগ সংবাদ প্রকাশিত হয় তখন হেমবাবু পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তিনি সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রের একস্থানে হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে অবশেষে একজন বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টে বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।" আমরা পত্রখানি প্রকাশার্থ অনুমতি চাহিলে, বিনয়ের অবতার স্যর গুরুদাস বলিয়াছিলেন, উহাতে তাঁহার নিজের সুখ্যাতি আছে, সুতরাং তাঁহার জীবিতাবস্থায় উহা তিনি প্রকাশিত করিতে দিতে অসমর্থ। †

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রধান সরকারী উকীল অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অবসর গ্রহণের উদ্যোগ করিলে তদানীন্তন লিগ্যাল রিমেম্ব্র্যান্সর (শুনিয়াছি স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের পরামর্শে) হেমচন্দ্রকে তাঁহার পদে নিযুক্ত

† সম্প্রতি রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর রচিত স্যর গুরুদাসের ইংরাজী জীবন-চরিতে হেমচন্দ্রের পত্রখানি মুদ্রিত হইয়াছে।

করিবার প্রস্তাব করেন। উক্ত বৎসর ১লা এপ্রিল দিবসে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে উমাকালী বাবুর রোজনামচা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

14-1-90. It is very gratifying that friend Hem Chandra is going to be appointed Govt. Pleader. The legal Remembrancer has as good as offered the appointment to him.

14-3-90. Very glad that Hem B. has been appointed senior Govt. Pleader

1-4-90. Hem Babu becomes senior Govt. Pleader to day.

হেমচন্দ্র সরকারী উকীল নিযুক্ত হইলে তাঁহার বন্ধুগণ প্রায় সকলেই আনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু হাই-কোর্টের উকীল ৺বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে তদানীন্তন এডভোকেট জেনারেল এই সংবাদে সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "It is a poor consolation for a judgeship."

'জিয়াফতে সিরাজি।' সরকারী উকীলের পদপ্রাপ্তি উপলক্ষে হেমচন্দ্র বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রিত করিয়া

মহাসমারোহে ভোজ দিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র লোক খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন। যে সময়ে কোন ভোজ দিতেন, সেই সময়ে যাহা কিছু নূতন বা ভাল তাহা আনাইতেন ও নিজে প্রত্যেকের পাতের কাছে গিয়া সেই নূতন দ্রব্য পুনরায় লইবার জন্য অনুরোধ করিতেন। সরকারী উকীল হইবার পরে যে ভোজ দিয়াছিলেন, তাহাতে হেমচন্দ্রের প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন ও হাইকোর্টের প্রায় সকলকেই নিমন্ত্রিত করেন। তাঁহার বাটিতে সামাজিক হিসাবে খাওয়া দাওয়া চলিয়াছিল ও নিকটস্থ একটি বিদ্যালয়গৃহে সাহেবী ফ্যাসনে আহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমি একখানি নিমন্ত্রণের কার্ড পাইয়াছিলাম। তাহাতে লেখা ছিল Ziafatay Shirazi—জিয়াফতে সিরাজি। সিরাজ দেশের লোকেরা অতিথি সৎকারের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। জিয়াফত অর্থে নিমন্ত্রণ সুতরাং 'জিয়াফতে সিরাজি' মানে সিরাজ দেশের লোকেরা যেরূপ অতিরিক্ত পান ভোজন দ্বারা ও আদর যত্ন করিয়া অতিথি সৎকার করিত সেইরূপ নিমন্ত্রণ।" কিন্তু সিরাজি নিমন্ত্রণে পান ভোজনাদি অপেক্ষা অতিথির প্রতি

আন্তরিক ও অকৃত্রিম আদর যত্নেরই আধিক্য সূচিত হয়। এই বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। ইস্পাহান নগরবাসী কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটিতে সিরাজনগর বাসী তাঁহার এক বন্ধু একদা অতিথি হইয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ইস্পাহানী ভদ্রব্যক্তটী বিবিধ প্রকার আয়োজন করিয়াছিলেন এবং প্রতিদিন চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় নানা উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য সুবর্ণপাত্রে সজ্জিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিতেন এবং অতি সমাদরে তাঁহাকে ভোজন করাইতেন। বন্ধুর আগমন উপলক্ষে প্রত্যহ নৃত্যগীতাদির মজলিস করাই-তেন। কোন বিষয়ে বন্ধুর কোন অসুবিধা হইতেছে কি না তদ্বিষয়ে প্রশ্নাদি করিতেন। কিন্তু বন্ধুটি প্রতি-দিনই বলিতেন "তোয়াজু সিরাজি দিগর্ আস্ত্"—সিরাজি আতিথ্য অন্যরূপ। ইস্পাহানবাসী মুখে কিছু না বলিলেও মনে মনে বন্ধুর এই বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া-ছিলেন। আতিথ্যের কি ত্রুটি হইয়াছিল তাহা কিছুতেই তাঁহার বোধগম্য হয় নাই। বিদায়ের সময় সিরাজী বন্ধু ইস্পাহান বাসীকে তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া যান। তোয়াজু সিরাজি সম্বন্ধে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য ইস্পাহানবাসী কিছুদিন পরেই সিরাজে বন্ধুর বাটীতে

উপস্থিত হন। বন্ধু তাঁহার প্রতি বাড়ীর লোকের মত ব্যবহার করেন। শিষ্টাচারের কোনরূপ বাহুল্য না করিয়া, মন প্রাণ খুলিয়া মিলামিশা করেন এবং শয়নে ভোজনে আপনার সহিত বন্ধুর কোনরূপ পার্থক্য রাখেন নাই। নিজে অভ্যাস মত যেরূপ আহার করিতেন, বন্ধুকেও সেইরূপ আহার করিতে দিতেন। যাহাতে বন্ধুর কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ না হয় এইরূপ ব্যবহার করিতেন। বন্ধুকে বিদায় দিবার সময় সিরাজবাসী তাঁহাকে বলিলেন, "তোয়াজ্ সিরাজি এইরূপ।" তখন ইস্পাহানবাসীর চক্ষু খুলিয়া গেল এবং তিনি হৃষ্ট চিত্তে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। হেমচন্দ্র এই বিরাট ভোজ প্রদানকালে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া আহার্য্য সামগ্রী প্রভৃতির মহা আয়োজন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দীনতম ব্যক্তির সহিতও যে সিরাজবাসীর ন্যায় মন প্রাণ খুলিয়া মিলামিশা করিয়াছিলেন ও তাহার প্রতি অকৃত্রিম আদর যত্ন দেখাইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার সিরাজি নিমন্ত্রণ সার্থক হইয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বন্ধুবিয়োগ—রোমিও-জুলিয়েট।

উকীল সভার সভাপতি। অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অবসরগ্রহণের পর হেমচন্দ্র তাঁহার স্থানে প্রধান সরকারী উকীল নিযুক্ত হন, এ কথা পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন। অন্নদাপ্রসাদ অতি সাধু সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন এবং হেমচন্দ্র ও সার রমেশচন্দ্র মিত্র তাঁহার চরিত্রগুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা করিতেন। শেষ জীবনে তিন বন্ধুতে কাশীধামে মিলিত হইয়াছিলেন। একদিন কথোপকথন প্রসঙ্গে অন্নদাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করেন, "রমেশ, প্রত্যহ বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতেছ ত?" রমেশচন্দ্র শিবতুল্য অন্নদাপ্রসাদকে উত্তর দেন, "হাঁ, প্রত্যহই সেইজন্য আপনাকে দর্শন করিতে আসি।"

হাইকোর্টের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে প্রধান উকীলের পদগ্রহণের সহিত হেমচন্দ্রকে উকীল সভার সভাপতির পদও গ্রহণ করিতে হয়। তবে হেমচন্দ্র সচরাচর সভার

উপস্থিত থাকিতে ভালবাসিতেন না। তিনি প্রকাশ্য সভাসমিতিতে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকিতেন। হেমচন্দ্র বহুদিন পূর্ব্বেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফ্যাকল্টি অব্ ল'র অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত ফ্যাকল্টির সভাপতি ছিলেন। প্রথমে হেমচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকল্টি অব্ ল'র সভা প্রভৃতিতে যোগদান করিতেন কিন্তু ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারির পর (অর্থাৎ সরকারী উকীলের পদগ্রহণ করিবার সময় হইতে) তিনি আর ঐ সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই। অবসরাভাব এবং স্বাস্থ্যভঙ্গ বোধ হয় ইহার প্রধান কারণ।

খিদিরপুর বিদ্যালয়। হেমচন্দ্রের অবসর অতি অল্প হইলেও তাঁহাকে অনেক বিষয়ে লিপ্ত হইতে হইত। একবার খিদিরপুর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ-গণের মধ্যে কোনও বিবাদ হওয়ায় উক্ত বিদ্যালয় চাবিবন্ধ থাকে। উভয় পক্ষের শ্রদ্ধাভাজন হেমচন্দ্রকে মধ্যস্থ স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট চাবি গচ্ছিত

রাখা হয়। বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ায় স্থানীয় অধিবাসিগণের বিশেষ অসুবিধা হয় এবং তাঁহারা হেমচন্দ্রকে বিদ্যালয়ের চাবি খুলিয়া দিতে অনুরোধ করার জন্য একটি প্রকাণ্ড সভা আহ্বান করেন। এই সময়ে, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে, সহবাস সম্মতি আইন লইয়া মহা আন্দোলন চলিতেছিল এবং কলিকাতায় ময়দানে নানা সভার অধিবেশন হইতেছিল। এইরূপ একটি সভায় নটরাজ অমৃতলাল বসুকে সভাপতিরূপে অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও রসপূর্ণ বক্তৃতা করিতে শুনিয়া খিদিরপুরের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকেই উক্ত সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত করেন। রহস্যের খনি অমৃতলাল এই সভায় একটি রসপূর্ণ-বক্তৃতা করিয়া উপসংহারে বলেন, "হেমবাবু কবি লোক, তিনি যদি সহজ গদ্যে পত্র লিখিলে চাবি খুলিতে সম্মত না হন, তাঁহাকে কবিতায় চিঠি লেখা হউক :—'হেমবাবু হেমবাবু তুমি বড় কবি।

খুলে দাও খুলে দাও ইস্কুলের চাবি ॥'

বন্ধুবিয়োগ। (ক) মহেশচন্দ্র চৌধুরী

জীবনের অপরাহ্নে হেমচন্দ্র তাঁহার কতিপয় শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুর বিয়োগে হৃদয়ে বিষম বেদনা প্রাপ্ত হন। সরকারী

উকীল হইবার কয়েক মাস পরেই হেমচন্দ্র তাঁহার অকৃত্রিম সুহৃদ মহেশচন্দ্র চৌধুরীকে হারাইয়াছিলেন। মহেশচন্দ্র কেবল প্রথম শ্রেণীর উকীল ছিলেন না, তিনি অকপট স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন এবং সেইজন্য হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। মহেশচন্দ্রের মৃত্যু হইলে মনোমোহন ঘোষ মহাশয় ষষ্ঠ কংগ্রেসের অধিবেশনে অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতির আসন হইতে বলিয়াছিলেন :—

"In him Bengal has lost one of her truest patriots, and the National Congress one of its most earnest supporters and active workers. I had the high privilege of enjoying his friendship for many years, and I can unhesitatingly assert that this Presidency has not yet produced a man whose memory ought to be more dearly cherished by us than that of my lamented friend Mohesh Chunder Chowdhury. In simplicity of habits and purity of iife he was essentially what a pious Hindu ought to be, while in breadth of views, in honesty of purpose and in general culture

few men excelled him even among the more favoured races of the West."

মহেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি স্যর কোমার পেথারাম দুঃখপ্রকাশ করিলে উকীলদিগের প্রতিনিধিরূপে হেমচন্দ্র যে উত্তর দেন, তাহা হইতে মহেশচন্দ্রের সহিত হেমচন্দ্রের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা বুঝা যায়। আমরা হেমচন্দ্রের বক্তৃতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

"We are deeply thankful to your Lordship for the kind sentiment to which you have just given expression. The death of Babu Mohesh Chandra Choudhury is a matter of deepest sorrow to us. As a lawyer, as an advocate and as a man, he occupied the foremost place amongst us. He was one of those gifted men who served not only to shed lustre upon, but to raise the reputation of our body. As a lawyer he was never captious or hair splitting: he cnnsidered every question from the broadest point of view. and his

মহেশচন্দ্র চৌধুরী

arguments were always cogent and comprehensively founded on legal principles of wide application. Then as our advocate he was earnest and enthusiastic. He never took a desponding view of his client's case. Possessing one of the clearest intellects, and a strong and retentive memory, his resources never failed him and he was always able to present his case in the least objectionable shape, and his advocacy was for the most part impressive and effective. Lastly he was equally distinguished as a man spotless in character, amiable in manners. Kindly of heart and generously disposed, he was always willing and ready to assist those who sought his help. He never shirked any duty private or public. In short he was a man whose place it will not be easy to fill. His death is not only a heavy loss to us, but a loss to the whole country.[১]"

---

১ The Statesman, August 15, 1890.

(খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।—সন ১২৯৮ সালে ১৩ই শ্রাবণ দিবসে (ইং ২৯শে জুলাই ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে) দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর স্বর্গারোহণ করেন। বিদ্যাসাগর ও হেমচন্দ্র পরস্পরকে অতিশয় শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন। উভয়েরই হৃদয় পরদুঃখকাতর, উভয়েরই শক্তি স্বদেশহিতসাধনে সর্ব্বদা উন্মুখ! এ অবস্থায় পরস্পরের মধ্যে যে আন্তরিক শ্রদ্ধার ভাব বিকশিত হইয়া উঠিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ৺সুরেশ সমাজপতির মুখে শুনিয়াছি হেমচন্দ্র প্রায়ই তাঁহার ক্রুহামে বিদ্যাসাগরের বাটীতে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। "উৎসাহে গ্যাসের শিখা ভ্রাচ্যে শালকড়ি" বিদ্যাসাগরকে 'হুতোমপ্যাঁচার গানে' পূর্ব্বেই হেমচন্দ্র শ্রদ্ধার অর্ঘ প্রদান করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুসংবাদে হেমচন্দ্র নিরতিশয় ব্যথিত হন এবং একটি কবিতায় তাঁহার শোক প্রকাশ করেন। কবিতাটি বোধ হয় এই দুঃসংবাদপ্রাপ্তিমাত্র রচিত এবং মুদ্রিত হইয়াছিল, কারণ কয়দিন পরেই (৩রা আগষ্ট তারিখে) উমাকালী মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রোজনামচায় এই কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন। দ্রুতরচনা এবং

শোকের গভীরতার জন্য বোধ হয় কাব্যহিসাবে এই কবিতাটি মধুসূদনের স্বর্গারোহণ রচয়িতা কবি হেমচন্দ্রের উপযুক্ত হয় নাই, কিন্তু উহা বন্ধুবৎসল হেমচন্দ্রের সহৃদয়তার যথেষ্ট পরিচয় দেয়—

স্বাধীন স্বতন্ত্র চিত্ত কাহার তেমন ?
দর্প, নির্ভীকতা, বীর্য্য—যে কিছু লক্ষণ
তেজীয়ান পুরুষের—সবই ছিল তাঁয়
তৃণজ্ঞান পদ-মান অবজ্ঞা যেথায়।
শ্বেতাঙ্গ প্রসাদ (ও) গর্ব্বে ঠেলিত হেলায়।
হেন পুত্র, হায় মাতঃ, হারালে কোথায় ?—
হারালে কোথায় পুত্র হেন পুণ্যতম,।
আত্মা যাঁর সত্য আর সাধুতা আশ্রম।
হৃদয়ে যাঁহার দয়া—সাগরের সম।

(গ) বঙ্কিমচন্দ্র। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ৮ই এপ্রিল দিবসে সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন। ইঁহার সহিত হেমচন্দ্রের যে কিরূপ প্রীতি-সম্বন্ধ ছিল তাহা বলা বাহুল্য। ইঁহার পরলোক গমন হেমচন্দ্রের হৃদয়ে গভীর শোকের ছায়াপাত করে। ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় সম্পাদিত 'নব্যভারতে' আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত "কেন কাঁদ" শীর্ষক কবিতায় হেমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (যৌবনে)

তাঁহার পরলোকগত বন্ধুকে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা এই কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব—

যাদুকর যেন কৌশলে দেখায় কতই বিচিত্র ছবি,
তেমনি বিচিত্র চিত্র নব নব ভাষায় আঁকিল কবি।
প্রতিভা ছটায় অপূর্ব্ব শোভায় গাঁথিয়া ঘটনাবলি,
নভেলের ছলে নবরসে খেলে করে কত চতুরালি।
কখন (ও) হাসায় কখন (ও) কাঁদায় কখন (ও) আশার
ছলে,
মাতাইয়া প্রাণ, গায় বীরগান "বন্দে মাতরং" বলে॥

কভু---বর্ম্মসার কভু কর্ম্মভার, নিগূঢ় তত্ত্বের কথা—
বাখানে সুচারু সরল ভাষায় ধরিয়ে নূতন প্রথা।
বাখানে আবার ইতিহাস বাণী ভারত নির্ঘণ্ট করি—
কিবা অকলঙ্ক পূর্ণ নরদেব ভারত কাণ্ডারী হরি।
নাহিক এমন সাহিত্য ভাণ্ডার সুদৃষ্টি ছিল না যায়,
একা ছিল এক সহস্র জিনিয়া ধীরেন্দ্র বীরেন্দ্র প্রায়।

কোথা আছ তুমি কোথা সে তোমার জ্ঞানপরিষদ যত
গেলে কি ছাড়িয়া প্রিয় জন্মভুমি পুরণ না হতে ব্রত?
কে পারিবে তব রাজদণ্ড নিতে তিলক ধরিতে ভালে?
তোমার মতন সাধক রতন পাব আর কতকালে?

বিহনে তোমার করে হাহাকার বঙ্গ নর-নারী আজ
হে বঙ্গভূষণ প্রিয় অতুলন বঙ্গের সাহিত্যরাজ।

ধন্য ক্ষণজন্মা জনমিলে ভাই আজন্ম-দুঃখিনী কোলে,
ভুলালে বঙ্গের নরনারীগণে অমিয়া মধুর বোলে ;—
গেলে কীর্ত্তি রাখি চিরদিন তরে এ ভারত মহীতলে।
দিয়ে জীবদান বাঙ্গালীর দেহে জ্বালাইলে শিখা তায়,
জাগ্রত করিয়া বঙ্গ নারী নরে ভাতিলে নব বিভায়।
আপনি গঠিলে আপনার দল সোদর সদৃশ প্রেমে,
শত ডোর দিয়া হৃদয়ে বাঁধিলে কত রবি চন্দ্র হেমে।

(ঘ) রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ভুদেব মুখোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জুলাই তারিখে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুদিন পরে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই মে তারিখে ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমন করেন। উভয়েই হেমচন্দ্রের পরম শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু ছিলেন। বিশেষতঃ ঋষিকল্প ভূদেবকে হেমচন্দ্র গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন। 'হুতোম প্যাঁচার গানে' ইঁহাদের উভয়েরই তিনি গুণগান করিয়া

ছিলেন। ইঁহাদের পরলোক গমনেও হেমচন্দ্র হৃদয়ে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হন।

কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ। এইবার আমরা হেমচন্দ্রের পারিবারিক দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। প্রথম ঘটনা তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ। এই বিবাহ একটু 'রোম্যান্টিক' ধরণের। হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা অনুশীলা দেবীর (হেমচন্দ্রের আদরের ডাকনাম 'ঝনী বুড়ী') জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছিল। হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় ভ্রাতা মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন তিন চারি বৎসরের বালক মাত্র, তখন হইতেই তিনি হেমচন্দ্রের পরম স্নেহের পাত্র হন। হেমচন্দ্র পাইকপাড়ায় জ্যেষ্ঠা কন্যার শ্বশুরালয়ে গমন করিলেই মন্মথনাথকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতেন এবং বৈবাহিক গোপালচন্দ্রকে বলিতেন, "দেখুন, এবার গৃহিণীর যদি কন্যা হয় তবে এই ছেলেটিকে আমি জামাই করিব।" গোপালচন্দ্র শুনিয়া হাসিতেন। মন্মথনাথও হেমচন্দ্রের স্নেহে এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে তিনি প্রায়ই সুশীলা দেবীর

৺অনুশীলা দেবী

সহিত খিদিরপুরে যাইতেন এবং দীর্ঘকাল সেখানে অবস্থিতি করিতেন। মন্মথনাথের মুখে শুনিয়াছি হেমচন্দ্র প্রায়ই তাহাকে কিছুনা কিছু দ্রব্য উপহার দিতেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের "মরকতকুঞ্জে" তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে হেমচন্দ্র পথিমধ্যে সুশীলা দেবীকে দেখিয়া যাইতেন। একবার বালক মন্মথকে বলেন, "যদি মধুসূদনের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে রচিত কবিতাটি মুখস্থ করিয়া, পরে যেদিন আসিব সেই দিন তাহা আবৃত্তি করিতে পার,তোমাকে দশ টাকা পুরস্কার দিব।" মন্মথনাথ কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া হেম বাবুর নিকট হইতে দশ টাকা পুরস্কার এবং প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুকালে মন্মথনাথ মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউসনে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন। একদিন হঠাৎ হেমচন্দ্র তাঁহাদিগের বাটিতে উপস্থিত হইলেন এবং এক তাড়া কাগজ মন্মথনাথকে দিয়া বলিলেন, "এইগুলি স্কুলে বিতরণ করিও।" বলাবাহুল্য সেগুলি বিদ্যাসাগরের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে হেমচন্দ্রের রচিত কবিতা। তাহার পর গোপালচন্দ্রকে লইয়া একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। বৈকালে বিদ্যালয় হইতে প্রত্যা-

৺মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

গমন করিয়া মন্মথনাথ শুনিলেন যে হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা অনুশীলা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। পুত্র অল্পবয়স্ক বলিয়া গোপালচন্দ্রের আপত্তি হওয়ায় হেমচন্দ্র বৈবাহিকার নিকট মিনতিপূর্ণ প্রার্থনা জানান এবং তিনি হেমচন্দ্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। যথাসময়ে মন্মথনাথের সহিত অনুশীলা দেবীর বিবাহ হয়। মন্মথনাথ নানাস্থানে কার্য্য করিয়া শেষে আলিপুরের ট্রেজারারের পদ প্রাপ্ত হন। ইনি সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন।

পত্নীর উন্মাদ-রোগ। হেমচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী কামিনী দেবী চিরদিনই অল্পবুদ্ধি ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহাতে উন্মাদের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে লক্ষণগুলি আরও সুস্পষ্ট-ভাবে দেখা গেল। একদিন প্রাতে গঙ্গাস্নানে বহির্গত হইয়া তিনি পথ হারা হইয়া হেমচন্দ্রের বিশেষ উদ্বেগ ও আশঙ্কার কারণ হন। উমাকালী বাবুকে লিখিত হেমচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে পাঠকগণ এই ঘটনার পরিচয় পাইবেন!

Kidderpore
7th Oct' 93.

My dear Umakali,

Yours of the 4th. What you have heard about my wife is correct except that she was found in a potter's shop. The fact is that she went out of the house at about 5½ A.M. shortly after Netto, Jogee's wife and others for the purpose of bathing in the Ganges, thinking that she would be able to catch them as they had gone just a few minutes before. But her mistake was that she left the house alone and missed the road. You know the পঞ্চাননতলা ঘাট and that just adjoining it there is a staircase leading to the গুড়ের আড়ত situated just above it. She was found in a niche or arch of one of these stairs with her face completely covered by her veil and another piece of cloth in her right hand. It was such a retreat as to be wholly out of sight and it was thus that she escaped being seen although the ghat was searched more

than once. It appears that by following this road before her and other people going to bathe the same way she managed somehow or other to come to the পঞ্চানন-তলা bathing ghat, but that oppressed afterwards with fear and shame, had taken refuge in this out of the way retreat. It was indeed fortunate that she had taken shelter here, or else I shudder to think of where she might have gone and what the consequence might have been. Thank God it was no worse than it was. Nothing particular has happened since then and she is as usual. I am glad to hear that your wife and the children are doing well and that you will be soon able to recruit your own health in Simla. My dear Umakali, wbether a real B.A. or a false one it is all the same to me now*—I have no

* যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতে" প্রকাশিত একখানি পত্রে মাইকেল হেমচন্দ্রের সমালোচন শক্তির সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছেন যে একজন "real B. A." তাঁহার মেঘনাদবধের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

onger any appetite for these things. Jogendra was kind enough to write to me expressing his deep concern and sympathy and inviting me to pass my time with him at his quiet place getting what mental relief I could. I called on him and explained the difficulties in my way i. e. 'the difficulties in my keeping away from my wife. I am now trying to induce her to go to a place not far from Tarkesshur for the celebrated *balas*. If she agrees I will first send her there and afterwards either send her or take her to Benares, provided also she consents.

এই পত্রের শেষভাগে কবিবর তাঁহার পত্নীর আরোগ্য লাভের জন্য কতদূর ব্যগ্র ছিলেন তাহা বুঝা যায়। স্বাধীনতার কবি তাঁহার উন্মাদিনী পত্নীরও সম্মতি না লইয়া কোন কার্য্য করিতে অসম্মত !

পরের সুখের জন্য হেমচন্দ্র সকল প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু নিজের সুবিধার জন্য নিকটতম আত্মীয়কেও সামান্য অসুবিধা

ভোগ করিতে দিতে পারিতেন না। পূর্ব্বোদ্ধৃত পত্রে দেখা যায় যে হেমচন্দ্র পত্নীকে বারাণসীধামে ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের বাটীতে লইয়া যাইবেন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে পূর্ণচন্দ্রের অসুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া কার্য্যতঃ তাহা করেন নাই। তিনি উমাকালী বাবুকে ১৬ই অক্টোবর ১৮৯৩ তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে লিখিতেছেন—

In continuation of my acknowledgment of your last letter, my wife is almost in the same state as before. As for my taking my wife to Benares now there is a great difficulty in the fact that Poorna's second son Prafulla is very badly ill. Poorna is seriously alarmed and seems to be quite put out. This is hardly the time when I should take my wife there. This compels me also to remain at home, for I cannot very well leave my wife and go out to any place. Pecuniary considerations are also in the way.

উদ্ধৃত পত্রের শেষভাগে কবির আর্থিক অভাবের

উল্লেখ আছে। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় শেষাবস্থায় হেমচন্দ্রের নিকটে প্রায় যাইতেন। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন যে পত্নীর উন্মাদ রোগের জন্য ও অন্যান্য কারণে হেমচন্দ্রের যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। বাস্তবিক হেমচন্দ্র প্রেমময় স্বামী ছিলেন। তিনি পত্নীকে নীরোগ ও সুখী করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি যে শেষ জীবনে অবিমিশ্র দাম্পত্য সুখলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন ইহা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়।

'রোমিও-জুলিয়েত'—বহুদিন হেমচন্দ্রের কোনও নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। প্রকাণ্ড পরি-বারের নানা ঝঞ্ঝাট, ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং মানসিক অবসাদ অভিনব গ্রন্থরচনার পক্ষে অনুকূল ছিল না। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বাণীসেবক হেমচন্দ্রের লেখনী একেবারে অচলা হয় নাই। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার লেখনীবিনিঃসৃত 'রোমিও জুলিয়েত' প্রকাশিত হয়। উহার প্রকাশ কালে কলিকাতা গেজেটে উহার নিম্নো-দ্ধৃত সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয়:—

"পুস্তকের নাম—"রোমিও জুলিয়েত"—বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। ২০নং সুকীয়া ষ্ট্রীট হইতে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ২১।৩ নং নন্দকুমার চৌধুরীর লেন হইতে 'আর্য্য সাহিত্য সমিতি' কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশের তারিখ ২০শে জুলাই ১৮৯৫। পত্রসংখ্যা ১১৯ ডিমাই ১২ পেজী। প্রথম সংস্করণ ১০০০ ছাপা হইল। মূল্য আট আনা মাত্র। গ্রন্থ সর্ব্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—খিদিরপুর মন্তব্য—A drama based on Shakespeare's 'Romeo and Juliet' with modifications in the plot introduced with a view to give it a Bengali air and to make it acceptable to the Bengali public. The author is well-known as a Bengali poet of considerable powers.

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইলেও "রোমিও জুলিয়েত" নাটকখানির রচনা বহুদিন পূর্ব্বেই আরম্ভ ও শেষ হইয়াছিল। যখন প্রতিবেশী ঘোষ মহোদয়দিগের গৃহবিচ্ছেদে উভয়ের হিতৈষী হেমচন্দ্র ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, সেই সময়েই তিনি তাঁহার প্রিয়কবি সেক্সপীয়রের এই জগৎপ্রসিদ্ধ নাটকখানির ছায়াবলম্বনে 'রোমিও-জুলিয়েত' লিখিতে আরম্ভ করেন। উমাকালী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রোজনামচা হইতে যে কয়েকটি পংক্তি নিম্নে

উদ্ধৃত হইল তাহা পাঠে প্রতীত হয় যে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসেই গ্রন্থখানির খসড়া রচনা শেষ হইয়াছিল।

12. 10. 1888 Heard Hem Babu's rendering of Romeo and Juliet: I think it will require to be abbreviated in order to make it suitable for our stage. He has rendered and adapted it excellently I must say.

13. 10. 1888. Heard Hem Babu's rendering of Romeo and Juliet into Bengali drama. The fifth act impressed me much and I had to shed tears over several passages. There may be slight defects here and there but altogether the rendering is excellent.

হেমচন্দ্রের গ্রন্থখানি সেক্সপীয়রের গ্রন্থের অনুবাদ নহে। হেমচন্দ্র গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

"এই পুস্তকখানি সেক্সপীয়রের রোমিও জুলিয়েট নামক নাটকের ছায়ামাত্র, তাহার অনুবাদ নহে। বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় প্রকৃতি-গত এত প্রভেদ যে, কোনও একখানি ইংরাজী নাটকের কেবল অনুবাদ করিলে তাহাতে কাব্যের রস কি মাধুর্য্য কিছুই থাকে না, এবং দেশাচার, ও লোকাচার ও ধর্ম্ম

বিভিন্নতা-প্রযুক্ত, এরূপ শ্রুতিকঠোর ও দৃশ্য কঠোর হয় যে, তাহা বাঙ্গালী পাঠক ও দর্শকদিগের পক্ষে একেবারে অরুচিকর হইয়া উঠে। সেই জন্য আমি রোমিও জুলিয়েটের কেবল ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি প্রকাশ করিলাম। মূলের কোন কোনও স্থান পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছি, কোথাও দু একটা নূতন গর্ভাঙ্কও সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষদিগের নাম ও কথাবার্ত্তা দেশীয় করিয়া লইয়াছি, কিন্তু প্রধান প্রধান নায়ক নায়িকাগণ ও তাহাদের চিত্ত বা চরিত্রগত ভাব, মূলে যেখানে যেরূপ আছে, সেইরূপই রাখিতে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ফলতঃ সেক্সপীয়রের নাটকের গল্পের ও তাহার প্রধান প্রধান নায়ক নায়িকাদিগের চরিত্রের সারাংশ লইয়া তাহা দেশীয় ছাচে ঢালিয়া, স্বদেশীয় পাঠকের রুচিসঙ্গত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। তবে আমার ধারণা এই যে, এইরূপ কোনও প্রণালী অবলম্বন না করিলে কোনও বিদেশীয় নাটক, বঙ্গসাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারিবে না, এবং তাহা না হইলেও বাঙ্গালা সাহি-ত্যের সম্পূর্ণ পুষ্টিলাভ ও প্রকৃতিগত উন্নতি হইবে না। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমশঃ বিদেশীয় নাটক কবিতাদির অবিকল অনুবাদ বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযোগী হইতে পারে কিন্তু আপাততঃ কিছুকাল এই প্রণালী অনুসরণ করা অপরিহার্য্য বলিয়াই আমার ধারণা।"

'রোমিও জুলিয়েত' গ্রন্থখানির প্রথম খসড়া উমা-

কালী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় বন্ধু কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইলেও হেমচন্দ্রের মনঃপূত হয় নাই। হেমচন্দ্রের নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত করিবার জন্য অনেক প্রকাশক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ২৪শে আগষ্ট তারিখে উমাকালী তাঁহার রোজনামচায় লিখিয়াছেন—

"Kedar Roy came and saw me after a long time. He wants to publish Hem Babu's adaptation of Romeo and Juliet.

কিন্তু হেমচন্দ্র গ্রন্থখানি প্রকাশের অনুমতি প্রদান করেন নাই। গ্রন্থখানি কিছুকাল ফেলিয়া রাখিয়া, পরে আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া উহা ছাপিতে দেন। এই গ্রন্থ লিখিয়া যে তাঁহার যশোবৃদ্ধি হইবে না তাহা হেমচন্দ্র বিলক্ষণ জানিতেন। তবে উহা কেন প্রকাশিত করিলেন তাহার কারণ হেমচন্দ্র বন্ধু উমাকালীকে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

Kidderpur
Octr. 1, 1894.

My dear Umakali

* * * As for myself I have fiuished

revising (I should rather say almost re-writing,) but whatever it is I have done with it. It is not a translation of Romeo and Juliet as you know, but an adaptation of it, keeping only the best portions of the original intact as much as it was possible and in my power under the circumstances. How far I have succeeded I do not know (an author is always partial to himself) but Srish has heard me read portions of it and thinks favorably of the work. I would have wished that he had read the whole of it, or at least more of it and more critically, but he would not do it saying it was not necessary and that he was satisfied that the book would be received favorably by all who had any appreciation. But the public generally has very little appreciation, specially in works of this kind of which the difficulties are very little understood. But whatever the reception happens to be, I have taken my plunge and must be prepared for all consequences, however

unpleasant. It is my folly that I am going again to expose myself to all the bitter anxieties and uncomfortable feelings of an author desirous of public applause, of which I had been quite free for many years past by abstaining from all literary labours. But is it folly really ? My individuality is as a literary man, for I am nothing except as such, and unless I wish to be quite dead and forgotten even while I am alive, I fear I must continue my struggles as aliterary worker. To cease working and struggling is to fall back and drop out altogether from the course I have been hitherto pursuing. Want of health or incapacity to work are quite different things and may perhaps afford sufficient excuse for being prematurely dead. The idea that has chiefly influenced me in coming out with the book is that if by doing so any service in any way is likely to be rendered to the cause of the literature of my country I ought not to hold back. I pray God

that He may give me strength of mind to bear whatever unpleasantness there may be in store for me. As for your being able to read the book at Simla I am not in a position to hold out any promise. The Aryan Literary Club (the firm that has published the last edition of Granthab-ali—the very last I mean) is going to bring out the book, but they (why they—no other firm in Calcutta can) cannot begin work at once on account of the Pujas being so close at hand. The whole of their establishment will be on leave until the Dwadasi, so that they cannot do anything all this time. They will put their hand to the work from the Trayodasi day and it will, perhaps, take fifteen or twenty days at least to finish the printing. Will there be time enough to bring out the work so that you may be able to read it there at Simla ? I am in doubt. But I shall send you one of the first copies I get wherever you happen to be at the time. I shall try to make the get-up of the

book much better than it was the case with either of the last two editions of the *Granthabali*, and the firm has promised it. But I am not quite sanguine, for it does not do to render any Bengali work very costly and you cannot have a nicely got up book without making it costly. However I shall try. I send to you at Agra as I find from your letter you must be still there. Romesh Babu has gone home to Bistopur for the pujah and Srish will leave today or tomorrow. I must vegetate here.

Yours as ever
Hem Chandra Banerjee.

বিদেশীয় সাহিত্যের অনুবাদে লেখককে যেরূপ পরিশ্রম করিতে হয় তদনুরূপ প্রশংসা বা সমাদরলাভ তাঁহার অদৃষ্টে প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। রোমিও জুলিয়েত সাধারণ্যে আশানুরূপ সমাদর লাভ করে নাই। সতর্ক পাঠকগণ বহুস্থলেই কবিবরের ক্ষীয়মানা প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। কয়েকটি দৃশ্যে

হেমচন্দ্র অনুবাদে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব্ব ভাইসচেয়ারম্যান বন্ধু গোপাললাল মিত্রকে লিখিত হেমচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত ইংরাজী পত্রে তিনি গোপাললালকে বাতায়নের দৃশ্য (২য় অঙ্ক ২য় দৃশ্য), জুলিয়েতের কক্ষের দৃশ্য (৩য় অঙ্ক ৫ম দৃশ্য) এবং শ্মশানের দৃশ্য (৫ম অঙ্ক ৩য় দৃশ্য) পাঠ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন।

My dear Gopal Lal,

I did not send this before as I did not know your address at Hardwar. Now that your month's leave is over, I send the book to you direct to your Calcutta address. Do kindly read *at least* the window and the Chamber Scenes and tomb (attered into the শ্মশান) scene.

Yours affly,
HEM CHANDRA.

রোমিও জুলিয়েতের পাণ্ডুলিপি দৃষ্টে প্রতীত হয় যে শেষ অঙ্কে কবিবর আর একটি এইরূপ দৃশ্য সন্নিবিষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—

'রঙ্গক্ষেত্রের অন্তভাগ

রমণীয় বনরাজির প্রান্তদেশ প্রক্ষালন করিয়া মৃদুশব্দে গঙ্গা প্রবাহিতা।

রাজা অনুচরগণের সহিত যখন নিষ্ক্রান্ত সেই সময় রোমিও ও জুলিয়েটের মৃতদেহ বাহিত হইয়া রঙ্গক্ষেত্রের সেইভাগে গঙ্গা-তীরে স্থাপিত।

গোঁসাই। কৃতলগ্ন গলবস্ত্র করযোড় করি

বন্দে মাতর্গঙ্গে।

হরিপদ সংস্থুতা ত্রিলোক বিরাজিতা ইত্যাদি—

কবিবর পরে এই দৃশ্যটি বর্জ্জন করিয়াছিলেন। গঙ্গাস্তোত্রটি গ্রন্থ প্রকাশের বহুদিন পূর্ব্বে "প্রচারে" প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় উহা সন্নিবিষ্ট করেন নাই।

কবিবরের আলোচ্য গ্রন্থেরও কোন কোনও অংশ বাঙ্গালার সুভাষিত সংগ্রহে স্থান পাইবার যোগ্য। যথা

অঙ্গে যার অস্ত্রাঘাত হয়নি কখন,
হাসে সেই ক্ষতচিহ্ন করি দরশন।

* * *

যে নাম সে নামে কেন ডাকো না গোলাপে
গোলাপের মিষ্ট গন্ধ গোলাপেই থাকে।

*　　*　　*

পাষাণ প্রাচীরে প্রেম রোধিতে কি পারে?
অসাধ্য প্রেমের নাই সঙ্কল্প সাধনে
বিপদে না করে ভয় না ডরে শমনে।

*　　*　　*

অগাধ বারিধি সম দান শক্তি প্রেমে,
দুই-ই অশেষ দানে দুই-ই না ফুরায়।

প্রণয়ে ধৈরয চাই প্রণয় তবে সে
হয় স্থায়ী কালব্যাপী প্রণয় তাহাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অন্ধাবস্থা—'চিত্তবিকাশ'।

কয়েকটী পারিবারিক ঘটনা।—বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি বন্ধুগণের বিয়োগে হেমচন্দ্র কিরূপ ব্যথিত হইয়া ছিলেন তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এই সময়ে কয়েকটি পারিবারিক দুর্ঘটনাতেও তিনি হৃদয়ে বিষম আঘাত-প্রাপ্ত হন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র অনুকূলচন্দ্রের পত্নী এই সময়ে পরলোক গমন করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র দ্বিতীয়বার তাঁহার বিবাহ দেন। এই সময়ে কনিষ্ঠ পুত্র অকূলেরও বিবাহ দেন, কিন্তু বিবাহের অত্যল্প-কাল পরেই তাঁহার বালিকা পত্নীকে অকূলপাথারে ভাসাইয়া এবং হেমচন্দ্রের বক্ষে শেলাঘাত করিয়া তিনি পরলোকে গমন করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জুন হেম-চন্দ্রের বৈবাহিক রায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর নিউমোনিয়া রোগে কয়েকদিন মাত্র ভুগিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হন। হেমচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র প্রতুল-চন্দ্রের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় হেমচন্দ্র ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে

১০ মার্চ্চ দ্বিতীয়বার তাঁহার বিবাহ দেন। হেমচন্দ্রের তৃতীয় ভ্রাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র কিছুকাল পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিধবা পত্নীও এই সময়ে গতাসু হন। পারিবারিক নানা দুর্ঘটনায় হেমচন্দ্রের ভগ্নস্বাস্থ্য আরও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। পত্নীর উন্মাদ রোগ, পুত্রগণের উচ্ছৃঙ্খলতা, নানাপ্রকারে অর্থহানি তাঁহার দুর্ব্বল মনের উপর প্রবলভাবে আঘাত করিতেছিল। এই সময়ে তিনি আর একটি ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন—তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুতে।

ঈশানচন্দ্রের আত্মহত্যা।—ঈশানচন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ হেমচন্দ্রের ন্যায় অতিশয় ভাবপ্রবণ ছিলেন। কিন্তু যেমন কাব্যরচনায়, তেমনই জীবনেও হেমচন্দ্র সর্ব্বত্র আপনাকে সংযত করিতে পারিতেন, ঈশানচন্দ্র উদ্দাম আবেগে ভাসিয়া যাইতেন। ঈশানচন্দ্র বায়রণের ন্যায় বলিতে পারিতেন—

> "চিত্তবৃত্তি নিরোধিতে না শিখি যৌবনে
> আমার জীবন উৎস হ'ল বিষময়—

এবং এই বিষময় জীবনের অসহ্য জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন তিনি বিষপান

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

করিয়া আত্মঘাতী হন। "যোগেশ" কাব্যের উৎসর্গ পত্রে ঈশানচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"ব্যক্তিমাত্রেরই ভ্রান্তি আছে, যোগেশেরও সেই ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল। কিন্তু যোগেশের সেই ভ্রান্তি সেই অদূরদর্শিতা ও অবিমৃষ্যকারিতা সত্ত্বেও জীবনে এমন কয়েকটি প্রধান ধর্ম্ম ছিল, যাহা এ সংসারে অতি অল্প লোকেরই দেখিতে পাই—সেই জন্যই বলি যে যোগেশ ঘৃণার পাত্র নহে। * * নিঃস্বার্থ প্রেম অথবা প্রকৃত ভালবাসা যোগেশের একটি প্রবল ধর্ম্ম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তিনি তাঁহার অপার্থিব প্রেমধর্ম্ম অযথা পাত্রে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। * * যে যোগেশ মানব জীবনের আদর্শস্থল হইবার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন, যে যোগেশ শিক্ষা, দীক্ষা ও জ্ঞানে পণ্ডিতাগ্রগণ্য হইবেন আশা করিয়াছিলাম—সেই যোগেশ শুধু একটি মাত্র ভ্রান্তিতে পতিত হইয়া ধন, মান, যশ, আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাষ হারাইয়া, সমাজের চক্ষে ঘৃণিত হইয়া, ঈশ্বরের চক্ষে ততোধিক উপেক্ষিত হইয়া, সামান্য পথিকের মত, নবীন বয়সে—ভগ্ন হৃদয়ে, সাশ্রুনয়নে জীবন হারাইলেন, এ কথা স্মরণ করিলে আমার এক

অভাবনীয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। কিন্তু যোগেশ যাহাই হউন, তিনি সহানুভূতির পাত্র।"

উপরিধৃত বাক্যগুলির অনেকাংশ ঈশানচন্দ্রের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। পথভ্রান্ত ঈশানচন্দ্র মাতৃ-ভক্ত পুত্র, ভ্রাতৃবৎসল সহোদর ও বন্ধুবৎসল সখা ছিলেন। আর তিনি বাঙ্গালীর স্মরণীয়—বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবক বলিয়া। ঈশানচন্দ্র শৈশব হইতেই হেমচন্দ্রের ন্যায় বীণাপাণির চরণ সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন :—

আশৈশব বীণাপাণি তোমার চরণ
পূজিয়াছি নিশিদিন নয়নের জলে,
আশৈশব হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়া
করিয়াছি ধৌত তব চরণ পঙ্কজ।
অকূল সাগরে পড়ি শিশুকাল হতে
তরঙ্গে তরঙ্গে বক্ষঃ গিয়াছে ভাঙ্গিয়া

ভুজঙ্গ গরল হতে তীব্রতর বিষ
বহিতেছে হৃদয়ের শিরায় শিরায়।
অনলে গরলে বক্ষ জ্বলিয়া ডুবিয়া
কি যে হইয়াছে এই প্রাণের ভিতর,
বর্ণিব কি তাহা তব নহে অগোচর।

এহেন জীবনে মাতঃ এত যন্ত্রণায়
ভুলি নাই ক্ষণকাল তোমার চরণ,
ভীম যাতনায় যবে কেঁদে ওঠে প্রাণ,
উদ্দেশে চরণ তব চেপে ধরি বুকে,
তখনি আনন্দ যেই বিরাজে অন্তরে
স্নিগ্ধ হয় বহ্নি তায় মিষ্ট হয় বিষ।

*　　*　　*

জীবনের সব সাধ করি বিসর্জ্জন
তোমার চরণ মাত্র করেছি সম্বল।
ঐশ্বর্য্যের শিরোদেশে পদাঘাত করি
ভিক্ষুকের বেশে আছে সাধক তোমায়।
এইরূপে এই ভাবে এমনি আনন্দে
চিরদিন পারি যেন পূজিতে, জননি,
তোমার চরণযুগ, ভোগের লালসা
প্রীতিপূর্ণ বক্ষে মম নাহি জাগে যেন।
নির্লিপ্ত হইয়া যেন হেন নিরুদ্বেগে
তব সাধনায় মম থাকে চিরমতি।

গীতি কবিতার ক্ষেত্রে ঈশানচন্দ্রের স্থান কোথায়, এস্থলে তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। দুঃখবাদের ও অতৃপ্ত প্রেমের এই কবি যে সামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, তাঁহার অকাল মৃত্যুতে যে

অনেক সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। ইঁহার জীবনের এই শোচনীয় পরিণাম ভ্রাতৃবৎসল হেমচন্দ্রের হৃদয়ে ভীষণভাবে আঘাত করিয়াছিল।

অন্ধাবস্থা ও দারিদ্র্য।—হেমচন্দ্র বহুদিন হইতে মধ্যে মধ্যে বাতে খুব কষ্ট পাইতেন। প্রায়ই হাঁটুতে ফ্লানেল জড়াইতেন। 'রোমিও জুলিয়েতে'র (১৮ই ফাল্গুন ১৩০১ সাল ইং ১লা মার্চ্চ ১৮৯৫ সাল তারিখ সম্বলিত) ভূমিকার শেষে হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন "এই পুস্তক কিয়দ্দূর ছাপা হইতে না হইতে আমি বিষম রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ি, এখনও সুস্থ হইতে পারি নাই।" এই সময় হেমচন্দ্র নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন এবং ডাক্তার ম্যাকনেলের বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় তাঁহার জীবন রক্ষা পায়। তাঁহার শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ইহার পর তাঁহার দুই চক্ষুতেই ছানি পড়িতে আরম্ভ হয়। বাম চক্ষুটিতে কিছু বেশী ছানি পড়িতে থাকে। ক্রমে দৃষ্টি এত ক্ষীণ হইয়া পড়িল যে উচ্চতম শক্তির চশমার সাহায্যেও আর উত্তমরূপে লেখাপড়ার কার্য্য করিতে পারিতেন

না। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই মে তারিখে উমাকালী বাবু তাঁহার ডায়েরিতে লিখিয়াছেন—

"Saw Hem Babu but I could not speak out as he seemed to be in a distressed condition. He has lost his left eye."

২২শে জুন তারিখে পুনশ্চ লিখিয়াছেন—

"Jogendra spoke of Hem's unfortunate condition and he, Sir Romesh, Nilmoni and Hem had consultation together. I walked over to Hem's but he did not tell me anything about his misfortunes."

১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে পুনরায় লিখিয়াছেন—

"Went and saw Hem Babu who has become practically blind. I was grieved to hear him give utterance to despair."

চিকিৎসকগণ চক্ষুতে অস্ত্রপ্রয়োগের পরামর্শ দিলেন। ১৮ই নবেম্বর (১৮৯৭) হইতে হেমচন্দ্র ছুটি লইলেন। হেমচন্দ্রের বাটীর নিকটে তাঁহার ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র একখানি বাটী নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। এই

নবনির্ম্মিত বাটীতে হেমচন্দ্রের বামচক্ষুতে ডাঃ সণ্ডার্স ডাঃ কালীচরণ বাগচীর সাহায্য লইয়া অস্ত্র করেন। পূর্ণচন্দ্রও কাশী হইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু অস্ত্র করিয়া কোথায় চক্ষুটি ভাল হইবে, না উহা জন্মের মত নষ্ট হইয়া গেল। এই প্রসঙ্গে উমাকালী বাবুর ডায়েরি হইতে কিয়দংশ অনূদিত করিতেছি। •

২২শে নবেম্বর ১৮৯৭। আজ হেম বাবুর চক্ষুতে অস্ত্র করা হইল। আমি তাঁহার নিকটে গিয়া সাক্ষাৎ করিলাম এবং সন্ধ্যার সময় পূর্ণর সঙ্গে দেখা করিলাম। ডাঃ সণ্ডার্স অস্ত্র করিলেন।

২৮শে নবেম্বর। ডাঃ সত্যচরণ বলিলেন, বোধ হয় হেমবাবুর দৃষ্টিশক্তি আর ফিরিয়া আসিবে না। এই সংবাদে আমি মর্ম্মাহত হইলাম। আমার ভয় হেম বাবু আর বেশীদিন বাঁচিবেন না।

১লা ডিসেম্বর। পূর্ণ যোগেশকে লিখিয়াছেন হেমবাবুর চক্ষু একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অস্ত্র প্রয়োগ অসাবধানতার সহিত ও অসম্পূর্ণভাবে সাধিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হেমচন্দ্র কখনও অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করেন নাই। তিনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন।

কাব্যবিশারদ কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছেন, "হেমচন্দ্রের মত উদার চরিত ব্যক্তি জগতে দুর্লভ। তাঁহার সুসময়ে তিনি ভৃত্যদিগের প্রতিও স্বজনের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। আপনি যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য যে পরিমাণে খাইতেন, তাঁহার ভৃত্যরাও তাহাই সেই পরিমাণে খাইতে পাইত। পত্নীর উন্মাদ রোগের জন্য এবং কোন আত্মীয়ের একটী মোকদ্দমায় প্রাণ মান রক্ষার জন্য তাঁহার যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। এরূপ অবস্থায় সহসা রোগ সঞ্চারে উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হইলে যেরূপ অর্থাভাব ঘটে, দৈব দুর্ব্বিপাকে বঙ্গীয় কবিকুল শিরোমণিরও সেই দুর্দ্দশা ঘটিল।" খিদিরপুরের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নগদ টাকা স্থানীয় (আঢ্য দিগের) রোকড়ের দোকানে খাটাইতেন। হেমচন্দ্রও কয়েক হাজার টাকা এইরূপে খাটাইতেন। এই দোকান উঠিয়া যাওয়াতেও হেমচন্দ্রের বিস্তর আর্থিক ক্ষতি হইয়াছিল।

অন্ধ হওয়ায় হেমচন্দ্রকে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। হেমচন্দ্র অকস্মাৎ দারিদ্র্যকষ্ট অনুভব করিলেন। তাঁহার নিজের জন্য বিশেষ ভাবনা ছিল না, কিন্তু তাঁহার "স্বজন আশ্রিতগণ"—

তাহাদের কি হইবে? তাহারা যে তাঁহার প্রাণ, তাহাদিগকে ছাড়িয়া তিনি কি করিয়া থাকিবেন? এই চিন্তায় তাঁহার অন্ধ নয়ন হইতে অনর্গল অশ্রুধারা বিগলিত হইত। হরিপ্রসাদ চন্দ্র নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁহার কর্ম্মচারী ছিলেন। একদিন তিনি কবিবরের নিকটে বিষণ্ণভাবে গমন করিলে হেমচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, "হরি বাবু, আমি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম বলিয়া তুমি কিছু চিন্তিত হইও না, তুমি যেমন বেতন পাইতে সেইরূপ পাইতে থাকিবে। কায থাক বা না থাক তোমার বেতন আমি যতদিন জীবিত থাকিব বন্ধ করিব না। তুমি প্রত্যহ এখানে আসিবে ও যাহা কিছু আবশ্যক হয় করিবে।" এই কথা শুনিয়া প্রভুভক্ত হরিপ্রসাদ অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলেন, "মহাশয়, আমি আদৌ চিন্তিত নহি, কেবল আপনার অবস্থা দেখিয়া ও সাংসারিক অসচ্ছলতা হইবে ভাবিয়া ক্লেশ পাইতেছি। আমি যেমন আপনার কার্য্য করিতেছিলাম ঠিক সেই রূপই করিতে থাকিব। কিন্তু আমি আপনার নিকট আর এক পয়সাও বেতন স্বরূপ লইব না।"

যাহা হউক বৈষয়িক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ কবিবরের

সংসারযাত্রা যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হয় তজ্জন্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ চেষ্টিত হইলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি উমাকালী ডায়েরিতে লিখিয়াছেন, "সন্ধ্যার সময় পূর্ণ আসিলেন। তাহার সহিত হেমবাবুর বিষয়ে কথা হইল। কথাবার্ত্তার ভাবে বুঝিলাম পূর্ণ যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন হেমবাবুর ভার তিনি গ্রহণ করিবেন।" ২৯শে জানুয়ারী লিখিয়াছেন, "সন্ধ্যার সময় যোগেন্দ্রের সহিত দেখা করিলাম, তাঁহার মুখে শুনিলাম স্যর রমেশ বৎসরে ৩০০৲ এবং যোগেন্দ্র বৎসরে ১০০৲ হেমবাবুকে দিতে ইচ্ছা করেন। আমা-কেও কিছু দিতে হইবে।"

৩০শে জানুয়ারী (১৮৯৮) উমাকালী তাঁহার ডায়েরিতে লিখিয়াছেন—"যোগেন্দ্র আসিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম আগামী শনিবার হেমবাবু স্যর রমেশের সহিত কাশীধামে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কাশীযাত্রার সমস্ত উদ্যোগ করিতে তিনি ব্যস্ত।"

২৮শে ফেব্রুয়ারী উমাকালী ডায়েরিতে লিখি-য়াছেন, "আজ আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। আজ হেমবাবুর ব্রুহামখানি ৩৫০৲ টাকায় কিনিলাম।"

এই স্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে হেমচন্দ্র অবসর গ্রহণ করিয়া অবধি তাঁহার মক্কেলগণকে বন্ধু উমাকালীর নিকট প্রেরণ করিতেন এবং এই সময় হইতে উমাকালীর প্রসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ হেম কাশীধামে যাত্রা করেন। উক্ত দিবস উমাকালী ডায়েরিতে এই কয়টি কথা মাত্র লিখিয়াছেন—

"Hem Babu left for Benares today: The parting was sad."

কাশীতে ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের বাটীতে ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র-গণের যত্নে হেমচন্দ্র অনেকটা শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। কয়েক মাস সেখানে থাকিয়া ২৫শে জুন তারিখে তিনি অল্প দিনের জন্য কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ২৬শে জুন তারিখের ডায়েরিতে উমাকালী লিখিয়াছেন, "প্রাতে হেমবাবুকে দেখিতে গেলাম। তাঁহার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিলাভ করিয়াছে। আফিংএর মাত্রা অনেক কমাইয়াছেন।"

১০ই জুলাই তারিখের ডায়েরি পাঠে প্রতীত হয়, হাইকোর্টে ছুটির দরখাস্ত যাহাতে মঞ্জুর হয়, শুধু

রমেশচন্দ্র ও সার চন্দ্রমাধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, হেমচন্দ্র সেই চেষ্টা করিতেছেন।

১৯শে জুলাই হেমচন্দ্র পুনরায় কাশীযাত্রা করেন। ঐ দিবস উমাকালী ডায়েরীতে লিখিয়াছেন—

"Saw Hem Babu off to Benares at Hówrah Stn. It broke my heart to see his mad wife at his place."

স্কুলপাঠ্য কবিতাবলী।—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশকগণের আগ্রহে হেমচন্দ্রের কবিতাবলীর একটি "স্কুলপাঠ্য" সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৯৭ সালে রায় যন্ত্রে মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত স্কুলপাঠ্য কবিতাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ আমরা দেখিয়াছি। আর্থিক অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূরীকরণার্থ হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র অতুলচন্দ্র ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কবিতাবলীর আর একটি বিদ্যালয়পাঠ্য সংস্করণ প্রকাশিত করেন। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নিকট শুনিয়াছি যে এই সংস্করণে প্রকাশিত কবিতাগুলি নির্ব্বাচিত করিতে তিনি অতুলচন্দ্রকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং উহা বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকা-

বঙ্গীয় শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সংস্করণে নিম্নলিখিত কবিতাগুলি মুদ্রিত হয়:—

১। যমুনাতটে ২। পদ্মের মৃণাল ৩। জীবনসঙ্গীত ৪। লজ্জাবতী লতা। ৫। জীবন মরীচিকা ৬। অশোকতরু, ৭। চাতকপক্ষীর প্রতি ৮। পরশমণি ৯। গঙ্গার উৎপত্তি। ১০। চিন্তাকুল যুবা ১১। শচীবিলাপ ১২। কাশীদৃশ্য ১৩। বৃত্রাসুর বধ। ১৪। শিশুর হাসি ১৫। অশোককানন ১৬। স্বর্গারোহণ। ১৭। দধীচির অস্থি দান ১৮। সতীশূন্য কৈলাস।

গীতিকবিতার ক্ষেত্র হইতে হেমচন্দ্র বহুদিন অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে অনেক নূতন কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতাগুলি এই সময়ে অপূর্ব্ব জনাদর লাভ করিতে-ছিল। নবীনচন্দ্রের লেখনীও বিরত ছিল না। তথাপি হেমচন্দ্রের লেখনী-নিঃসৃত নূতন কবিতা পাঠ করিবার জন্য বঙ্গীয় পাঠক-সমাজ সমুৎসুক ছিল। কারণ হেমচন্দ্রের গীতি-কবিতায় যে উদ্দীপনা, যে গাম্ভীর্য্য এবং যে আন্তরিকতা আছে তাহা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। সুকবি শ্রীযুক্ত রসময় লাহা মহাশয় নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় হেমচন্দ্রকে অনুযোগ করিয়া যাহা
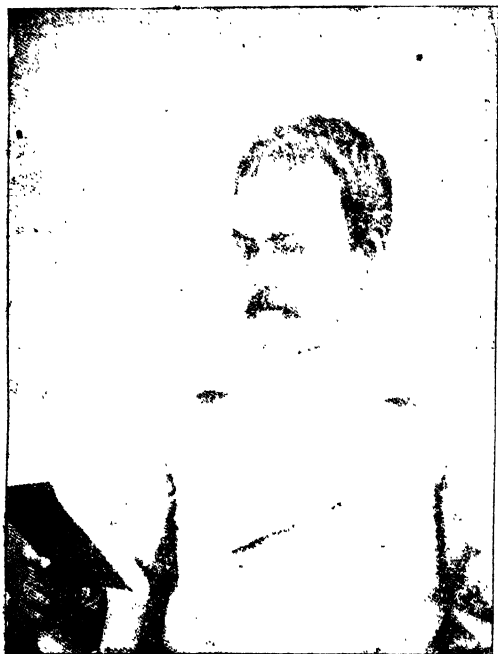
শ্রীযুক্ত রসময় লাহা

লিখিয়াছিলেন তাহা অসংখ্য বাঙ্গালী পাঠকের বাসনার প্রতিধ্বনি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে :—

কোথা সেই উদ্দীপনা দুন্দুভি নিনাদ
যে রবে জাগিয়া উঠে অসাড় পরাণ ?
একাধারে তেজস্বিতা তীব্র অবসাদ
বিজড়িত সে অনন্ত স্বদেশের গান ?
নীরব গম্ভীর কণ্ঠ—একি পরমাদ ?
শুনিতে পাব না আর ভারত সম্মান ?
জাগায়ে অতীত চিত্র পূর্ণ আশীর্ব্বাদ
দেখায়ে বীরেশ লীলা আদর্শ মহান
গাহিবেনা মধুময় ভারতের কথা
প্রবাহি বাসনা স্রোত শিরায় শিরায় ?
জাগাবেনা মর্ম্মে মর্ম্মে ভারতের ব্যথা
সঞ্চারি নবীন প্রাণ নির্জীব হিয়ায় ?
অধীন বঙ্গের কবি বলি কি নীরব
সে উদ্দাম কাব্যকণ্ঠ সে দুন্দুভি রব ?

কাশীধামে ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের যত্নে ও সেবায় হেমচন্দ্র কিছু সুস্থ হইলে, অবসর যাপনের জন্য পুনরায় সরস্বতী সেবায় মনোনিবেশ করেন। স্বহস্তে লিখিবার ক্ষমতা ছিল না। ভ্রাতুষ্পুত্র অনিলচন্দ্রকে কিংবা

অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্য কাহাকেও বলিয়া যাইতেন, তাঁহারা লিখিয়া লইতেন। ইহার ফলে ১৩০৫ সালে ৯ই পৌষ (ইং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ ২২শে ডিসেম্বর) তাঁহার শেষ কাব্যগ্রন্থ 'চিত্তবিকাশ' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র। উহাতে নিম্নলিখিত ২১টি খণ্ড কবিতা আছে:—

১। হের ঐ তরুটির কি দশা এখন ২। বিভু কি দশা হবে আমার ৩। কি হবে কাঁদিয়া ৪। জয় জগদীশ জয় বলরে বদন ৫। কৌমুদী ৬। স্মৃতিসুখ ৭। খদ্যোত ৮। আলোক ৯। ফুল ১০। সরিৎসমর ১১। কল্পনা ১২। প্রজাপতি ১৩। জন্মভূমি ১৪। কি সুখের দিন ১৫। ধনবান্ ১৬। ভালবাসা ১৭। অতৃপ্তি ১৮। মৃত্যু ১৯। শিশু বিয়োগ ২০। ব্রজ-বালক ২১। কবিতাসুন্দরী।

পূর্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র অনিলচন্দ্রের দশাশ্বমেধ ঘাটে অমর যন্ত্র নামক একটি মুদ্রাযন্ত্র ছিল। উক্ত যন্ত্রালয় হইতেই অনিলচন্দ্র কর্তৃক চিত্তবিকাশ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

'চিত্তবিকাশ' হেমচন্দ্রের অন্যান্য গীতিকাব্যের সহিত তুলিত হইতে পারে না। হেমচন্দ্র প্রধানতঃ আশার কবি, উৎসাহের কবি,—ওজস্বিতা তাঁহার

কাব্যের প্রধান গুণ। আলোচ্য গ্রন্থ নৈরাশ্যের মধ্যে লিখিত,—সুতরাং উহাতে ওজস্বিতা অপেক্ষা করুণ রসের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। হেমচন্দ্র বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, "শরীর সুস্থ এবং মনের সুখ না থাকিলে কোন চিন্তার কার্য্য হয় না, বিশেষতঃ গ্রন্থ প্রণয়ন অথবা কবিতা রচনা করিতে হইলে ঐ দুইটি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ঐ দুইটিরই অভাব হইয়াছে, অথচ চিন্তায় কালাতিপাত না করিয়া আত্ম-কল্পনা ও প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনে মনে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা কবিতাকারে নিবদ্ধ করিলাম। উপরি লিখিত অবস্থাক্রমে ইহা যে সকল সহৃদয় মহাত্মাগণের চিত্তবিনোদক হইবে ইহার আশা নাই। তবে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের কিছু উপকারে আসিতে পারে এই ভাবিয়া ইহা মুদ্রিত করিলাম।"

গ্রন্থের ললাটদেশে হেমচন্দ্র ইংরাজ কবি কাউ-পারের নিম্নলিখিত বচনটি মুদ্রিত করিয়াছিলেন—

"Renounce all strength but strength divine
And peace shall be for ever thine."

ইহাতে গ্রন্থপ্রকাশ কালে কবির মনের ভাব স্পষ্ট

বুঝা যায়। হেমচন্দ্রের বন্ধু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, 'চিত্তবিকাশ' উপহার পাইয়া ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারী তারিখে হেমচন্দ্রকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে অধিকতর উপযুক্ত সংস্কৃত বচন থাকা সত্ত্বেও উপরিলিখিত ইংরাজী বচন উদ্ধৃত করা তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত হইয়াছে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"চিত্তবিকাশ পাইয়াছি। এখনও পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। কাউপারের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছ তাহা দেখিয়াই মনে মনে তোলাপাড়া করিতেছি। কিন্তু খ্রীষ্টানী strength divine কিসে মনে ধরিল তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমি নিম্নে তিনটি বচন দিলাম। প্রথম দুটি হিন্দুমাত্রেরই প্রাতঃস্মরণীয়। শেষোক্তটি যে দিকে ইচ্ছা ঘুরাইতে পার।

(১) অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্॥

(২) জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি॥

(৩) কল্যাণী বত গাথেয়ং লৌকিকী প্রতিভাসতে।
এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি॥

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'চিত্তবিকাশ' হেমচন্দ্রের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের ন্যায় উদ্দীপনাপূর্ণ নহে—উহা দুঃখ ও নৈরাশ্যের মধ্যে লিখিত এবং সেই জন্য উহাতে বিষাদের ছায়াব্যাপ্তি লক্ষিত হয়। সুকবি রসময় লাহা মহাশয় 'চিত্তবিকাশ' পাঠে যথার্থই লিখিয়াছেন—

যাঁহার স্বদেশ গাথা নব উদ্দীপনে
বঙ্গহৃদে তড়িৎ করিত সঞ্চারণ,
আজি সেই কণ্ঠ হতে মর্ম্ম বিদারণে
উঠেছে বিষাদ গীতি নিরাশা ভীষণ।
অজ্ঞাতে নিষাদ যদি পশিয়া কাননে
কলকণ্ঠ বিহঙ্গমে করে নিপীড়ন
তা' হ'লে বিহঙ্গবর সকরুণ স্বরে
প্লাবিয়া কানন করে দিগন্ত মগন
তেমতি হে কবিবর, সাহিত্য গগনে
ভাসিছে মধুর তব বিধুর ক্রন্দন
হারায়ে নয়ন জ্যোতিঃ দৈব নির্য্যাতনে
কবিতা চরণে পুনঃ লইলে শরণ
কহিতে হৃদয় ফাটে এ 'চিত্ত বিকাশ।'
তীব্র মর্ম্ম যাতনার জলন্ত উচ্ছ্বাস।

এই কাব্যগ্রন্থে বাঙ্গালার চিরসম্মানিত ও চিরপ্রিয়

কবি হেমচন্দ্রের শেষ জীবনের দুঃখের গভীর ছায়া পতিত হওয়ায় উহা বাঙ্গলার পাঠক সমাজের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। নানা সাময়িক পত্রে উহা বিস্তৃতভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। দুইটি সমালোচনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি ১৩০৫ সালের ফাল্গুন মাসের "প্রদীপে" এবং অপরটি ১৩০৬ সালের শ্রাবণের "সাহিত্যে" প্রকাশিত হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয়গণের এই প্রবন্ধদ্বয় অবলম্বন করিয়া আমরা 'চিত্তবিকাশের' পরিচয় দিব।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "কবির শরীর:অসুস্থ ও মনে সুখ নাই বলিয়াই বোধ হয় 'চিত্তবিকাশে'র অধিকাংশ কবিতায় বিষাদের ছায়া ব্যাপ্তি লক্ষিত হয়। ইহার মধ্যে কয়েকটি কবিতা ব্যক্তিগত। যে ভাবে গীতি কবিতা ব্যক্তিগত সেভাবে নহে।—সেই সকল কবিতায় কবির বর্ত্তমান অবস্থা ও মনোভাব বুঝা যায়। যাঁহার প্রতিভালোকে বঙ্গসাহিত্য সমুজ্জ্বল, তিনি আজ জগতের আলোক হইতে বঞ্চিত।" "হের ঐ তরুটির কি দশা এখন" শীর্ষক প্রথম কবিতায় "ঝটিকাঝাপটে ভূমিবিলুণ্ঠিত তরু"র সহিত আপনার

তুলনা করিয়া কবি নিম্নলিখিতপ্রকার আক্ষেপ করিয়াছেন—

দেখিয়া তরুরে তোরে প্রাণ কাঁদে মম,
আছিল আমার (৩) আগে সবই তোর সম।
শাখা পাখী ফল পুষ্প সুবেশ সুঘ্রাণ,
করেছি কতই লয়ে সুচ্ছায়া প্রদান।
দেখিয়া আমার গায় লভিয়া আশ্রয়,
কতই লতিকা লতা ছিল সে সময়।
নিজ পর ভাবি নাই, অবস্থ উপায়
যে এসেছে আশা করে দিয়াছি তাহায়,
এখন আপনি হেসে পড়েছি ধরায়।
স্বজন আশ্রিতজন কাঁদিয়া বেড়ায়।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "ইহা বড় বেদনার কথা, বড় মর্ম্মভেদী হাহাকার। কিন্তু এই বেদনার কবিকে বলিতে পারি, তাঁহার বীণা "গভীর নিনাদে করিবে ঝঙ্কার"। যাহাদিগের সুখে আনন্দধ্বনি করিয়াছেন, যাহাদিগের দুঃখে মর্ম্মভেদী বিষাদের সুর তুলিয়াছেন, তিনি যাহাদিগের জন্য "স্বর্গ মর্ত্ত্য ধরাতলে" স্থায়ী চিত্র অংকিত করিয়াছেন, সেই বঙ্গবাসীরা কখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না।"

প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন—"চিত্তবিকাশে"র দ্বিতীয় কবিতা 'বিভু কি দশা হবে আমার?' পড়িলে প্রাণ ফাটিয়া যায়।" যে কবি একদিন "বিধাতানির্ম্মিত চারু মানব নয়ন"কে পরশমণির সহিত তুলনা করিয়াছিলেন তিনি এখন দৃষ্টিহারা হইয়া লিখিয়াছেন—

বিভু কি দশা হবে আমার?

একটি কুঠারাঘাত শিরে হানি অকস্মাৎ,
ঘুচাইলে ভবের স্বপন,
সব আশা চূর্ণ করে রাখিলে অবনী' পরে
চিরদিন করিতে ক্রন্দন।
আমার সম্বল মাত্র ছিল হস্তপদ নেত্র
অন্য ধন ছিল না এ ভবে,
সে নেত্র করে হরণ, হরিলে সর্ব্বস্ব ধন,
ভাসাইয়া দিলে ভবার্ণবে।

* * *

সব ঘুচাইলে বিধি হরে নিয়া চক্ষু নিধি,
মানবের অধম করিলে।
বল বিত্ত সব হীন, পর-প্রত্যাশী দীন
করে ভবে বাঁধিয়া রাখিলে।
জীবের বাসনা যত সকলই করিলে হত
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী,

না পাব দেখিতে আর ভবের শোভাভাণ্ডার
চির অস্তমিত দিনমণি।

প্রতিদিন অংশুমালী, সহস্র কিরণ ঢালি,
পুলকিত করিবে সকলে,
আমারি রজনী শেষ, হবে না কি? হে ভবেশ
জানিব না দিবা কারে বলে?
আর না সুধার সিন্ধু আকাশে দেখিব ইন্দু,
প্রভাতে শিশির বিন্দু জলে।
শিশির বসন্ত কাল, আসে যাবে চিরকাল,
আমি না দেখিব কোন কালে।

নিজ পুত্র কন্যা মুখ পৃথিবীর সার সুখ
তাও আর দেখিতে পাব না।
অপূর্ব্ব ভবের চিত্র থাকিবে স্মরণে মাত্র
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা।

কবিতাটির উপসংহারে হেমচন্দ্র বিভুপদে প্রার্থনা করিয়াছেন—

জীবনের শেষ কালে সকলি হরিয়া নিলে
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার।

প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন, "ইহা পাঠ করিয়া কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম। আর যে হয় বলুক, হেম

বাবুর মুখে ত এ কথা শোভা পায় না। তিনি যে আশার কবি, উৎসাহের কবি, 'বিশ্ব পূরে যায় শুনে আশা গান' তাঁহার মুখে এ কথা কেন?" বড় কষ্টেই হেমচন্দ্রের মুখ হইতে শেষোক্ত প্রকারের আক্ষেপোক্তি নির্গত হইয়াছিল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "এ মর্ম্ম-ব্যথার কাহিনী বড় করুণ। তবে একথা বলিতে পারি যে, কবির যে প্রতিভালোকে বঙ্গসাহিত্য সমুজ্জ্বল, অর্থের বা দৃষ্টির অভাবে তাহার দীপ্তি নির্ব্বাপিত হইবার নহে; তাঁহার যে কল্পনা ইচ্ছায় স্বর্গ বা নরকের চিত্র অঙ্কিত করিয়া পাঠকের নয়ন সমক্ষে আনিয়াছে, নয়নের দৃষ্টির অভাবে তাহার গতিরোধ হয় না। তিনি আপনিও বলিয়াছেন, কল্পনার প্রসাদ পাইলে 'কি দুঃখ এ জগতের ভুলিতে না পারি?' কিন্তু এ কথা লইয়া অধিক কিছু বলিতে যাওয়া দুঃসাহসের কার্য্য—দৃষ্টির অভাব প্রথমে কবির নিকট বড়ই দুর্ব্বিষহ বলিয়া বোধ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন 'বৃত্রসংহারে' কন্দর্পের মুখ দিয়া তিনি বলাইয়াছেন,—

সুখ দুঃখ ইন্দ্রিয়প্রিয়া, সকলি বাসনা নিয়া
মুকতির আয়ত্ত সে নয়।"

ইহার পরবর্ত্তী কবিতাটিতেই কবি এই মানসিক

ব্যাধির ঔষধ পাইয়াছেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "ইহার পর কবি ভক্ত দার্শনিকোচিত বিচারের ফলে যেখানে উপনীত হইয়াছেন, সেখানে ভক্তির উচ্ছ্বসিত স্রোতে বিষাদ ও বেদনা, সংশয় ও শঙ্কা ভাসিয়া যায়; শঙ্কা শান্তিতে পরিণত হয়। তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন—

কোথা আজি সেই অযোধ্যাধাম,
কোথা পূর্ণ ব্রহ্ম সীতাপতি রাম.
কোথা আজি সেই পাণ্ডবের সখা,
কোথায় মথুরা, কোথায় দ্বারকা।

কে পারে খণ্ডিতে অদৃষ্ট শৃঙ্খলে,
ঘটেছে আমার যা ছিল কপালে।
কে পারে রাখিতে বিধাতা কাঁদালে,
বৃথা কেন তবে কাঁদিয়া মরি।

এস ভগবান, কর ধৈর্য্য দান,
কর শান্তিময় অশান্ত পরাণ।
সৌভাগ্য অভাগ্য ভাবিয়া সমান
নিজ কর্ম্ম যেন সাধিতে পারি

আপনারই দোষে আপনি হারাই

বিধাতারে কেন সে দোষে জড়াই।
এ সান্ত্বনা কেন পরাণে না পাই
নিজ কর্ম্মফল অদৃষ্ট কেবল।"

প্রভাতকুমার বলেন, ইহার পরবর্ত্তী কবিতায় কবির মানসিক ব্যাধির আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। "কবি কল্পনার দৃষ্টিতে পৃথিবীকে সুন্দরী দেখিতেছেন।

জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।
বিভুগানে মাতোয়ারা   জগৎ আনন্দে ভরা,
সাজিয়াছে বসুন্ধরা পরিয়া ভূষণ,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।

এই কবিতাটির একস্থানে হেম বাবু গীতোক্ত ভগবানের বিশ্বরূপ বর্ণনার সুন্দর অনুকরণ করিয়াছেন। ইহার পরই তিনি ভগবানের ভুবনমোহনরূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

ভুবনমোহন রূপ নেহারি আবার
মহানন্দে বসুন্ধরা করয়ে বিহার।
যখন বসন্তকালে   নাচিয়া তরঙ্গ চলে.
ধীর সমীরণে খেলে তটিনীর পুলিনে,
নিদাঘে জোছনা নিশি   হাসিয়া অমিয় হাসি,
যখন উদয় হয় তারাহার গগনে

পুনঃ যবে বরষায় বেগে স্রোতধারা ধায়,
হুহুস্বনী বনস্থলী শিখী নাচে বিপিনে,
যখন সুধার আশে শরৎচন্দ্রমা পাশে
চকোর চকোরী ভাসে দূর শূন্য গগনে,
দেখি বসুমতী হাসে আনন্দিত মনে
জয় জগদীশ জয় বলয়ে বদনে।"

দেবেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "জগৎ শোভার ভাণ্ডার। সংসার সংঘাতে, জীবন সংগ্রামের তাড়নায় ও যাতনায়, নানা প্রবল প্রবৃত্তির উন্মাদকারী উত্তেজনায় আমরা সে সকল লক্ষ্য করিবার অবকাশ পাই না। কবির প্রতিভা সে সকলকে পরিস্ফুট করিয়া তুলে। সৃষ্টির প্রভাতে যেদিন আদিম মানব নগ্ন সরলতায় বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে জগতের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিল, সেদিন স্নেহময়ী প্রকৃতি তাহার নয়নসমক্ষে কি সৌন্দর্য্যরাশি মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, অন্ধ কবি মিলটন তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। আজ দৃষ্টি হারাইয়া কবির নিকট সেই সকল সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ সুন্দর বোধ হইতেছে; সেই ভাব তাঁহার "কৌমুদী", "খদ্যোত", "আলোক", "প্রজাপতি" প্রভৃতি কবিতায় প্রকাশিত। প্রজাপতির শোভায় মুগ্ধ কবি বিহ্বল হৃদয়ে বলিয়াছেন,—

কিছুই না পাই ভেবে আদি অন্ত সীমা,
সকলই আশ্চর্য্য তব,
অদ্ভুত তোমার ভব,
কে জানে, মহিমাময়, তোমার মহিমা।"

"আলোক" শীর্ষক কবিতা সম্বন্ধে প্রভাতকুমার বলেন, "আলোক কবিতাটি দেখিবার জিনিষ। কবির চক্ষে এখন 'চির অস্তমিত দিনমণি'—এ অবস্থায় তিনি আলোক সম্বন্ধে কি লেখেন জানিতে সকলেরই কৌতূহল হইতে পারে! বিরহেই ত ভালবাসার বিকাশ বল, পরিপাক বল, যাহা কিছু সবই। প্রথম যখন বিশ্বলোকে আলোকের আবির্ভাব হইল, তখন কিরূপ হইল, হেমবাবু তাহারই বর্ণনা করিতেছেন। এস্থলে তিনি যাহা কল্পনা করিয়াছেন ইংরাজী কিংবা সংস্কৃত কোনও সৃষ্টি-কল্পনার সঙ্গে তাহা মিলে না। বাইবেলে লেখা আছে ঈশ্বর আলোক সৃষ্টি করার পর জীব সৃষ্টি করিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের সৃষ্টি কল্পনা অত্যন্ত জটিল। বঙ্গ কবি কল্পনা করিতেছেন, সৃষ্টির আর যাহা কিছু সমস্ত শেষ হইলে, পরে আলোকের সৃজন। কল্পনাটি সুন্দর হইয়াছে। জীবগণ জন্মাবধি কেহ পরস্পরকে দেখে নাই, প্রকৃতিকেও দেখে নাই,

শব্দে শুনিয়াছে, স্পর্শে অনুভব করিয়াছে মাত্র। তাহাদের যে দৃষ্টিশক্তি বলিয়া একটা শক্তি আছে, তাহাও তাহারা জানিত না। এমন অবস্থায় শুভক্ষণে বিশ্বপতি অন্ধকারের যবনিকা সহসা উত্তোলিত করিলেন। কি বিস্ময়, কি সুখ, কি আনন্দের তরঙ্গ জীব জগৎকে আকুল করিয়া দিল!

জগৎ হইল আলোকময়
ঘুচিল আঁধার জড়তা ভয়।
বিধাতার এই অতুল ভুবন,
হইল তখন নন্দন কানন।
তরুলতা তৃণ মৃৎ ধাতু জল,
নিজ নিজ রঙে সাজিল সকল।
পতঙ্গ বিহঙ্গ কুরঙ্গ কুঞ্জর,
কিরণ মাখিয়া অতি মনোহর।
রঞ্জিল গগন বিবিধ বরণে,
নানা বনফুল ফুটিল কাননে।
আলোকে প্রকাশ হইল তখন,
সুন্দর স্বর্গীয় মানব বদন,
হেরি সে বদন পশু পক্ষী যত,
নিজ নিজ শির করিল নত।"

'চিত্তবিকাশে'র অন্তর্গত 'জন্মভূমি' ও 'কি সুখের

দিন' শীর্ষক কবিতাদ্বয় কবির আত্মকথায় পরিপূর্ণ। কবির বাল্যজীবনের পরিচয় প্রদানকালে আমরা শেষোক্ত কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। "জন্মভূমি" শীর্ষক কবিতাটির কোন কোনও অংশে হেমচন্দ্রের পূর্ব্ব-রচিত কবিতার গাম্ভীর্য্য ও উদ্দীপনা লক্ষিত হয়। হেমেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "যাঁহারা মনে করিবেন যে এ পুস্তকে হেমচন্দ্রের পূর্ব্বের কবিতার গম্ভীর ও উত্তেজক ভেরী নিনাদ নাই, তাঁহারা ভ্রান্ত। বর্ত্তমান পুস্তকের অধিকাংশ কবিতায় সে জ্বালাময় অগ্নিশ্বাসী ভাব না থাকিলেও, সেই ভেরী নিনাদের প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হইয়াছে,—সে ধ্বনি বড় মধুর—বড় চিত্ত-বিমোহক। "বৃত্রসংহারে" হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

> কে আছে ত্রিলোক মাঝে প্রাণী হেন জন
> সুদূর প্রবাস ছাড়ি বহুদিন পরে
> আসি ফিরি নিজ দেশে—কিবা মরু আর
> গিরিকূট, অরণ্যানী—নিরখি পূর্ব্বের
> পরিচিত গৃহ, মাঠ, তরু, সরোবর,
> নদী, খাত, তরঙ্গ, নির্ঝর, প্রাণিকুল
> নাহি ভাসে উল্লাসে, না বলে মনোসুখে
> 'এই জন্মভূমি মম।'

'চিত্তবিকাশে' তিনি লিখিয়াছেন,—

হেমচন্দ্র

জগতে জননী জনম-ভুবন
গুরুত্ব গৌরবে দুই অতুলন
স্বরগ(ও) নিকৃষ্ট দুয়েরই কাছে।

* * *

কে আছে এমন মানব সমাজে,
হৃদি-তন্ত্রী যার আনন্দে না বাজে,
বহুদিন পরে হেরি স্বদেশ।
না বলে উল্লাসে প্রফুল্ল অন্তরে
প্রেম-ভক্তি-মোহ-অনুরাগ-ভরে
এই জন্মভূমি—আমার দেশ। *
তুমি বঙ্গমাতা এত হীনপ্রাণা,
এত যে মলিনা এত দীন হীনা,
তোমারও সন্তান স্বদেশে ফিরে
হেরে তব মুখ মনে ভাবে সুখ

* এই কয়টি পংক্তি স্যর ওয়াল্‌টর স্কটের নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি স্মরণ করাইয়া দেয় —

Breathes there a man with soul so dead,
Who never to himself hath said,
This is my own—my native land ?
Whose heart hath ne'er within him burned,
As home his foot steps he hath turned,
From wandering on a foreign strand ?

প্রাণের আবেগে হইয়া সোৎসুক
নিজ জন্মদেশ আনন্দে হেরে।
হে জগৎপতি, এ দাস মিনতি,
রেখো এই দয়া বঙ্গমাতা প্রতি,
বঙ্গবাসী যেন কখন(ও) কেহ
যেখানেই থাক্, যেখানেই যাক,
যতই সম্মান যেখানেই পাক,
না ভুলে স্বদেশ ভকতি স্নেহ।

বঙ্গভূমির প্রতি এমন ভক্তিভরা স্নেহের কথা কবিতায় বহুদিন পাঠ করি নাই।"

বৃত্রসংহারে হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

জগত কল্যাণ হেতু নরের সৃজন
নরের কল্যাণ নিত্য পরের পালনে।

"চিত্তবিকাশে" "ধনবান" শীর্ষক কবিতায় হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

সাধিতে জগৎ হিত ধনীর সৃজন
বিধাতা তাদের হস্তে দিয়াছেন ধন
জগতের সুমঙ্গল করিয়া মনন
এ কথা যে বুঝে মর্ত্ত্যে দেবতা সে জন।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ বলেন, "ইহা পাঠ করিলে কবি সাশ্রুনয়নে আপনার কথায় যাহা বলিয়াছেন তাহাই মনে পড়ে—

নিজপর ভাবি নাই অনন্ত উপায়—
যে এসেছে আশা করে দিয়েছি তাহায়।"

"ভালবাসা" শীর্ষক কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রপ্রসাদ উহাতে প্রকটিত প্রবল "পেসিমিষ্টিক সুর" দেখিয়া "ব্যথিত ও আশঙ্কিত" হইয়াছিলেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "যিনি একদিন যে প্রেমে—

পরাণে পরাণ বাঁধা প্রণয়ের ডোরে
পরিপূর্ণ পরিতোষ প্রেমীর অন্তরে

সেই প্রেমের মধুর গীত গাহিয়াছেন, তিনিই বর্ত্তমান পুস্তকে বলিতেছেন—

এ যে ভালবাসা ভরা দেখি এ সংসার,
ভালবাসা নয় ইহা স্বার্থের বিকার,
স্নেহ দয়া মায়া আর যাহা কিছু বল
ভালবাসা কিন্তু তবু নহে এ সকল।
ভালবাসা বলি যারে পরাণে খেয়াই,
সে ভালবাসারে হায় কোথা গেলে পাই?
পরাণের বিনিময়ে পরাণ বিকাই,
এ ভালবাসা কি তবে পৃথিবীতে নাই।"

'স্মৃতিসুখ' ও 'ব্রজবালক' শীর্ষক কবিতাদ্বয়ে খাঁটি

স্বদেশী ভাব পরিলক্ষিত হয়। হেমেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "এদেশে লোক কথায় বলে 'কানুবিনা গীত নাই, এদেশে বিদ্যাপতি হইতে বহু কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা গান করিয়াছেন। সে প্রেমকাহিনী বাঙ্গালীর বড় প্রিয়; ইহাকে দুর্ব্বলতা বলিতে হয় বল। জাতীয় কবি হেমচন্দ্রের কবিতায় এই দুর্ব্বলতার চিহ্ন দেখিয়াছি; 'সুহৃৎ সমাগম' শীর্ষক কবিতায় পড়িয়াছি, 'শ্যামের বাঁশীতে যমুনা উজান,—বহিল উল্লাসে ভাসায়ে কূল।' 'চিত্তবিকাশে' একাধিক কবিতায় এই 'জাতীয় দুর্ব্বলতা' প্রকাশিত হইয়াছে—

মোহন মুরতি চিকণ কালা,
রূপের ছটায় জগ উজলা।
* * *
যাহার মধুর বাঁশীর তানে
যমুনার জল চলে উজানে।"

হেমেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "কল্পনা" শীর্ষক কবিতায় কবি কল্পনার অতি মোহন চিত্র আঁকিয়াছেন—

চাঁদের মণ্ডল হতে
উঠিছে আকাশ পথে,
অসীম মাধুরী অঙ্গে পড়িতেছে ঝরি

বিচিত্র বসন গায়,
ইন্দ্রধনু শোভা পায়
বিবিধ বরণে ফুটে কিরণে খেলায়।
যেখানে উদয় হয়—
সুগন্ধি মলয় বয়,
অঙ্গের সৌরভে দিক আমোদে পুরায়।

তাঁহার অসাধারণ প্রভাব। কবি বলিয়াছেন,—

এহেন প্রভাব যার
প্রসাদ লভিতে তার
কি দুঃখ এ জগতের ভুলিতে না পারি।
প্রতিদিন কল্পনারে
পাই যদি পূজিবারে
নিরানন্দ মাতৃভূমি চিরানন্দ করি।
এ চির মনের সাধ
মিটিল না অপরাধ
লয়োনা দুঃখিনী মাগো দৈব প্রতিকূল,
কমলা ঠেলিলা পায়,
রোষ কৈল সারদায়,
শুষ্ক আশাতরু মম বিনা ফল ফুল।

কল্পনা তাঁহাকে প্রসাদ হইতে বঞ্চিত করেন নাই,

পরন্তু যে 'অপার্থিব ধন' দিয়াছেন, 'রাজ্য বিনিময়ে আহা! কেহ নাহি পায় তাহা' কবি তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে প্রচুর আনন্দ দান করিয়াছেন। আশা করি, এখন এই কর্ম্মশ্রান্ত জীবনের নানা কার্য্য হইতে অবসর লইয়া তিনি কবিতার সেবায় তাঁহার নিরানন্দ মাতৃভূমি চিরানন্দময় করিবেন।"

'চিত্তবিকাশে'র শেষ কবিতাটির নাম "কবিতাসুন্দরী।" প্রভাতকুমার বলেন, "উহা মূর্ত্তিমতী কবিতাদেবীর বর্ণনা—

অশোকের তলে, যেন শশী জলে,
হেন রূপবতী নারী
ভাবিছে একাকী করে গণ্ড রাখি
অপূর্ব্ব শোভা প্রসারি।

"হেমবাবু কবিতাসুন্দরীকে অশোকতরুতলে কল্পনা করিয়াছেন। কাব্যসাহিত্যে অশোকতরুর একটু প্রাচীন সম্মান আছে। কবিতার মহীয়সী কন্যা সীতাদেবীকে অনেক দিন হইতে আমরা মানস চক্ষে অশোকের তলে দেখিয়া আসিতেছি। উপরে উদ্ধৃত পংক্তিগুলি পাঠ করিয়াই আমার মনে ত অবনতমুখী,

অশ্রুনয়না জনকনন্দিনীর ছবি উদিত হইয়াছিল। হেমবাবু কবিতাসুন্দরীকেও সেইখানে আনিয়া বসাইয়াছেন। মায়ে ঝিয়ে অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছে। ইহার পর কবিতাসুন্দরীর একটু বর্ণনা আছে। "সুনিবিড় কেশ" তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ঢাকিয়া "ছড়ায়ে পড়েছে এলা"। নব তৃণদলের কোমল আসনে তিনি পা দুখানি মেলিয়া দিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার চারিদিকে কত না শোভা কত না সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছে। এই বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যের শান্তরসসিক্ত তপোবন-বর্ণনাগুলি স্মরণপথে আনয়ন করে। 'আবৃত রঞ্জিত লোমে' মনোহর তনু কত বনচর নির্ভয়ে সুখে দূরে ও সন্নিধানে অবিরত ভ্রমণ করিতেছে। হরিণীসুন্দরী আপনার শিশুটি লইয়া নৃত্য করিতেছে। করিণী পদ্মের মৃণাল তুলিয়া শাবক-মুখে দিতেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। সে স্থানে চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক শোভাও অতি মনোহর—

সেথা পরকাশে— প্রমত্ত উল্লাসে
কবিপ্রিয় ঋতুচয়,
বসন্ত, বরষা, সরস সুরসা
শরৎ সৌন্দর্য্যময়।

নিকটে উদ্যান অতি রম্য স্থান,
দেবতা গন্ধর্ব্ব ভুলে,
সুগন্ধে মোদিত সদা সুশোভিত
নানাজাতি তরু ফুলে।
ফুল রেণু গায় সদা ভ্রমে তায়
মন্দ মন্দ সমীরণ।
আকাশে সৌরভ, মাটীতে সৌরভ,
সুগন্ধ বর্ষে যেমন।
গাছে মধু ক্ষরে, লতা পত্রে ঝরে,
উড়ে ভৃঙ্গ মধুকর।
সুষমা সুঘ্রাণ ভরিয়া উদ্যান
গন্ধে ভরা সরোবর।
সে দেব উদ্যানে মহিমা কে জানে,
নিত্য চন্দ্রোদয় হয়।
নিত্য ষোল কলা শশাঙ্ক উজ্জ্বলা
চির জ্যোৎস্না ফুটে রয়
ভ্রমে কত সেথা, অপ্সর বনিতা,
গীত বাদ্য নৃত্য করি।
কত নিরজনে, নির্ঝর দর্পণে,
নিজ নিজ বিম্ব হেরি।"

হেমেন্দ্রপ্রসাদ বলেন, "এই মধুর কবিতার শেষাংশ বড় করুণ, বড় বিষাদময়। ভক্তকবি

বিপদে—বিষাদে আরাধ্যা কবিতাকে বলিতে-ছেন,—

অয়ি নিরুপমে, মম হৃদিধামে,
বাসনা আছিল কত
তব আরাধনা, তোমার সাধনা,
করিব জীবন-ব্রত।
ভুলে নিজ ভ্রমে, বৃথা পরিশ্রমে,
জীবন ফুরায়ে এল।
না লভিনু ধন, না সাধিনু পণ,
দুকূল ভাসিয়া গেল।
এবে বহে সাধে, পড়িয়া বিপদে,
আবার তোমারে ডাকি,
হয়োনা নিদয়া, কর দাসে দয়া,
ভক্ত বলে মনে রাখি,
তুমি ক্ষেমঙ্করী, নিজে ক্ষমা করি,
ভুলনা মায়ের মায়া
ক্ষমি অপরাধ, পুরাইও সাধ,
দিও দেবি পদছায়া।

"মধুসূদনের জন্য বিলাপগীতিতে কবি বলিয়াছিলেন—

হায় মা ভারতী, চির দিন তোর,
কেন এ কুখ্যাতি ভবে?

যেজন সেবিবে, ও পদযুগল
সেই সে দরিদ্র হবে।

"আমরাও কবির কথায় কবিতাদেবীকে বলি,—

কেমনে কহগো দেবী অনলের তাপে
তাপিবে ও কলেবর আশৈশব নিরন্তর
স্নেহে ভিজায়েছ যায়?

"শারীরিক কষ্ট বা দারিদ্র্যপীড়ন জগতের যাতনা—প্রতিভা স্বর্গের আলোক। জগতের যাতনায় স্বর্গের আলোক হীনপ্রভ হয় না। অন্ধ কবি মিল্‌টন হৃদয়ের ভাব "কবিতা তরঙ্গে ঢালি" বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কবি বলিয়াছেন, কবিতার প্রসাদ পাইলে 'নিরানন্দ মাতৃভূমি চিরানন্দ করি'। আশা করি, কল্পনার প্রসাদে তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হইবে।"

কাব্যামোদী ব্যক্তি মাত্রেই চিত্তবিকাশ পাঠে এক দিকে যেমন হেমচন্দ্রের গীতিকবিতার ক্ষেত্রে পুনরাবির্ভাব দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনই তাঁহার শেষ জীবনের অশান্তি ও দুঃখের পরিচয় পাইয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্তবিকাশ পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

Narikeldanga
21 Jany. 1899.

My Dear Hem Babu

I beg to acknowledge with thanks the receipt of your kind present of a copy of your চিত্তবিকাশ। The poems collected in this volume are the effusions of a truly noble and poetic mind amid the trials of life. They not only delight and edify the reader as all your other writings do, but they also have a highly chastening effect on the mind. Your songs of sorrow will be a lasting lesson to your countrymen amidst prosperity and adversity.

Deeply sympathising with you in your hour of tribulation

I remain, Yours sincerely
Gooroo Dass Banerjee.

হেমচন্দ্র কবিতার ক্ষেত্র হইতে এক প্রকার অবসর

স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে অন্ধাবস্থায় তিনি যে পুনরায় 'চিত্তবিকাশে'র ন্যায় কাব্যগ্রন্থ রচনা করিবেন ইহা কেহ আশা করেন নাই। চিত্তবিকাশ প্রকাশের সহিত বঙ্গীয় পাঠক সমাজে নূতন আশার সঞ্চার হইল। প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন, "আমরা ত হেম-বাবুকে খরচের খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলাম বলিলেই হয়। কিন্তু চিত্তবিকাশ পাঠ করিয়া হেমবাবুর সম্বন্ধে আবার আমাদের হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হইল। বুঝি বা তাঁহার বীণা আবার সেকালের সুরে ঝঙ্কার দিবার আয়োজন করিতেছে।" বাহিরের আলোকের অভাব সত্ত্বেও তিনি যে অন্ধকবি মিল্‌টনের ন্যায় হৃদয়ের আলোকের সাহায্যে দেশবাসীকে নূতন অদৃষ্ট জগতের শোভা দেখাইতে পারিবেন এ আশা অনেকেই করিয়াছিলেন। সুকবি বরদাচরণ মিত্র লিখিয়াছিলেন—

বৃত্রসংহারের কবি। এ বৃদ্ধ বয়সে
আবৃত কি অন্ধকারে ও যুগ্ম নয়ন?
সে তিমির ব্যূহ ভেদি নাহি কিগো পশে
আলোকের শরজাল—শোভার শ্রাবণ
বিদারি উদার গর্ব্বে হৃদি-শতদল
কাঁপাইয়া তায় তীব্র সুখের বেদনে

বরদাচরণ মিত্র

উৎসারি শতেক রন্ধ্রে কবি-পরিমল—
রক্ত উচ্ছ্বাস শত উষ্ণ প্রস্রবণে!
কি কঠোর পরিতাপ। কিম্বা দেখ স্মরি
শ্বেতদ্বীপ-মহাকবি-জীবন কাহিনী
বাহিরের সূর্য্য যবে আলো নিল হরি,
ভাতিল সে মহানিশা চিৎ-সৌদামিনী।
নয়ন সসীম দেখে মায়িক অসার,
আলোকের পূর্ণতাই মহান্ আঁধার।

কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকগণের এ আশা সফল হয় নাই। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ যেমন নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে একবার জ্বলিয়া, উঠে, হেমচন্দ্রের প্রতিভাপ্রদীপও নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে এই একবার মাত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শেষ জীবন।

কবির দারিদ্র্য অপনোদনের চেষ্টা।

"বান্ধব" সম্পাদক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর "চিত্ত-বিকাশ" উপহার পাইয়া হেমচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন :—

'বান্ধব' কুটীর
৭ই ফাল্গুন ১৩০৫।

প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন মিদং—

আপনার 'চিত্ত বিকাশ' উপহার পাইয়া হর্ষ বিষাদে জর্জ্জরিত হইলাম। কবিকুলে হোমার আর মিল্টন অন্ধ হইয়াও পৃথিবীর অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। আজি আপনি তাঁহাদিগেরই একজন হইয়া সে অলঙ্কারকে ত্রিগুণাত্মক করিলেন। জগদ্বিধাতা জগদীশ্বরের কোন কার্য্যই অন্ধ শক্তির উদ্দাম লীলা নহে। সকল কার্য্যেরই গূঢ় উদ্দেশ্য ও রহস্য আছে। আপনকার বহিশ্চক্ষুর অন্ধতাবিধানও নিরর্থক নহে। বোধ হয়, অন্তশ্চক্ষুর পূর্ণ দৃষ্টি ও

প্রফুল্লতার সৃষ্টিই তাঁহার অভিপ্রেত হইবে। যাহা হউক আপনি সে বাহিরের চক্ষুর জন্য বিলাপ ও পরিতাপ করিবেন না। * * * 'চিত্ত বিকাশে'র প্রথম পৃষ্ঠায়,—"ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই" এই পংক্তিটীর অর্থ বুঝিতে না পারিয়া চিত্তে বড় গভীর দুঃখ বোধ করিলাম। বঙ্গাকাশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বঙ্গ-সাহিত্যের শিরোভূষণ হেমচন্দ্র একাই একটা রাজ্যের সম্পত্তি। হেমচন্দ্রের ধন নাই, বন্ধু নাই, এ কথাটা বাঙ্গালি জাতির উপর বৃহৎ একটা গালির মত বুঝায় না কি? * * *

আপনার স্নেহানুগৃহীত
শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

সাধারণ চিকিৎসালয়ে "বাণী-বরপুত্র" মধুসূদনের দুঃখময় জীবনের শোচনীয় পরিসমাপ্তির পর বঙ্গবাসী হেমচন্দ্রের এ অনুযোগ নির্ব্বিকার চিত্তে সহ্য করিতে পারে নাই। চারিদিকে কবিবরের দারিদ্র্য অপনোদনের চেষ্টা হইতে লাগিল। 'বান্ধব' সম্পাদক রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ, 'হিতবাদী' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রায় সাহেব

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত, 'অনুসন্ধান' সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রভৃতি অনেকেই কবিবরের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুপ্রসিদ্ধ রামশর্ম্মা (৺নবকৃষ্ণ ঘোষ) লিখিলেন :—

To Babu Hem Chandra Banerjee.

I keenly, deeply feel, O friend, for thee !
The light within thee gloweth as of yore,
The soul within thee floweth as before,
In lucent stream of luscious melody.
Though dim the orbs through
which thy soul may see,
Sun-light and moon-light cheering
thee no more.
Thy only light that in thy bosom's core.
Yet thou singest mindless of all agony,
But where is the guerdon of thy minstrelsy ?
Thou who hast kindled
here the patriot flame
With noble burst of song beyond all meed ?

Alas ! 'tis cold neglect and penury !
Bengala's sons ! remove this burning shame
Speed to the poet's- rescue—swiftly speed.

ভাবার্থ—

গভীর ব্যথায় মম ব্যথিত অন্তর, সখে, তোমা তরে।
এখনো অম্লান তব অন্তরের জ্যোতিঃ, আছিল যেমতি
প্রাণের নির্ঝর তব অবারিত গতি, বহিছে তেমতি—
সুমধুর সঙ্গীতের স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী মহাবেগ ভরে।
দৃষ্টিহীন বটে এবে আঁখিদ্বয় তব—আত্মাবাতায়ন ;
দিবালোক চন্দ্রালোক, আনন্দ তোমায় নাহি দিবে আর ;
একমাত্র দীপ শুধু পরাণের মাঝে জ্বলিছে তোমার,
তথাপি গাহিছ তুমি তুচ্ছ করি ব্যথা, ধৈর্য্যপরায়ণ,
কিন্তু বল শ্রোত্রহারি সঙ্গীতের তব কোথা পুরস্কার ?—
যে গানে জাগালে তুমি স্বদেশপ্রীতির পূত অগ্নিশিখা,—
যে উদাত্ত সঙ্গীতের সমুচিত পণ নাহি যায় লিখা,
অবহেলা দরিদ্রতা, বিনিময় হায়, এই কি তাহার ?
হে বঙ্গসন্তানগণ ! ঘুচাও এ মহা কলঙ্ক-কজ্জল.
সত্বর আসিয়া সবে মুছাও কবির নয়নের জল।

বাঙ্গলার প্রিয় কবি হেমচন্দ্রের সাহায্যার্থ অনেকেই অগ্রসর হইয়াছিলেন।

রামশর্ম্মা

(৺নবকৃষ্ণ ঘোষ)

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবকগণ নানাস্থানে সভা আহ্বান করিয়া হেমচন্দ্রের বিপদে সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী লাইব্রেরীর সাহিত্যানুরাগী সম্পাদক গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয় এইরূপ একটি সভা আহ্বান করিতেছেন শুনিয়া, ঢাকা হইতে রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর প্রবীণ সাহিত্যিক 'অনুসন্ধান' সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন,

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

ঢাকা, ৬ই আষাঢ় ১৩০৬।

চির প্রীতিভাজনেষু,

ভাই * ** সেইদিন তোমার একখানি স্নেহপূর্ণ পত্র পাইয়া অনুগৃহীত হইয়াছি। সম্প্রতি জানিতে পাইলাম— সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ, বৌবাজার দত্ত পরিবারের অন্যতম সুসন্তান, বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্তের উদ্‌যোগে হেমচন্দ্রের সম্মানার্থ একটি সভা আহূত হইতে যাইতেছে। তুমি তোমার কাগজে এই সভার অনুকূলতায় একটি

উদ্দীপক 'প্যারা' লিখিবে এবং আপনার সমস্ত বন্ধুবান্ধব লইয়া সভায় অনাহূত উপস্থিত হইবে। যদি বাঙ্গালাভাষাকে সত্য সত্যই মা বলিয়া জান, তাহা হইলে 'বৃত্রসংহার' রচয়িতা বঙ্গকবির এই বিপৎসময়ে উদাসীন রহিও না। আমি এখন বয়সে বৃদ্ধ, রোগে অকর্ম্মণ্য। কিন্তু ভগবান যদি আমায় শক্তিদান করিতেন, তাহা হইলে আমি আমার হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে সমস্ত বঙ্গভূমিকে এই সময়ে উদ্বোধিত করিতাম। হেমচন্দ্র অন্ধ হইয়া কাশীধামে অসহায় পড়িয়া রহিয়াছেন, আর আমরা কেহই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি না!—কেহই তাঁহার খবর লইতেছি না! ধিক আমাদের জাতীয় জীবনে! ধিক আমাদের সাহিত্যিক আস্ফালনে! আমি তোমাকেই লিখিলাম। যাহা যাহা করিতে হয়, তুমিই তাহা করিবে।

স্নেহানুগত
শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

সভাসমিতি করিয়া তাঁহার জন্ত অর্থ সংগ্রহ করা হয়—কবিবর হেমচন্দ্রের এরূপ ইচ্ছা ছিল না। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়কে লিখিত রায় সাহেব শ্রীযুক্ত

হারাণচন্দ্র রক্ষিতের একখানি পত্রে এ সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের অভিপ্রায় প্রকটিত আছে। সমগ্র পত্রখানি এ স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

১৮নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা

১৯শে আষাঢ় ১৩০৬

সুহৃদ্বরেষু

কবিবর হেমচন্দ্রের বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনি আপনার কাগজে ধারাবাহিকরূপে যে সহানুভূতি সূচক প্রবন্ধ প্যারা প্রভৃতি প্রকটিত করিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই আপনার প্রগাঢ় সহৃদয়তার পরিচয়। পূর্ব্ববঙ্গের সেই প্রথিতনামা অকৃত্রিম সাহিত্য-বান্ধব—বঙ্গের কার্লাইল—মনস্বী রায় শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর মহোদয়, হেমচন্দ্রের প্রতি সর্ব্বাগ্রে যে সমবেদনা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার স্বভাবসুলভ উদারতার ও মহানুভবতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু ভাই! সভাসমিতি আয়োজন করিয়া আপনারা দুর্ভাগ্য কবির দুঃখ মোচনে অগ্রসর হইয়াছেন।

না তাহা করিবেন না, ইহাই আমার অনুরোধ। এ দেশ, সভাসমিতির দেশ নহে। এ দেশের মানুষ মানীর মান রাখিতে জানে না, ব্যথিতের ব্যথা সম্যক্ উপলব্ধি করিতেও পারে না। তাহা না হইলে, আমাদের মধুসূদন, খাইতে না পাইয়া, বিষম রোগগ্রস্ত হইয়া, দাতব্য হাঁস-পাতালে দেহত্যাগ করিলেন—সে দৃশ্য তখন কেহ দেখিয়াও দেখিলেন না—আর আজ কি না তাঁহার স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপিত হইল। বিশেষ হেমবাবুর নিজের ইচ্ছা নয় যে সভাসমিতি করিয়া, তাঁহাকে লইয়া মিছা একটা হৈ চৈ করা হয়। এ সম্বন্ধে তিনি আমাকে বহু পত্র লিখিয়াছেন। তবে তাঁহার একটা প্রার্থনা আছে বটে যে, দেশের কোন বিদ্যানুরাগী ধনাঢ্য ব্যক্তি রাজা, জমিদার ভূস্বামী প্রভৃতি যদি তাঁহাকে মাসিক কিছু কিছু বৃত্তি দেন, তবে বর্ত্তমান এই প্রথম অবস্থায় তাঁহার বিশেষ উপকার হয়। ভাই! দেশে কি এমন ভাগ্যবান্ পরোপকারী মহাত্মা নাই, যিনি বঙ্গের এই প্রবীণ ও প্রধান কবির—বৃত্রসংহার রচয়িতার—এই মলিন দশায় সাহায্য করিয়া আপন অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করেন? হায়! যিনি একদিন কল্পনা নেত্রে অমরাবতীর সেই অতুল ঐশ্বর্য্য ও সুখ-সম্পদের সেই উজ্জ্বল চিত্র সন্দর্শন

পূর্ব্বক, অদ্ভুত প্রতিভাবলে আপন অমর কাব্যে অঙ্কিত করিয়া বাঙ্গালী পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন, বিধির নির্ব্বন্ধে, আজ তিনি প্রায় অন্ধ ও নিঃসম্বল হইয়া দেশের দ্বারে অতিথি! ভাই! দেশ কি কবির মর্য্যাদা রক্ষা করিবে না? সভাসমিতি আহ্বান করিয়া কালক্ষেপ করা কেন? যাঁহার যেমন সাধ্য তিনি অবিলম্বে কবির নামে ৺কাশীধামে তাহাই পাঠাইয়া দিন। যদি আমাদের প্রকৃতই কিছু মনুষ্যত্ব থাকে, তবে তাহা দেখাইবার এই উপযুক্ত অবসর!

একটা আনন্দ সংবাদ দিই,—এইমাত্র রবিবাবুর এক পত্র পাইলাম যে, স্বাধীন ত্রিপুরার সেই মাননীয় মহারাজ, হেমচন্দ্রের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, হেমচন্দ্রকে তাঁহার জীবিত কাল পর্য্যন্ত ত্রিশ টাকা হারে মাসিক বৃত্তি ও নগদ দুইশত টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। ভাই! এত চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রম বুঝি এইবার সার্থক হইল। আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই ইহার মূলাধার। তাঁহার এই প্রকৃত কবিজনোচিত ব্যবহার স্মরণ করিয়া, আমার চক্ষে জল আসিতেছে। সত্য বলিতে কি, হেমবাবুর এই উপকার আমি যেন আত্ম উপকারের ন্যায় অনুভব

করিতেছি। ত্রিপুরার ন্যায় আর দুই এক স্থানে এমনি সাহায্য মিলিলেই আমাদের আরব্ধ কার্য্য শেষ হয়। রাজা শশিশেখরেশ্বর, রায় যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে আমি পত্র লিখিয়াছি। সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা কি আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন না?

প্রীতিপ্রার্থী

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

কিন্তু হেমচন্দ্রের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বঙ্গবাসী তাঁহার প্রতি সম্মাননা ও সহানুভূতি প্রদর্শন, ব্যক্তি ভাবে না করিয়া জাতিগত ভাবে করাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে আহূত সভাসমিতি প্রভৃতির কার্য্যবিবরণ এ স্থলে প্রকাশিত করিবার স্থান নাই।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় ত্রিপুরাধিপতি মাসিক ৩০৲, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়গণ মাসিক ৩০৲, বিজনীর রাণী অভয়েশ্বরী দেবী মাসিক ২০৲, মাননীয় কাশিমবাজারাধিপতি মাসিক ১৫৲, কোচবিহারাধিপতি মাসিক ৫০৲, সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মাসিক ১০৲, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ

মল্লিক রায় বাহাদুর মাসিক ৫৲ অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কবিবরের কয়েকজন আত্মীয় বন্ধু যথা, স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র, স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষ, উমাকালী মুখোপাধ্যায়, বিনোদ-বিহারী মুখোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী, যথোচিত মাসিক অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। দেশের প্রধান জমীদারগণ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অনেকেই হেমচন্দ্রকে এককালীন অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকখানি পত্র এস্থলে মুদ্রিত করিয়া, কবিবরের দারিদ্র্যহরণের জন্য সকলে কিরূপ ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় দিব।

(১)

ওঁ

৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন
যোড়াসাঁকো
কলিকাতা

বহুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

আমার পিতাঠাকুর আপনাকে তাঁহার আন্তরিক

আশীর্ব্বাদ জানাইতে বলিয়াছেন এবং প্রতিমাসে আপনার সাহায্যার্থে ২০৲ কুড়ি টাকা নিয়মিত পাঠাই-বার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন। প্রতিমাসের ২০শে তারিখে এখান হইতে টাকা প্রেরিত হইবে। গত মাসের টাকা অত্রসহ পাঠাই অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাসে মাসে ১০৲ টাকা করিয়া দিবেন সেও এই সঙ্গে পাইবেন।

আপনার পুত্র আপনার গ্রন্থাবলী হইতে সংকলন করিয়া যে বাল্যপাঠ্য গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন, আমার নিকট তাহার একখণ্ড প্রেরণ করিলে বিদ্যালয়ে তাহা প্রচার করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইব। কৃতকার্য্য হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

আমরা যে সামান্য দান পাঠাইলাম, আমার পিতৃদেবের আশীর্ব্বাদী স্বরূপ তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিলে আনন্দ লাভ করিব। ইতি ৩রা শ্রাবণ ১৩০৬

অনুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২)

Tipperah
State

আগরতলা
২৪ শে আষাঢ়
১৩০৯ ত্রিপুরাব্দ

সবিনয়ে নিবেদনম্

শ্রীশ্রীযুত ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বাহাদুরের আদেশ মত জানাইতেছি বঙ্গসাহিত্যসেবী মাত্রেই আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। এ কৃতজ্ঞতার ঋণ সামান্য অর্থ দ্বারা পরিশোধ হয় না। তথাপি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশে মহারাজ আপনার হস্তে এক কালীন ২০০৲ দুই শত টাকা প্রেরণ করিতেছেন ও প্রতিমাসে নিয়মিত ত্রিশ টাকা করিয়া আপনার নিকট পাঠাইবার জন্য আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন। ভরসা করি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মহারাজের এই উপহার গ্রহণ করিয়া সুখী করিবেন।

২০০৲ টাকা মনিঅর্ডার যোগে পাঠান হইতেছে এবং প্রতি বাঙ্গালা মাসের প্রথম ভাগে আপনি একখানা

বিল দেওয়ান শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র মহাশয় সংসার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক সদনে পাঠাইলে মাসিক বন্দানি ৩০৲ টাকা যথা সময় প্রেরিত হইবে। বর্ত্তমান মাসের ১লা হইতে সে বন্দানি ধার্য্য হইয়াছে।

বশংবদ

শ্রীমহিমচন্দ্র দেব বর্ম্মণঃ

(কর্ণেল) শ্রীশ্রীযুতের এডিকং

(৩)

পবিত্রাশয় শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

পবিত্রাশয়েষু।

দৈবদোষে আপনি আজ অন্ধ, চিরজীবন দেশের সেবা করিয়া, বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও আজ আপনি দরিদ্র হইয়াছেন, আপনার বর্ত্তমান অবস্থায় দেশশুদ্ধ লোক দুঃখিত।

বিজনী রাজ সরকারের অবস্থা সমস্তই আপনি অবগত আছেন। নানা কারণে বিজনীর বর্ত্তমান আর্থিক

অবস্থা ভাল নয়, কিন্তু আপনার বর্ত্তমান অবস্থায় সহানুভূতি প্রদর্শন জন্য আপনার জীবনকাল পর্য্যন্ত বিজনী রাজসরকার হইতে মাসিক ২০৲ কুড়ি টাকা করিয়া বর্ত্তমান মাসের ১লা তারিখ হইতে বৃত্তি নির্দ্ধারিত করা গেল।

আমার ইষ্টেটের কলিকাতার মোক্তার শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত আপনাকে এই কুড়ি টাকা করিয়া দিবেন। আপনার ন্যায় লোকের পক্ষে যদিও ইহা খুব সামান্য, তথাপি আপনার কষ্টের অবস্থায় আমার সহানুভূতি স্বরূপ এই ক্ষুদ্র সাহায্য গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি

শ্রীমতী রাণী অভয়েশ্বরী দেবী।

অভয়াপুরী

তারিখ ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বাং।

(৪)

শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ।

কাশীম্বাজার

শ্রীপুর রাজধানী।

নং ২

অশেষ মানাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাশয় মানাস্পদেষু—

মোঃ ৺ কাশীধাম

মহাত্মন্

আপনার বর্ত্তমান অবস্থায় শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর আন্তরিক দুঃখিত হইয়া আপনার কাশীবাসের ব্যায়ানুকুল্যে আগামী ভাদ্র মাস হইতে মাসিক ১৫৲ পনর টাকা হিসাবে সাহায্য প্রদান করিবার মনস্থ করিয়াছেন এবং প্রথম মাসের সাহায্যের টাকা অবিলম্বে প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন। আজ্ঞানুসারে এতৎসহ মনিঅর্ডার যোগে আগামী ভাদ্র

মাসের জন্য আপনার সাহায্যার্থে ১৫৲ পনর টাকা প্রেরিত হইল। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন। ইতি

(স্বাঃ) শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
সেক্রেটারী

সন ১৩০৬ সাল
তারিখ ৩০শে শ্রাবণ।

দেশের প্রধান জমীদারগণ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অনেকেই হেমচন্দ্রকে এক কালীন অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রামচরণ মিত্র মহাশয় হাইকোর্টের উকীলগণের নিকট হইতেও কবিবরের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলেন শুনিয়া হেমচন্দ্র স্বয়ং তাঁহাকে উক্তবিধ প্রয়াস হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার একাংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"I fear therefore that it will not be proper to lay any further burden on my sympathising friends among the pleaders

of the High Court. I would request you therefore to drop your project of collecting small subscriptions for me among your brother pleaders, as you intended. I do not know whether you have commenced the work and how far it has proceeded, but under the circumstances stated above, I think it would not be desirable to procced with it any longer. Are you not also of the same opinion ?"

কেবল এদেশে নহে, ইংলণ্ডেও কবিবরের দারিদ্র্য অপনোদনের চেষ্টা হইয়াছিল। অবসর প্রাপ্ত সিবিলিয়ান, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও লেখক স্যর উইলিয়ম উইলসন্ হাণ্টার সংবাদপত্রে কবিবরের দুরবস্থার কথা পাঠ করিয়া, ইংলণ্ডের 'ইণ্ডিয়া' সংবাদপত্রে একখানি চিঠি লিখিয়া, সম্পাদককে কবির সাহায্যার্থ একটি চাঁদার খাতা খুলিতে অনুরোধ করেন; এবং স্বয়ং ১০০৲ চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হন।

তিনি হেমচন্দ্রের জন্য কেবল ইংলণ্ডে চাঁদা তুলিবার

জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাহাই নহে, তিনি ভারতের সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট কর্ত্তৃক কবিবরের জন্য পেন্সনের ব্যবস্থা করাইয়া লইবারও সংকল্প করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রকে লিখিত স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষের একখানি পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্যর উইলিয়মের প্রস্তাবানুসারে 'ইণ্ডিয়া সম্পাদক' কবিবরের সাহায্যার্থ একটি চাঁদার খাতা খুলিয়াছিলেন। কিন্তু "ভারত সঙ্গীতে"র কবির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার মত, হাণ্টারের ন্যায় বঙ্গীয়-সাহিত্য ও সাহিত্য-সেবকের বন্ধু, ইংলণ্ডে অধিক ছিল না এবং হাণ্টারের এই সাধু চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে স্যর উইলিয়ম উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া তৎসহযোগে কবিবরকে একশত টাকা পাঠাইয়া দেন :—

Oaken Holt
Near Oxford.
Novr. 20. 1899.

My dear Raja,

I heard sometime ago that Hem
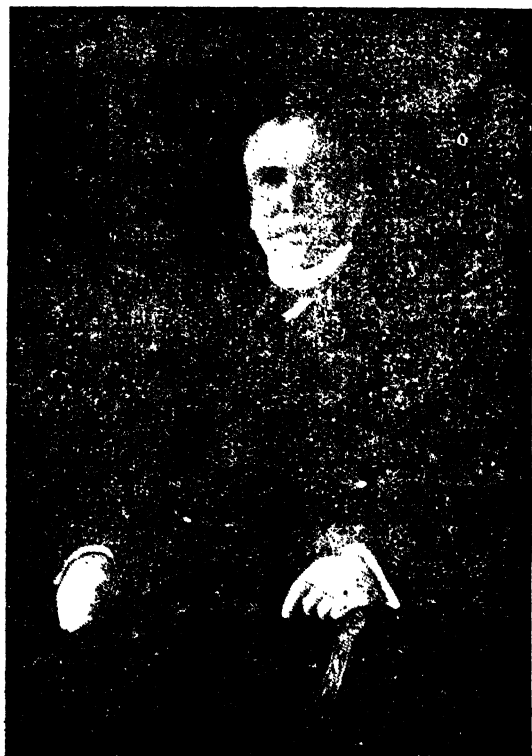
স্যর ডাব্লিউ, ডাব্লিউ হাণ্টার

Chandra Bannerjee has lost his eye sight and is in straitened circumstances.' It seemed to me that the fact had only to be known in order that the admirers of the great Bengalee Poet should esteem it a privilege to assist him, and I asked the Editor of "India" to open a subscription with my modest offering of a hundred rupees. He writes to me, however, that there has been no response ; so I venture to ask your advice as to how I should act. I have always regarded Hem Chandra Bannerjee as in a special sense a Bengali national Poet, whose genius has inspired the younger generation and whose verse will exercise a lasting influence on the development of the Bengalee language. If you think fit, will you convey to him one hundred rupees with my hearty respect for his talents and his work in

life? But if you think he would rather not receive a pecuniary gift, kindly give him my friendly and sincere wishes for his good health and my hopes that he has still good work before him to do.

The enclosed cheque will realise somewhat over Rs. 100—if you will kindly cash it at a Calcutta Bank and send him the proceeds. I hope you are well and with best wishes to you for the coming new year.

I am, Sincerely yours
(Sd.) W. W. Hunter.

স্যর উইলিয়ম হাণ্টারের ন্যায় প্রতিভাশালী বিদেশীয় লেখকের এই শ্রদ্ধার নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া হেমচন্দ্র উদ্বেলিত হৃদয়ে তাঁহাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত এফ্‌ এইচ্‌ স্ক্রীন বিরচিত স্যর উইলিয়ম হাণ্টারের জীবনচরিত হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

December, 20, 1899.

Dear Sir,

I cannot sufficiently express to you my gratitude for your generous gift to me, and for the kind and complimentary terms in which you speak of me in your letter to Raja Peary Mohan Mukerji. Most precious do I reckon both the gift and the letter,as coming from a gentleman of your great mental endowments, wide culture and literary fame and as marking a generous appreciation of my humble efforts in the field of Bengali poetry. Loss of sight is in itself affliction enough. In my case, unfortunately, it is associated with want of necessary means,:and this in the evening of life, when means are most needed. As the poet says, "Sorrow's crown of sorrow is having known better days." Keen is my repentance now that

I had not foresight enough in my "better days." I must bear my misfortune with fortitude, and try to do any useful work that may still be in my power to do. As I can no longer write, I do all I can, *ie,* put my name on the part of the paper that is pointed out to me.

Yours Sincerely
(Sd.) Hem Chandra Bannerjea.

গ্রন্থাবলীর আয়। হেমচন্দ্র কখনও গ্রন্থের আয় স্বয়ং গ্রহণ করেন নাই। কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া এদেশে কয়জন অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন? বিশেষতঃ হেমচন্দ্র কখনও অর্থের জন্য লিখেন নাই, গ্রন্থপ্রকাশদ্বারা অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজনও হয় নাই। সেকালে সকলেই সাহিত্য সেবা একটি মহৎ ব্রত বলিয়া মনে করিতেন। একবার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে হেমচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সাহিত্য-বন্ধুগণের মধ্যে কেবল বঙ্কিমচন্দ্রই (শেষ জীবনে) বহি হইতে মাসে ৫।৬ শত টাকা পাইতেন। ইহাও আজি

কালিকার তুলনায় বোধ হয় অতি সামান্য। উদার চরিত্র হেমচন্দ্র পৃথিবীতে সকলকেই আপনার ন্যায় মনে করিতেন এবং সময়ে সময়ে প্রতারিত হইতেন। ৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ লিখিয়াছেন;—

'আর্য্য সাহিত্য সমিতি' নামধারী কতিপয় হৃদয়হীন ব্যক্তি [হেমচন্দ্রের] গ্রন্থাবলীর প্রচারে অর্থ সংগ্রহ করে এবং কবিকে বঞ্চিত করিয়া ও আদালতে আপনাদিগকে যোত্রহীন বলিয়া নিস্কৃতি প্রাপ্ত হয়। ইতঃপূর্ব্বে কবি কখনও গ্রন্থের আয় স্বয়ং গ্রহণ করেন নাই। শেষ এই আয়ের উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল।"

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় কবিবরের শেষ জীবনে তাঁহার গ্রন্থাবলীর নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া এবং "হিতবাদীর" গ্রাহকগণের নিকট তাহা বিক্রয় করিয়া কবিবরের কিঞ্চিৎ অর্থাগমের উপায় করিয়া দেন। এ সম্বন্ধে কাব্যবিশারদ মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য—

১৩০৬ সালে কবিবর হেমবাবু তাঁহার গ্রন্থ-স্বত্ব ব্যক্তিবিশেষকে পাঁচশত টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন এবং তাঁহার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, এই সংবাদ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যখন আমাকে জানা লেন,

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

তখন আমি হেমবাবুকে এ সম্বন্ধে পত্র লিখিয়া অন্য প্রকার বন্দোবস্ত করিবার পরামর্শ প্রদান করি। ইহার ফলে ক্রমে আমার সহিত এই চুক্তি হয় যে, আমি সাধারণের নিকট অন্যূন দুই হাজার টাকা তাঁহাকে পুস্তক বিক্রয় করাইয়াই তুলিয়া দিব। অধিক তুলিতে পারি ভালই, নচেৎ দুই হাজার টাকার দায়ী আমি থাকিব। গ্রন্থস্বত্ব হেমবাবুরই থাকিবে, তবে আমি যখন যত ইচ্ছা গ্রন্থ ছাপিয়া বিক্রয় করিতে পারিব। এই অধিকার ভিন্ন আমার নিজের আর কোন অধিকার থাকিবে না। হেমবাবু নিজেও যত ইচ্ছা পুস্তক ছাপিতে বা অন্যকে ছাপিবার অধিকার দিতে পারিবেন, তবে দেড় বৎসর মধ্যে তিনি স্কুলপাঠ্য কবিতাবলী ভিন্ন আর কিছু ছাপিবেন না, বা ছাপার অধিকার অন্যকে দিবেন না। ইত্যাদি মর্ম্মে স্বর্গীয় কবির সহিত আমার চুক্তি হয়। সেই দুই সহস্র মুদ্রার দায়িত্ব আমি লইয়াছিলাম, পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের পূর্ব্বেই তাঁহাকে সেই প্রতিশ্রুত মুদ্রা প্রদান করি, ও শেষে ইহার কত অধিক দিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহা হেমবাবু ও তাঁহার বন্ধুবর্গ অবগত ছিলেন। * * *

দরিদ্র অবস্থাতেও কবির হৃদয় উন্নত ছিল।

'ভিখারী' হইয়াও তিনি উপস্বত্ববিষয়ক হিসাব দেখিতে চাহেন নাই, একদিনও দেখেন নাই। এ বিষয়ে হিতবাদীতে লিখিত হইয়াছে—

'হিসাব পরীক্ষার জন্য আমরা হেমচন্দ্রকে বার বার বিরক্ত করিয়াছিলাম। প্রথম অনুরোধের পর তিনি দেখিতে অস্বীকার করিলে, আমি তাঁহাকে হিসাব পরীক্ষা করিবার জন্য লোক পাঠাইতে বলি, এবং তাঁহাকে শেষ টাকার ভগ্নাংশ পূর্ণ করিয়া আরও এক হাজার টাকা দিব বলি। তাহাতে তিনি ১৩০৭, ২৫ শে আষাঢ় আমাদিগকে একখানি পত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—

"আর আপনি একজন লোক পাঠাইয়া দিয়া হিসাব পত্র দেখিবার কথা বলিয়াছিলেন তাহার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। আপনার কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আপনি বলিয়া গিয়াছেন যে, এবছরে আমাকে আর এক হাজার টাকা দিতে পারিবেন, এই কথাই আমার যথেষ্ট। জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন ও আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, সর্ব্বান্তঃকরণে আমি ইহাই প্রার্থনা করি।"

এই টাকাও আমি তাঁহাকে গিয়া দিয়া আসি।

এবিষয়ে যদিও তিনি 'যাহা প্রাপ্য' তাহা পাইয়াছেন স্বীকার করেন, তথাপি আমার মনের তৃপ্তি হয় নাই। আমি ইহার বহু পরেও হিসাব পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে বিনয় সহকারে অনুরোধ করি। তাহাতে তিনি ১৩০৯ সালের ১৪ই বৈশাখ আমাকে এইরূপ লিখিয়া পাঠান—

"এ হতভাগ্য দীনহীন অন্ধের আপনি বিস্তর উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি ও থাকিব। অন্তর্য্যামী ভগবানই জানেন যে, আপনার প্রতি আমার মনের ভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তবে কেন যে আমার প্রতি আপনার চিত্তমালিন্য ঘটিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সেই জন্য মর্ম্মান্তিক দুঃখিত আছি। যদি কখনও আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে সকল কথা নিবেদন করিব এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিব। জগদীশ্বর সর্ব্বপ্রকারে আপনার মঙ্গল করুন ইহাই এ দীনহীন অন্ধের প্রার্থনা। এই প্রার্থনাকরা ভিন্ন আমার আর কিছু করিবার সাধ্য নাই।

আপনার অনুগত ও আশ্রিত

(স্বাঃ) শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

"ইহার পরে এ সম্বন্ধে আর পীড়াপীড়ি করা অসাধ্য বলিয়া আমি হিসাবের কথা মুখে আনি নাই।

"হেমচন্দ্র নিজগুণে প্রতিপত্রেই বিনয় প্রকাশ করিতেন। এ অধমের সহিত টেক্‌ষ্টবুক কমিটির কথা, গবর্ণমেণ্টের বৃত্তির কথা ও অন্যান্য অনেক কথার আলোচনা করিতেন, আমার অকিঞ্চিৎকর পরামর্শ নিজগুণে গ্রহণ করিতেন। নিম্নলিখিত পত্রে এ বিষয়ের আভাস পাইবেন—

"একটিবার দয়া করিয়া এ দীনহীনের বাটীতে যদি পদার্পণ করেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হই। আপনার সময়ের এক একবিন্দু যে কত মূল্যবান তাহা আমি জানি; কিন্তু কি করিব, ভগবান আমাকে একেবারে মৃতপ্রায় করিয়া রাখিয়াছেন। আপনি দয়া না করিলে আমার কিছুই করিবার সাধ্য নাই। করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি যে দয়া করিয়া ৫ মিনিটের জন্য একটীবার দেখা দিবেন। একটী বিষয়ে আপনার উপদেশ লওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে এবং আপনার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে সে উপদেশ পাইতে পারিব না, সেই জন্যই এরূপ আগ্রহের সহিত আপনাকে একটু কষ্ট স্বীকার করিবার জন্য অনুনয় করিতেছি। আমি বড় হতভাগ্য! নিজ

মাহাত্ম্যে এই কথা স্মরণ করিয়া আমার প্রতি দয়া করিবেন। আমি আপনার একান্ত অনুগত এবং দয়ার পাত্র। কোন অপরাধ করিয়া থাকি তাহা মার্জ্জনা করিবেন। অধিক আর কি লিখিব ইতি—

আপনার বশংবদ
(স্বাঃ) শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

"আর একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—

"আমার শরীর ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, এই জন্যই ইহা লিখিয়া আপনাকে বিরক্ত করিলাম। কবে আসিতে পারিবেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়া জানাইলে যার পর নাই সুখী হইব। মরিবার পূর্ব্বে যতবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয়, ততই আমার পক্ষে সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয়। অধিক আর কি লিখিব।

আপনার অনুগত ও আশ্রিত
(স্বাঃ) শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

"এত স্নেহ, এত বিনয় এত সৌজন্য, আমি এ জন্মে

ভুলিতে পারিব না। এরূপ বহুসংখ্যক পত্র আমার নিকটে আছে—জনসমাজে সেগুলি প্রচার করা আমার অনভিপ্রেত। যাহা প্রকাশ করিলাম তাহাও আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।"

গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি। যদি দেশবাসীর মানসিক উন্নতিবিধান করা সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে যে সকল দুঃস্থ সাহিত্যসেবক বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া এবং দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়াও দেশবাসীর মানসিক উন্নতির জন্য তাঁহাদের প্রতিভা বিনিয়োজিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যথোচিত বৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক অনশনের কবল হইতে মুক্ত করাও সেই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য সুসভ্য দেশে দুঃস্থ সাহিত্যসেবককে যথোচিত বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। স্যর উলিয়াম হণ্টার হেমচন্দ্রের জন্য সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের নিকট হইতে যথাযোগ্য পেন্সন মঞ্জুর করাইয়া লইবার সংকল্প করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এতদ্দেশেও ব্যবস্থাপক সভার কোন কোন সভ্য হেমচন্দ্রকে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক

বৃত্তি প্রদান করাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ১৫ই এপ্রিল দিবসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বজেট বিতর্ক উপলক্ষে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাহিরপুরের মাননীয় রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর "বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে জীবনব্যাপী পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ" বাঙ্গালার বিখ্যাত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে একটি বৃত্তি প্রদানের জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। এই প্রস্তাবের উত্তরে মাননীয় মিষ্টার (পরে স্যর এডওয়ার্ড নরম্যান) বেকার বলেন যদি এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট যথারীতি আবেদন করা হয়, তাহা হইলে সেই প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি ও মনোযোগ আকৃষ্ট করিবে সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট পক্ষের এই উত্তরে প্রোৎসাহিত হইয়া ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ৩০শে আগষ্ট তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টকে একখানি পত্র লিখেন। আমরা সেই পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"One of the various duties of the Association has been to seek to assist eminent men of science and literature in these

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

provinces who have fallen into pecuniary difficulty. The Association therefore begs most humbly to approach the Government with a represen tation for help on behalf of Babu Hem Chandra Banerjee,the late senior goverment pleader of the High court and celebrated Bengali poet, who is and will continue to be widely known all over the country for the genuine and exceptional excellence of his poems. This old gentleman has now grown blind and is at present devoid af any means to support himself and his family. During his early days of prosperity he devoted most part of his income to the cause of charity and his generous heart and benevolence have, I am afraid, been the cause of his distress."

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এই পত্র প্রাপ্তির পর তদানীন্তন শিক্ষাধ্যক্ষ মিষ্টার (পরে স্যর আলেক্জাণ্ডার) পেডলার

মহোদয়কে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বলেন। ইনি হেমচন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকজন উচ্চপদস্থ ও শিক্ষিত ব্যক্তির অভিমত সংগ্রহ করেন। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্যর আলেক্জাণ্ডার কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া নিম্নোদ্ধৃত অভিমত প্রকাশ করেন :—

"I beg to state that Babu Hem Chandra Banerjee is considered the greatest living poet of Bengal. His poetry is of a very high order of merit, being adorned alike with the gorgeous magnificence of the East and the sombre grandeur of the West and it has enriched our literature with some of the noblest products of Eastern and Western culture. Considering his eminent services to literature and conside-ing the physical affiction which he, like England's great epic poet is suffering from and which has compelled him to retire from the legal profession, it would be a most-gracious act on the part of Govern

ment to confer on him some pecuniary recompense for his work and one that will be highly appreciated and gratefully acknowledged by the whole country."

শুনা যায় স্যর আলেক্‌জাণ্ডারের পরামর্শানুসারে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট, এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী অব ষ্টেটের নিকট হেমচন্দ্রকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তির জন্য সুপারিশ করেন, কিন্তু ভারতবর্ষের অর্থের প্রতি অসাধারণ মমতা এবং মিতব্যায়িতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট মহোদয় হেমচন্দ্রের জন্য ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে মাসিক পঁচিশটি টাকা মাত্র পেন্সন মঞ্জুর করেন। হেমচন্দ্রকে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট যে পত্রে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া ছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

No 657 T. G. The 20th June 1900.
From E. Lister Esq.
Under Secretary to the Govt. of Bengal.
General Department.

To Babu Hem Chandra Banerjee

Sir—I am directed to inform you that Her Majesty's Secretary of State for India has been pleased on the recommendation of the Government of India to grant you with effect from 1st January 1900, a pension of Rs 25 per mensem in consideration of your literary merits and distressed circumstances. I am to request that you will be good enough to intimate to this office the name of the Treasury at which the pension should be paid.

এই পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া হেমচন্দ্র গবর্ণমেণ্টকে যে পত্র লিখেন, তাহার শেষ ভাগে তিনি নিজে স্বাক্ষরের পরিবর্তে রবার ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হিসাব বিভাগের নিয়মানুসারে গবর্ণমেণ্ট এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক হেমচন্দ্রকে

এই পেন্সন প্রদত্ত হইলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রের শেষভাগে পরিষদ-সম্পাদক যতীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

Babu Hem chandra Banerjee has been regarded by his countrymen as a national poet of Bengal of exceptional excellence and the recognition of his merits at the hands of the Government will undoubtedly encourage the cause of vernacular literature of Bengal.

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তির পরিমাণ অতি অল্প হওয়ায় অনেকের মনস্তুষ্টি হয় নাই। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদিগের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পেন্সনের পরিমাণ বড়ই অল্প হইয়াছিল।" স্যর গুরুদাসের ন্যায় ব্যক্তির এই মন্তব্য গভীর অর্থ বহন করে।

কবির দারিদ্র্য কতদূর কাল্পনিক ?

মধুসূদনের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে রচিত কবিতায় হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

> হায় মা ভারতী, চিরদিন তোর কেন এ কুখ্যাতি ভবে ?
> যে জন সেবিবে ও পদযুগল সেই সে দরিদ্র হবে।

মাইকেল ও হেমচন্দ্রের জীবনের উদাহরণ দিয়া অনেকেই এই দুই ছত্র কবিতার সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সরস্বতীর এই বর-পুত্রদ্বয়ের প্রতি সত্যই কি কমলা বিরূপা ছিলেন ? মধূসূদন ও হেমচন্দ্র কি বাণীর প্রসাদে এককালে অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করেন নাই ? শেষ জীবনে মাইকেল ভয়ানক দারিদ্র্যকষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে তাঁহার নিজের দোষে। একবার কিশোরীচাঁদ মিত্রের ভবনে বিলাত হইতে নবপ্রত্যাগত মনোমোহন ঘোষ মহাশয় নিমন্ত্রিত হন এবং উভয়ের মধ্যে কথোপ-কথন প্রসঙ্গে মাইকেলের কথা উঠে। শুনিয়াছি মনোমোহন বলিয়াছিলেন—"যদি স্বয়ং ভগবানও চেষ্টা করেন, মাইকেলের দারিদ্র্য দুঃখ দূর করিতে পারিবেন না। মাইকেলকে আজি যদি কেহ সহস্র টাকা দেন,

তাহা হইলে মাইকেল আজই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হোটেলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহার্য্য ও পানীয় প্রস্তুত করিতে আদেশ দিবেন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনীর ন্যায় বিলাসিতায় সমস্ত অর্থ এক রাত্রিতেই ব্যয় করিয়া ফেলিবেন।" হেমচন্দ্রও অপরিমিত ব্যয় করিতেন, কিন্তু মাইকেল ও হেমচন্দ্রের চরিত্রগত প্রভেদ অনেক। মাইকেল যখন নিতান্ত স্বার্থপরের ন্যায় আপনার সুখের জন্য নানা প্রকার বিলাসিতায় অজস্র অর্থ ব্যয়িত করিতেন, তখন পরের কথা দূরে থাকুক, নিকটতম আত্মীয় স্বজনের কথা, এমন কি তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর কথা বা পুত্র কন্যার কথাও ভাবিতেন না। হেমচন্দ্র অপরিমিত অর্থব্যয় করিতেন—দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচনার্থ, স্বজন আশ্রিতগণের সুখের জন্য। তিনি "চিত্ত বিকাশে" যাহা বলিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য!

আত্ম পর ভাবি নাই, অনন্য উপায়
যে এসেছে আশা করে দিয়াছি তাহায়।

হেমচন্দ্র যে দারিদ্র্য কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজেরই কর্ম্মফল। কিন্তু গোল্ডস্মিথের "গ্রাম্য পুরোহিতে"র ন্যায়

'Even his failings leaned to virtue's side' এবং এই জন্য হেমচন্দ্রের প্রতি সহানুভূতি স্বতঃই আকৃষ্ট হয়।

কিন্তু "চিত্ত বিকাশে" হেমচন্দ্র যে লিখিয়াছিলেন "কে দেখে আমারে আজ ফিরায়ে নয়ন," "ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই"—এ সকল কথা নিতান্ত অতিরঞ্জিত। সংবাদ পত্র সম্পাদকগণ এই সকল অতিরঞ্জিত কথা আরও অতিরঞ্জিত করিয়া কবির জন্য সাহায্যভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, বার্দ্ধক্যে তরলমস্তিষ্ক কবি তাঁহার বিলাসী পুত্রগণের প্ররোচনায় আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করিয়া দেশবাসীর নিকট হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মাইকেলের ন্যায় তাঁহার সাধারণ্যে ভিক্ষা করিবার মত অবস্থা হয় নাই। কবি মৃত্যুকালেও যে বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহার মূল্য তখনকার দিনেও অর্দ্ধলক্ষমুদ্রার কম নহে। তাঁহার শৈশবের স্মৃতি-বিজড়িত "রাজবোলহাটে"র তালুক কিছুদিন পূর্ব্বে ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রকে বিক্রয় করিয়াছিলেন বটে, তথাপি তাঁহার উইলে দেখা যায় এই সময়ে তাঁহার বৃহদায়তন আবাস-ভবন এবং চারিখানি ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া বাটী তাঁহার

অধিকারে ছিল, চৌদ্দ পনেরো হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজও ছিল। 'চিত্তবিকাশ' প্রকাশকালে তাঁহার লক্ষ্মণোপম সহোদর পুর্ণচন্দ্র জীবিত ছিলেন এবং কাশীতে চিকিৎসকরূপে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন। অবশ্য যে ভাবে হেমচন্দ্র এতদিন কালযাপন করিতেছিলেন তাহার তুলনায় তিনি দরিদ্র হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কবি যে দারিদ্র্যের ভীষণছায়া দেখিয়া নৈরাশ্যসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন তাহা অনেকাংশে কাল্পনিক। যিনি চিরদিন তাঁহার দেশ-বাসীর হৃদয়ে আত্মসম্মানজ্ঞান জাগ্রত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে সাধারণের নিকট হইতে এইরূপ সাহায্যগ্রহণ করা নিতান্ত বিস্ময়কর। তাঁহার পরিবারবর্গের অনেকেই তাঁহার এই আচরণে ব্যথিত হইয়াছিলেন। উমাকালীকে লিখিত পূর্ণচন্দ্রের দুইখানি পত্র হইতে কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইবার যোগ্য :—

Benares city
July 30th 1899.

My dear Umakali

* * * As for my brother's case I did

not like that his circumstances and poverty should be made known even to his dearest friends. The second time when I went down to Calcutta after the operation it was to settle the family and household expenses. I divulged a little of my mind to him but he prevented me to talk over those matters. Next morning after this he asked me to write to Ramesh Babu and Jogendra to come over to him. I believe it was to settle the family matters. Ramesh Babu came but Jogendra did not come. Before Ramesh Babu went to dada I told him that howsoever he might have been thick and thin with my brother I did not wish that my brother should disclose the secrets of his family matters to him; this point was to be settled between him and me. No outsiders are to be allowed to

hear such matters. He quite approved of my words and he went to my brother and told him that I wanted to talk with him on some family matters. My brother said that speaking of such subjects would bring tears to his eyes and thus he would lose his sight. He had hopes then, but I had not. I wanted to come away and from this I had reaped all sorts of abuses on my head from Jogendra. When brother came here he disclosed his circumstances before Ramesh Babu, Annada Babu and me. Ramesh Babu wanted to assist him and my brother said Baku would give him Rs. 25 or so and Jogendra told him that he would give him Rs. 8 a month. I told them that as long as I was able to earn I would not like that my brother would go begging from door to door and I undertook to bear all the expenses. Since this time I have been

paying Rs, 100 a month for his family and Rs. 20 for Ishan's family and Rs. 8 for his pocket expenses here and Rs 4 for his servant Hari, besides other expenses and extras. He disclosed his circumstances without my knowledge to the public in his book চিত্ত বিকাশ and to some others. This made the public to take up his case and the Rajah of Tipperah offered to assist him with Rs 30 a month. When the offer was made he asked me and I could not but consent to this as he himself divulged his secret. He has been getting this subscription, yet I have been regularly remitting money to Kidderpore. Fani has been drawing Rs 30 a month and he would not pay a single pice for the family. * * *

Yours obediently
Sd. Poorna ch. Banerjee.

Benares city

August 8th 1899.

My dear Umakali

* * * Since I have written to you my brother has got a further help from Maharshi Debendranath Tagore and his nephew of Rs 30 a month and Rs 10 a month from Zamindar of Santosh. Our nephew (a cousin's son) Girindranath Benarjee of Uttarpara who is a Deputy Magistrate now has agreed to help him with Rs 10 a month. Besides he has received a donation of Rs 350 or so from different parties. His mind has fallen down to a lower level from its original greatness and he does not scruple to accept anything. If I speak to him not to accept donation from certain quarters he feels sorry and dejected. Under the cir-

cumstances I had to keep within bounds. It pains me a good deal for this but I cannot help. Though he has got a monthly subscription of Rs 80 besides donations I ungrudgingly meet all demands of his family and himself. It is mean of me to say so but I tell you.

Ram Ch. Mitter of your Court wrote to him to raise subscription for him. Calica Das Dutt wrote to me to know all the facts of his case. I feel great humility humeliation to give out everything but when he has made it public and he wishes to have the help what could I do. It pains me to say that a signaller has sent him Re. 1.

Yours affly

Sd. Poorna Ch. Banerji.

হেমচন্দ্রের এই ব্যবহার বিস্ময়জনক বটে কিন্তু উহার

কারণ জানিতে পারিলে তাঁহার এই দুর্ব্বলতা উপেক্ষার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। হেমচন্দ্রের হৃদয় তাঁহার পুত্রগণের প্রতি গভীর বাৎসল্যে পূর্ণ এবং আশ্রিতগণের প্রতি অসাধারণ মমতা ছিল। তাঁহার স্বজন আশ্রিতগণের অভাব দূর করণের জন্য মানী হেমচন্দ্র সকলপ্রকার অপমান ও হীনতা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অল্প বয়সেই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অন্যান্য পুত্রগণও উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন না, অথচ তাঁহাদের অর্থের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। ইঁহাদের জন্য হেমচন্দ্রের অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের কোনও স্নেহভাজন বন্ধু একবার তাঁহাকে বলেন যে তাঁহার আবাসভবনখানি বিক্রয় করিলেই অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠিতে পারে। উহাতে স্বল্পমূল্যের বাটীভাড়া করিয়া অনায়াসে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। তাহাতে হেমচন্দ্রের অন্ধনয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হয়। তিনি কাতরস্বরে উত্তর দেন, "ছেলেদের একটিকেও মানুষ করিতে পারিলাম না। তাহাদের মাথা গুঁজিবার স্থানও রাখিয়া যাইব না?" কয়েক সহস্রমুদ্রার কোম্পানীর

কাগজ ছিল, তাহাও উন্মাদিনী পত্নীর চিকিৎসা ও ভরণপোষণের জন্য স্বতন্ত্র রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, পুত্রগণ পিতার এই অপার্থিব স্নেহের প্রতিদান দিতে পারেন নাই। শুনিয়াছি তাঁহার আর্থিক অসচ্ছলতার দিনেও কোনও পুত্র কালীপূজা উপলক্ষে ২০০।২৫০৲ টাকার বাজী পুড়াইয়াছেন। হেমচন্দ্রের নামে যে অর্থ সংগৃহীত হইত তাহা সমস্ত হেমচন্দ্র পাইতেন না, যাঁহার হাতে পড়িত তিনিই তাহা লইয়া ইচ্ছানুরূপ ব্যয় করিতেন। শেষ কয়বৎসর হেমচন্দ্র স্বহস্তে নামসহি করিতে পারিতেন না, রবার-ষ্টাম্প ব্যবহার করিতেন। শুনিয়াছি ঐ ষ্ট্যাম্পও হেমচন্দ্রের অজ্ঞাতসারে অর্থসংগ্রহার্থ ব্যবহৃত হইত। হেমচন্দ্রের প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলা দেবী তাঁহার ভ্রাতৃগণের জন্য পিতাকে এই দীনতা স্বীকার করিতে দেখিয়া মর্ম্মাহতা হইয়াছিলেন। তিনি সাধারণের নিকট হইতে অর্থসাহায্য গ্রহণ হইতে পিতাকে নিরস্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন। অবশেষে বিফলপ্রযত্ন হইয়া "আর এগৃহে আসিব না" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুরালয়ে প্রত্যাগমন করেন। অভিমানিনী কন্যা সত্য সত্যই আর পিতৃগৃহে যান নাই।

ইহার অল্পকাল পরেই তিনি সতীলোকে প্রয়াণ করেন।

বিধাতা কি উদ্দেশ্যে হেমচন্দ্রকে এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পাতিত করিয়া তাঁহার এইরূপ মতি গতি করিয়াছিলেন তাহা আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। হয়ত এই ঘটনা না ঘটিলে, বাঙ্গালীজাতির সাহিত্যপ্রেমের ও দেশের সেই পরমোপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা হইত না। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালীজাতি এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। মাইকেলের প্রতি আচরণে যদি বাঙ্গালীর কোনও পাপ স্পর্শিয়া থাকে, তাহা হইলে হেমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধার অভিব্যক্তিতে তাহার ক্ষালন হইয়াছে। একজন অজ্ঞাতনামা সিগন্যালার হেমচন্দ্রকে একটি টাকা পাঠাইয়াছেন ইহাতে পূর্ণচন্দ্র মনঃক্ষুণ্ণ হইতে পারেন, কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে সেই অজ্ঞাতনামা দেশবাসীর ভক্তি-জবার নিকট কুবেরের ধনরাশি নিষ্প্রভ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে এবং যে অমর লেখনী বিনিঃসৃত কাব্যাদি সর্ব্বশ্রেণীর ব্যক্তির নিকট অপূর্ব্ব সমাদর লাভ করিয়াছে, এই ঘটনা চিরদিন সেই শক্তিশালিনী লেখনীর গৌরব ঘোষণা করিবে।

শেষ জীবন।—১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি হেমচন্দ্র সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লীডারের কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। হেমচন্দ্র শেষ জীবনে কথঞ্চিৎ শান্তির আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও আত্মীয়ের বিয়োগে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মে মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা "প্রচার" সম্পাদক রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন। ইনি হেমচন্দ্রের পরমস্নেহভাজন ছিলেন এবং ইঁহার মৃত্যুতে হেমচন্দ্র অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন।

এই বৎসর ১১ই জুন দিবসে হেমচন্দ্রের একান্ত অনুগতা ভগিনী নৃত্যকালী দেবী কাশীধামে দেহত্যাগ করেন। ইনি হেমচন্দ্রের সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন এবং ইঁহার বিয়োগে হেমচন্দ্র যে কতদূর ব্যথিত হইয়াছিলেন তাহা বলিবার নহে। হেমচন্দ্রের অন্যতম দৌহিত্রী-পতি বর্দ্ধমানের সবজজ শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নৃত্যকালী দেবীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "নেত্য দেবী—আমাদের ছোড়দিদি—সংসারের গৃহিণী ও স্নেহময়ী। হেমবাবুর প্রতি তাঁর যে কিরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল তা লিখিবার ক্ষমতা নাই। আজ এই ২০ বৎসর বাদে ছোড়দির কথা স্মরণ

হয়ে চক্ষু জলে ভাসিতেছে। তাঁর আদর ভালবাসা স্নেহ মমতা এজন্মে ভুলিতে পারিব না। হেমচন্দ্রের উপযুক্ত ভগিনী তিনি ছিলেন। আত্মীয়স্বজনকে আদর আহ্বান করিতে তাঁর মত আর দেখি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিসে হেম বাবুর মান সম্ভ্রম রক্ষা হয় সে বিষয়ে ছোড়দিদির বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সংসারের যত ঝড় ঝাপটা ছোড়দিদি নিজে সহ্য করিতেন, পারতপক্ষে তাহা হেমবাবুর কাণে তুলিতে দিতেন না।" নৃত্যকালীর মৃত্যু সম্বন্ধে বিনোদবিহারীর রোজনামচা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

Feby, 25. 1899. Alarmed to hear that two of my brothers-in-law had started for Benares last night. Wired to Purna Babu at 11-30 a.m Is father danger "ously-ill should we go. Wire."

June 13. Heard with regret of my aunt in law's death at Benares on 11th inst Received an invitation letter from Purna Babu. The Poor lady has rest after all, but Kidderpore house would ever miss her.

•

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই দিবসে হেমচন্দ্রের অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ মহাপ্রাণ স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র পরলোকগমন করেন। ইঁহার মৃত্যুতে হেমচন্দ্র শোকে মুহ্যমান হইয়াছিলেন এবং "এবে কোথা চলিলে" শীর্ষক শোকগাথায় পরলোকগত বাল্যবন্ধুর উদ্দেশে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন—

ঢালি অশ্রু অবিরত
সখা বলে ডাকি কত,
নিদারুণ বধিরতা যে দেশে এমন,
কোন প্রাণে সেথা তুমি করিলে গমন?
কেমনে বা ভোল আজ আবাল্য প্রণয়,
একত্রেতে সব হয়,
কোথাও পৃথক নয়,
বিশ্রাম ভবন কিম্বা বিচার আলয়
কত নিরজনে বাস
কত হাস্য পরিহাস,
কত সুখ আলোচনা শোক পরিচয়;
মন-কথা বলাবলি
প্রেমে কত কোলাকোলি,
মিষ্টালাপ শিষ্টাচার কত সুখময়,

যৌবনে যশের আশা,
একত্র বিজয়-তৃষা,
যুগান্তের কথা যত আজি মনে হয়।
তুমি রোগে শয্যা'পরে
অন্ধ হয়ে আমি দূরে,
দেখিতে নারিনু শুধু যাবার সময়।
আমারো বার্দ্ধক্য-কষ্ট দেখিলেনা হায়।

কবিতাটি বোধ হয় "হিতবাদীতে" প্রকাশিত হ
ইহাই কবিবরের শেষ 'প্রকাশিত' কবিতা।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে হেমচন্দ্র বারাণসী হই
কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার সেই জীবন
অবস্থায় তিনি বন্ধুগণের সাহচর্য্যের জন্য ব্যাকুল হ
তেন। বাল্যবন্ধুগণকে প্রায়ই সাক্ষাৎ করিবার ড
অনুরোধ করিতেন। কিন্তু বন্ধুগণের সহিত মি
দীর্ঘ ব্যবধানে ঘটিত। তিনি যে চিত্তবিকাশে লিখি
ছিলেন—

ভালবাসা বলি যারে পরাণে ধেয়াই,
সে ভালবাসারে হায় কোথা গেলে পাই?
পরাণের বিনিময়ে পরাণ বিকাই,
এ ভালবাসা কি তবে পৃথিবীতে নাই?

তাহার অর্থ তিনি শেষজীবনে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। যে হেমচন্দ্রের সৌভাগ্যদশায় সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ, তাঁহার নিকটে বসিতে পাইলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন, সেই হেমচন্দ্রের বার্দ্ধক্যে—অন্ধাবস্থায়, দারিদ্র্যদশায়—কেহ তাঁহার সমীপস্থ হইতেন না। হেমচন্দ্রের অন্ধাবস্থায় তাঁহার নিকট সংবাদপত্র পাঠ করিবার জন্য খিদিরপুরের একটী যুবককে বেতন দিতে হইত। তাঁহার জীবনের একটী বিষাদময়চিত্র আমাদের পরম শ্রদ্ধভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় দ্বিতীয়বর্ষের "মানসী"তে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৩০৭ সালের মাঘ মাসের এক অপরাহ্নে হেমেন্দ্রপ্রসাদ তদীয় অগ্রজ দেবেন্দ্রপ্রসাদ, 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি, রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন এবং নবীন লেখক মন্মথনাথ সেন মহাশয়গণের সহিত খিদিরপুরে হেমচন্দ্রকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সেই সাক্ষাতের চিত্র এইস্থানে পুনঃপ্রকাশিত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—

"আমরা কয়জন তীর্থযাত্রী অপরাহ্নে খিদিরপুরে উপনীত হইলাম। স্বচ্ছসলিলা দীর্ঘিকার কূলে হেমচন্দ্রের ভবন—বৃহদায়তন, কিন্তু তাহার সংস্কারের অভাব

গৃহস্বামীর দারিদ্র্য ঘোষণা করিতেছে। একদিন যে গৃহ আশ্রিত, অনুগত, বন্ধু, প্রার্থী প্রভৃতির কলরবে পূর্ণ থাকিত; সে গৃহ যেন জনহীন। আমরা ডাকিলে একজন যুবক আসিলেন। তিনি আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানিয়া যাইয়া সংবাদ দিয়া আসিলেন ও আমা-দিগকে কবির কক্ষে লইয়া যাইলেন।

"আমরা কবির কক্ষে উপনীত হইলাম। একখানি নেয়ারের খাটিয়ার উপর একটি মলিন শয্যা ছিল, তাহাই কবির শয্যা। তাঁহার বেশও শয্যারই মত মলিন। তিনি আমাদিগের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি শয্যার উপর উপবেশন করিলেন। তিনি মৃদু-স্বরে আমাদিগের নাম ও আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা তাঁহাকে দেখিতে আসি-য়াছি শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আপনাদের অনুগ্রহ যথেষ্ট।" আমরা বলিলাম, তাঁহাকে দেখা আমরা সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করি। তাঁহার নিকট আমা-দের ঋণ প্রচুর। আমরা দেশের কৃতিসন্তানদিগের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিতেছিলাম; তাঁহার প্রতিকৃতি সংগ্রহের ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বলিলেন, 'বড়-

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

লোকের মধ্যে আমাকে কেন? আমি কি করিয়াছি?" আমরা বলিলাম, তিনি দেশের এক শ্রেষ্ঠ কবি।

"তখন তাঁহার শরীর অসুস্থ। তিনি স্বাস্থ্যের জন্য বেড়াইতে চাহেন কি না জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'এ অবস্থায় কি করিয়া বেড়াইব? গাড়ী রাখিবার সাধ্য নাই।' দৃষ্টিশক্তির কথায় তিনি বলিলেন, এক চক্ষু অস্ত্র করাইয়া নষ্ট হইয়াছে। অপরটীও নাই বলিলেই হয়। কেবল দ্বার বা বাতায়ন মুক্ত থাকিলে আলোক কি অন্ধকার বুঝিতে পারেন। আর একটি কেন অস্ত্র করান না, জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'মরিবার বয়স হইয়াছে। শরীরও ভাল নাই।'

"আমরা বলিলাম, 'সম্ভবতঃ কিছু পড়িয়া শুনাইলে সময় ভাল কাটে। আমরা দূরে থাকি, নহিলে আসিয়া কিছু পড়িয়া শুনাই। আপনার পুরাতন বন্ধুরা নিকটে আছেন, তাঁহারা বোধ হয় সর্ব্বদা আসিয়া থাকেন?' কবি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন, বলিলেন, 'বন্ধু, আমার কি আর বন্ধু থাকিবার সময়? আর সকলে যে যাহার কায লইয়া ব্যস্ত; কেহ ত আর আমার মত নিষ্কর্ম্মা নহেন!' তাঁহার দৃষ্টিহীন নয়ন দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

"তাঁহার পরিজনবর্গের কথায় তিনি বলিলেন, 'তিন পুত্র বর্ত্তমান। কনিষ্ঠ মৃত। জ্যেষ্ঠের রক্তবমন হয়। মূর্চ্ছারোগও আছে। কয়দিন আছেন, জানি না। আপনারা জানেন কি না জানি না, আমার স্ত্রী আট দশ বৎসর পাগল।' এই দুর্ভাগ্যের কথা বলিয়া তিনি বলিলেন 'কেন যে বাঁচিয়া আছি জানি না।' তখনও তাঁহার নয়নে অশ্রু ঝরিতেছিল।

"'ভারতসঙ্গীতে'র উপরে যে টীকা আছে প্রথমে তাহা ছিল না। একবার গবর্ণমেণ্টের তাড়নায় ঐ টীকা দিয়া কবিতাটির স্বরূপ প্রতিভাত করা হয়। কবিকে সে কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'কিছুই মনে নাই।'

"ইহার পর আমরা বিদায় হইলাম। তাঁহারই কবিতার কয়টি চরণ স্মরণ করিতে করিতে ফিরিলাম।

"হায় মা ভারতী চিরদিন তোর কেন এ কুখ্যাতি ভবে;
যে জন সেবিবে ও পদযুগল সেই সে দরিদ্র হবে!"

"হেমচন্দ্রকে দর্শনের কথা মনে করিলেই আমার ম্যাক্সমুলারের হায়েন দর্শন মনে পড়ে। সেও এমনই করুন—এমনই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য।"

পূর্ব্বসঞ্চিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি স্বজন আশ্রিত-গণের জন্য স্বতন্ত্র রাখিয়া, স্বয়ং ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া হেমচন্দ্র শেষ জীবন অতি কষ্টেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন এবং বলিতেন—"কেন আসিয়াছেন? এ হতভাগ্যের নিকট বসিলে কেবল কষ্ট পাইবেন মাত্র।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবিবরের নামে যে অর্থ সংগৃহীত হইত তাহা সমস্ত তাঁহার হস্তে আসিত না। যিনি কখনও টাকাকড়ির হিসাব রাখিতেন না, অপরিমিত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দুই হস্তে ব্যয় করিতেন, তাঁহার শেষজীবন কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা একটি ঘটনায় প্রকাশ পাইবে। অধুনা বাঙ্গালার অন্যতম মন্ত্রী হেমচন্দ্রের বন্ধুপুত্র মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাস-চন্দ্র মিত্র সি-আই-ই মহোদয় কিছুদিনের জন্য কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির কলেক্টর ছিলেন। সেই সময়ে হেমচন্দ্র একখানি পত্রে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—

২৪ বৈশাখ ১৩০৮

"বাবা প্রভাস,

তোমার একজন ট্যাক্স সরকারকে পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন পত্রাদিও পাই নাই,

কোন সরকারও আসে নাই। অনেক করিয়া টাকা কয়টি যোগাড় করিয়া রাখিয়াছি, আবার কবে খরচ হইয়া যাইবে বলিতে পারি না সেইজন্য তোমাকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করিতেছি। ইতি"

এই পত্র পাঠে প্রতীত হয়, যে হেমচন্দ্র কখনও টাকাকড়ির কোন সংবাদ রাখিতেন না, তিনি এখন "অনেক করিয়া টাকা কয়টি যোগাড়" করিয়াছেন এবং যিনি খরচ পত্রাদির কোনও তত্ত্ব লইতেন না, তিনি এখন "আবার কবে খরচ হইয়া যাইবে" বলিয়া আশঙ্কা করিয়া ট্যাক্সের টাকা শীঘ্র জমা দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

হেমচন্দ্র চক্ষু থাকিতে পৃথিবীর স্বরূপ দেখিতে পান নাই। উদারচরিত কবি বসুধার সকলকেই আত্মীয় ভাবিয়াছিলেন। অন্ধ হইয়া হেমচন্দ্র পৃথিবীর স্বার্থ-পরতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে দরিদ্র হইয়া ধনী বন্ধুগণের সহিত সমভাবে আলাপ করা কত-দূর তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য বন্ধুগণকে অতি দীনভাবে পত্রাদি লিখিতেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদকে লিখিত পত্রগুলিতে পাঠকগণ তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রমথ-

নাথ রায় চৌধুরী বলেন, তাঁহাকেও কবিবর এরূপ ভাষায় পত্র লিখিতেন যে তাহা পড়িতে লজ্জা হইত। স্যর চন্দ্রমাধবকে একবার এরূপভাবে পত্র লিখিলে তিনি উত্তরে লিখিয়াছিলেন—

"You are in great difficulties, but that, I humbly think, is no reason why you should address me in the way and in the language you have adopted. That shows that you have come to entertain of me a very different opinion than you had for years together entertained."

হেমচন্দ্রের বাল্যবন্ধু শ্রদ্ধাস্পদ. শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা উপন্যাসের কাটতি দেখিয়া নিম্নোদ্ধৃত পত্রে কবিবরকে উপন্যাস লিখিতে পরামর্শ দেন—

"I have a practical suggestion to make. I learnt from Umakali first that you had not been able to save enough to be above wants and you say the same

thing yourself in your book. Could you not now turn your pen from poetry to novels, (though not at sixty) as Scott did ? I do not know whether your previous training has been such—your study of men and character, that is, has been such as to qualify you to be a successful novelist, that supposing you could turn out a good novel of purpose, it would bring you a good deal of money. For one reader of poetry there are fifty readers of Romance, so that if you could bring out a good novel it would be a great help to you pecuniarily.

"You have been sick of life for sometime past. You longed for death even before you came to be afficted with blindness, but as your life has been spared, you will, I daresay, try to make the best of it."

কিন্তু হেমচন্দ্র জীবনের সায়াহ্নে কবিতাদেবীর চরণ পরিত্যাগ করিয়া নূতন ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। যিনি যৌবনে কমলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বাণীসেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে বার্দ্ধক্যদশায় অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে বালকগণের জন্য বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক লিখিবেন মনঃস্থ করিয়াছিলেন। যে লেখনী হইতে 'ভারতসঙ্গীত' 'বৃত্রসংহার' ও 'দশমহাবিদ্যা' বিনিঃসৃত হইয়াছিল, সেই লেখনী অবশেষে শিশুগণের জন্য বর্ণপরিচয় রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য কবিবরের একখানি অপ্রকাশিত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি হইতে কয়েকটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

জয় জয় দয়াময় জগতের পতি।
তব পদে বালকেরা করিছে প্রণতি।
অ আ ই ঈ উ ঊ, আদি স্বর বর্ণচয়
ক খ গ ঘ বর্ণাদি ব্যঞ্জন সমুদয়,
তোমার মহিমাগুণে শীঘ্র যেন শিখি
শতকিয়া পণকিয়া গণিতাঙ্ক লিখি।
বিদ্যার মন্দিরে পরে প্রবেশি সকলে:
সুখে থাকি তোমার কৃপায় ক্ষিতিতলে।

(২)

এক বিন্দু (ং) অনুস্বর বিসর্গ বিন্দু দুই (ঃ)
চন্দ্রবিন্দু চাঁদের উপর ˘ বিন্দু থুই ;
বর্ণের উপরে র লিখিবার বেলা
রেফের আকার ধরে এইরূপে হেলা (´)
অল্পচ্ছেদে কমা চিহ্ন এইরূপে (,) আঁকে
বেশী চ্ছেদে সেমিকোলন বিন্দু দিয়ে থাকে (;)
পূর্ণচ্ছেদে দাঁড়ি চিহ্ন (।) কথা সাঙ্গ তায়,
পয়ারে দুদাঁড়ি চিহ্ন (॥) কভু দেখা যায় ।

অ ই উ ঋ ৯ এই পঞ্চ লঘুস্বর
হল বর্ণযোগে ি ু ৃ রূপান্তর ,
ব্যঞ্জনের অন্ত নাম হলবর্ণ হয়,
অ ই উ ঋ ৯ কারে হ্রস্ব স্বর কয় ।

আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ গুরুস্বর
া ী ে ৈ ো ৌ রূপান্তর
া ী রূপান্তর যুক্ত হলে
আ ঈ ঊ একটীরে দীর্ঘস্বর বলে ।

(৩)

জয় জয় দয়াময় জগতের পতি
বালকেরা তব পদে করিছে প্রণতি ।

বর্ণমালা পরে লিখি বানান এখন
দয়া কর দয়াময় দিয়া শ্রীচরণ।
পিতামাতা শিক্ষকের কাছে যেন কভু
কোন দোষে অপরাধী নাহি হই প্রভু।
সন্ধ্যাকালে সকাল বিকাল দিনমান
ভালবাসে ভালবাসি সকলে সমান।
খেলা করি খেলিবার সময় যখন
পাঠকালে সদা যেন পাঠে থাকে মন।
তোমার স্মরণে সদা থাকে যেন মতি
জয় জয় দয়াময় জগতের পতি।

(৪)

নোংরা কথা বল্‌তে নাই।
নোংরা পথে যেতে নাই॥
পথিকে দেখাইও পথ।
বাক্য কাজে হৈও সৎ॥

গালি মন্দ দিও না।
পরদ্রব্য নিও না॥
মামা মাসী পিসে মেসো।
জননীরে ভালবেসো॥
বাঙ্গালী দেখিলে পরে।
ভিক্ষা দিও দয়া করে॥

তোমা হতে দুঃখী যেই।
তারে কষ্ট দিতে নেই॥
অতিথি আইলে ঘরে।
সেবা করো যত্ন করে॥

(৫)

রাত নাই উঠ ভাই প্রভাত রজনী
মন্দ মন্দ সমীরণ খেলিছে আপনি।
চেয়ে দেখ পূর্ব্ব দিক জবার বরণ
তরু ডালে গৃহচালে পড়িছে কিরণ॥
পাখিগণ করে গান আম্রবন ময়
লুতাজালে মতি জলে কিবা শোভা পায়।
ইত্যাদি—

অনন্তপথের যাত্রী কবির 'স্বজন আশ্রিতগণে'র জন্য অর্থ উপার্জ্জনের এই শেষ চেষ্টা দেখিয়া কাহার হৃদয় দুঃখে বিগলিত হইবে না?

হেমচন্দ্রের তৃতীয় ভ্রাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এ এ সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয় ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রও দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় হেমচন্দ্রের হৃদয় একেবারে ভগ্ন

হইয়া পড়িল। হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা বিনোদবিহারী রোজনামচায় লিখিয়াছিলেন—

December 7, 1900—Received sad intelligence from Kidderpore of Poorna Babu having died yesterday morning. Truly as Hem Babu writes, "What can be more sorrowful that this?" His last letter to me was dated 13th Nov. Sorry I could not see him.

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ভগিনী নৃত্যকালীর কন্যা মৃণালিনীর মৃত্যুতেও হেমচন্দ্র ভয়ানক আঘাত-প্রাপ্ত হন। পরবৎসর তিনি আরও একটি ভীষণ শোকের আঘাত প্রাপ্ত হন—তাঁহার আদরিণী জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলাদেবীর মৃত্যুতে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে সুশীলাদেবীর অন্যতম পুত্র প্রবোধ যক্ষ্মারোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। ইনি হেমচন্দ্রের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তখন সুশীলাদেবী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। প্রবোধের মৃত্যুর পরদিবস সুশীলাদেবীর একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় এবং তৃতীয় দিনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

নৃত্যকালী দেবী

প্রসূতি ও সূতিকা রোগে ভুগিয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দে (বাঙ্গালা ১৩০৯, ২৭শে ভাদ্র) স্বর্গারোহণ করেন। হেমচন্দ্র এই সংবাদ শ্রবণমাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। এই ঘটনার পর হেমচন্দ্র আর কয়েকমাস মাত্র জীবন্মৃত অবস্থায় ধরাধামে বর্ত্তমান ছিলেন। সুশীলাদেবীর স্বর্গারোহণের পর হইতে হেমচন্দ্রের স্বাস্থ্য অতি দ্রুতভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তিনি ইদানীং অহিফেন সেবন করিতেন। তাঁহার মূত্রযন্ত্রের রোগ হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে মল মূত্রাদি নিঃসরণ হইত না। এই প্রসঙ্গে হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র অতুলচন্দ্রের রোজনামচা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

১৩০৯।৮ ফাল্গুন। বাবার কম্প দিয়া জ্বর হয়।

৯ই ফাল্গুন। শনিবার ভোররাত্রে ৩টার পর বাবার প্রস্রাব বন্ধ হইয়া ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছিল, এই জন্য সত্য ডাক্তার ১০ই ফাল্গুন রবিবার দিনই প্রস্রাবদ্বারে সলা দিয়া প্রস্রাব করাইবার চেষ্টা করেন তাহাতে ঈষৎ প্রস্রাব হয়। ক্রমশঃ বড় কঠিন হয়ে উঠায় ভবানীপুরের নীলমণি ডাক্তারকে আনান হয়। বাবার ব্যায়রাম জন্য ট্যাপা আসে।

১৭ই—বাবার ব্যারাম জন্য আমার ছোট ভগ্নী তনী তার পুত্রকে লইয়া পাইকপাড়া হইতে আসে।

২১শে—Dr. Murray সাহেব of Medical College আনা হয় ও তৎসঙ্গে ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় থাকেন।

১৯ শে চৈত্র। বাবার জ্বর হঠাৎ অধিক হয় সেজন্য Dr, Harris of Medical College আসেন।

১৩০৯ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে তাঁহার রোগ বাস্তবিকই আশঙ্কাজনকরূপে বৃদ্ধি পায়। তিনি এই সময়ে বন্ধু উমাকালী দ্বারা একটি 'উইল' প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা বিনোদ-বিহারীকে জেষ্ঠ পুত্রের ন্যায় দেখিতেন। পুত্রগণ উচ্ছৃ-ঙ্খল বলিয়াই বিনোদবিহারীকেই তাঁহার অভিপ্রায় মত বিষয়াদির ব্যবস্থা করিবার সমস্ত ভার প্রদান করেন। ৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে ফেব্রুয়ারি দিবসে বিনোদবিহারী রোজনামচায় লিখিয়াছেন—

Went to Khidirpore to see Hem Babu who was ill. He began to cry when I went before him. Read out to him draft of a will drawn up by Umakali Babu. He

approved with certain modifications. I am to be the sole executor. He is seriously indisposed.

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে তারিখে (বাঙ্গালা ১৩১০ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিবা ৯ ঘটিকার সময় তাঁহার খিদিরপুরস্থ ভবনে হেমচন্দ্র দেহরক্ষা করেন। * কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ হিতবাদীতে কবির মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"নৈশ গগনে অপূর্ব্ব দীপ্তি-প্রকাশে ক্ষণমাত্র ক্ষণ-প্রভা তমোনাশ করিয়া যেমন অনন্তে মিশিয়া যায়, অলৌকিক প্রতিভা প্রকাশে অন্ধতমসাচ্ছন্ন বঙ্গভূমি অল্পক্ষণের জন্য সমুজ্জ্বল করিয়া আমাদিগের হেমচন্দ্রও সেইরূপ অনন্তে বিলীন হইলেন।

---

* হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রের রোজনামচা হইতে কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধার যোগ্য।—

১৩১০।৮ জ্যৈষ্ঠ বাবার অসুখ হয়।

১০ই জ্যৈষ্ঠ। বাবার গত কল্য হইতে প্রস্রাব বন্ধ হইয়া গলায় বলিতে ঘা ও শোথ হইয়া আহার বন্ধ হইয়া ইত্যাদি হইতে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শেষে অদ্য বেলা ৯টা ১০ মিঃ সময়—দ্বাদশী—রবিবার—গঙ্গালাভ করেন।

"এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা আমাদিগের দেশে বলিয়া নহে, জগতে বিরল। উন্নত চরিত্রের আদর্শচিত্র প্রদর্শনে, কল্পনার উচ্চতায় ভাবসন্নিবেশের পারদর্শিতায়, চিত্তবৃত্তির বৈচিত্র্য অনুসরণে, তাঁহার ক্ষমতা সর্ব্ববিষয়েই অনন্যসাধারণ ছিল। কি গাম্ভীর্য্যে, কি পরিহাস রসিকতায়, কি স্বদেশানুরাগে, কি ভক্তিভাবে কোন্ বিষয়ে হেমচন্দ্রের প্রতিভা প্রকাশ পায় নাই তাহা বলা যায় না। হেমচন্দ্রের স্বদেশানুরাগ কৃত্রিম ছিল না। তিনি যখন দেশের দুঃখ অনুভব করিতেন, উন্নতির পথ দেখাইয়া দিতেন, তখন তাঁহার প্রাণের কথা বাহির হইত, কথাগুলি কাজেই মর্ম্মস্পর্শী, অসার বচনবিন্যাসের ন্যায় ভাসিয়া যায় নাই, যে পড়িয়াছে তাহারই হৃদয় বিচলিত করিয়াছে, তথাপি তাঁহার প্রাণে তৃপ্তি হয় নাই, আশা মিটাইয়া প্রাণের কথা তিনি শুনাইয়া যাইতে পারেন নাই—হৃদয়ের আবেগে বলিয়া গিয়াছেন—'ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর, নতুবা শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার।' হায়, সে বীণাঝঙ্কার এতদিনে নীরব হইল।"

মধুসূদনের স্বর্গারোহণের পর সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে রাজটীকা পরাইয়া সদর্পে হেমচন্দ্রকে মহাকবির সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন, সমস্ত বঙ্গবাসী কাব্য-

সাম্রাজ্যের সেই নূতন সম্রাটকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু হেমচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর সে সিংহাসন কে অধিকার করিলেন? একজন বঙ্গ মহিলা বিলাপ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

হে বঙ্গ-কোবিদ-কুল-রাজ-রাজেশ্বর।
কারে দিলে সিংহাসন স্বর্ণবীণা আর?
পতিত ভারত তরে
কাঁদিতে কাতর-স্বরে
"এখনো জাগরে" বলি করিয়া ঝঙ্কার
জাগাতে জগতবাসী কারে দিলে ভার?
অলস জ্যোছনা রাতে কুসুম শয়নে,
প্রণয়িনী চিত্র আঁকি কল্পনা স্বপনে,
ফুলের পরশ মাখা
অঙ্গে পুষ্পরেণু ঢাকা
বামে পুষ্পময়ী চাহে 'মদিরা নয়ানে,'
বসিবে সে সব কবি তব সিংহাসনে?
অথবা যে পুরাণের পবিত্র আকৃতি
আঁকিছে সাহস ভরে করিয়া বিকৃতি,
শোক বার্দ্ধক্যেতে যাঁর
হয়েছে কবিত্ব ভার,
কালবশে পূর্ব্ব বিভা এবে ম্লান ভাতি,
কবি সিংহাসনে তাঁরে বসিবে ভারতী?

নবম পরিচ্ছেদ

—:*:—

উপসংহার।

হাইকোর্টে শোক প্রকাশ। হেমচন্দ্রের মৃত্যুসম্বাদ বিদ্যুদ্গতিতে দেশময় প্রচারিত হইল। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ এবং প্রাট মহোদয়গণ আসনগ্রহণ করিলে (২৪শে মে ১৯০৩) তদানীন্তন প্রধান সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত রামচরণ মিত্র সি-আই-ই তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"I have just been informed by Babu Umakali Mukharjee that Babu Hem Chandra Banerjee who for many years practised before the Hon'ble Court and was latterly the Senior Government Pleader of this court died yesterday at his residence at Kidderpore. The sad event took place yesterday at 8 o' clock in the morning and

was due to fever attended with unconsciousness. The deceased was so well known to your Lordships that it is hardly necesary to say that he enjoyed the reputation of being a successful pleader of this Court for several years. He conducted his cases with great ability. He was always fair to his adversaries and he always discharged his duties to the satisfaction of his clients: Outside the Court also he had the reputation of being a very able writer. His poems would bear comparison with the best poems of any other country and his writings show that he was possessed of independent and deep thought. His loss will not only be mourned by the members of our profession but also by the outside public. On his retirement he was not in affluent circumstances and considering that he was suffering from loss of sight death no doubt
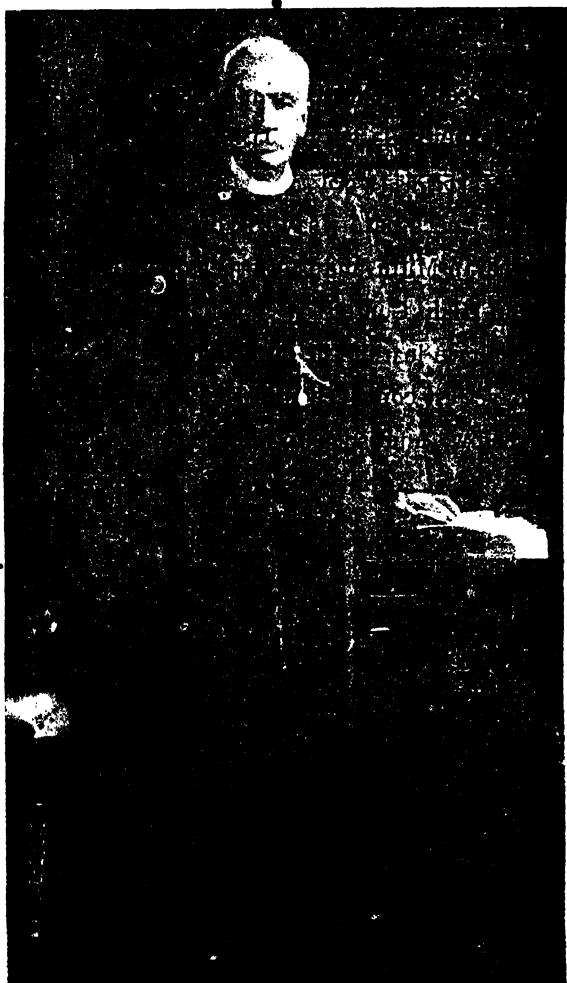
has been a relief to him; but the loss to the country is very great."

স্যর চন্দ্রমাধব প্রত্যুত্তরে বলিলেন :—

"I need hardly say to you, Babu Ram Charan Mitra and the other members of the High Court Bar, appellate side, that we have learnt the intelligence that you have just conveyed to us with very great sorrow, and speaking for myself, I must say that I have been taken rather by surprise that Babu Hem Chandra Banerjee should have passed away so soon. His death was, no doubt, anticipated for sometime. I went to see him about three weeks ago, if I am not mistaken, and though I found him to be in a very bad condition, yet I did not think, nor did his people think that his death would come off so soon. You have referred to his abilities as a pleader and his good qualities

স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ

as a man and his superior qualifications as a poet. Every word that has fallen from you finds an echo in my heart, and I have no doubt in the heart of my learned colleague. He was, if I may say so, an exceptional man. He had many virtues and the manner in which he discharged his onerous duties as a Vakil of this Court always commanded the esteem and admiration of the Judge before whom he had the honour of practising, so much so that at one time he was talked of as being one of the future Judges of this Court. His loss I have no doubt will be felt not only by the members of the Appellate Side of the High Court Bar but by all those with whom he came in contact, and I am sure his loss will be keenly felt by the literary world. We desire to offer a sincere condo lence to the family of the deceased. It

is an irreparable loss to them, and I have no doubt that every one who had the pleasure of knowing Babu Hem Chandra Banerjee will sympathise with his family."

হাইকোর্টের উকীলসভার প্রযত্নে 'বারলাইব্রেরীতে' হেমচন্দ্রের একটি সুন্দর তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শোকগীতি ও শোকসূচক প্রবন্ধাবলী।

কেবল হাইকোর্টে নহে, সমগ্র বঙ্গদেশে হেমচন্দ্রের মৃত্যুজনিত শোকের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। মাননীয় স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম :—

"যেখানেই বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত আছে সেইখানেই বাঙ্গালার বিখ্যাত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু-সংবাদ অকৃত্রিম শোকের সঞ্চার করিবে। মাইকেলের বন্ধু ও জীবনচরিতলেখক, বঙ্কিম এবং দীনবন্ধুর সখা, স্বর্গগত কবি অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে সংযোগশৃঙ্খল-স্বরূপ বিদ্যমান ছিলেন। কে এমন দেশবাসী আছেন যিনি হেমচন্দ্রের কবিতার আন্তরিক অনুরাগী নহেন? যে উদ্দীপনাময়ী জাতীয় কবিতা বাঙ্গালীজাতির নিকট

হেমচন্দ্রের নাম নিত্যস্মরণীয় করিয়াছে, অন্য কোন্ বাঙ্গালী কবির কোন্ কবিতা তদপেক্ষা খ্যাত ও জনাদর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে? তাঁহার বিখ্যাত অগ্রগামী মাইকেলের ন্যায় স্বর্গগত কবি ব্যবহারা-জীবের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অগ্রগামীর ন্যায় ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্য হন নাই। পরন্তু প্রভূত সাফল্য লাভ করিয়া অবশেষে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রধান সরকারী উকীলের ঈপ্সিত পদলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের এই 'পাপপূর্ণ ধরা' হইতে 'চির আলোকের দেশে' বাঙ্গালার অন্ধ কবির প্রয়াণে যে হাইকোর্টে মাননীয় বিচারপতি-গণ সময়োচিত শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন ইহা অতিশয় শোভন হইয়াছে। বঙ্গজননী শ্রেষ্ঠতম সন্তান-রত্ন-হারা হইলেন। যতকাল বাঙ্গালা ভাষার অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন হেমচন্দ্রের স্মৃতিও উজ্জ্বল থাকিবে।"

বাঙ্গালার সমস্ত ইংরাজি ও বাঙ্গালা সংবাদপত্র সমস্বরে হেমচন্দ্রের গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর 'ইণ্ডিয়ান মিররে' এই প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম :—

" 'প্রতিবাসী' 'বঙ্গবাসী' 'হিতবাদী' এবং অন্যান্য

৺ নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর

বাঙ্গালা সংবাদপত্রে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে সুলিখিত সময়োচিত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। সেগুলিতে একটি কথা বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে, সেটি এই, যে, তাঁহার প্রাণোন্মাদিনী কবিতাগুলিদ্বারা হেমচন্দ্র দেশবাসীর মধ্যে যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তা উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, জীবিত বা মৃত আর কেহই সেরূপ পারেন নাই। বিশেষতঃ তাঁহার 'ভারত সঙ্গীত'—যাহাতে তিনি পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গৌরব ও মহিমার সর্ব্বোচ্চ শিখর হইতে বর্ত্তমান অবনতির অতল গহ্বরে পতিত দেশবাসীকে তাহাদের যথার্থ অবস্থা স্মরণ করিতে ওজস্বিনী ভাষায় অনুরোধ করিয়াছেন—তাহা এই প্রবন্ধ-লেখকগণের মতে অমূল্য এবং স্কটের, টম মুরের এবং ক্যাম্বেলের প্রসিদ্ধ জাতীয় সঙ্গীতগুলির সহিত তুলনীয়। তাঁহারা একথা আরও বিশেষভাবে বলিতেছেন যে, বাঙ্গালা সাহিত্যে ও কাব্যরাজ্যে তিনি যে সিংহাসন শূন্য করিয়া গেলেন তাহা আর কখনও পূর্ণ হইবার নহে—এবং জীবিত কবিদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যাঁহার নাম তাঁহার নামের সহিত উচ্চারিত হইতে পারে কিংবা যিনি তাঁহার পরিত্যক্ত সিংহাসনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলিয়া বিবেচিত

হইতে পারেন। তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালার সেই শেষ মহাকবির অদ্ভুত মহত্বের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন—যিনি অতুল ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়াও দরিদ্র ভিখারীর ন্যায় ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন!"

এই সময়ের সাময়িক পত্রাদি পাঠ করিলে বুঝা যায় হেমচন্দ্র বঙ্গবাসীর হৃদয়ে কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মাসিকপত্রাদিতে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে এত শোকগীতি ও শোকসূচক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল যে তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমরা এইস্থলে দুই চারিটী কবিতা মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

সুকবি বরদাচরণ মিত্র হেমচন্দ্রের একজন পরম অনুরাগী ছিলেন। তিনি হেমচন্দ্রকে আধুনিক কবি-গণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার একখানি কাব্যগ্রন্থপ্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—উহার নাম রাখিয়াছিলেন "হৈমী"। উহার প্রারম্ভে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিত কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত করিবেন মনঃস্থ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'নব্যভারতে' বরদাচরণ 'অন্তর্ধান' শীর্ষক যে কবিতাটি প্রকাশিত করেন তাহাই সর্ব্বাগ্রে উদ্ধৃত করিব।

হেমচন্দ্র

অনন্ত গম্ভীর নীল অম্বর বিদারি,
মণ্ডিত স্ফুরৎ-প্রভ তড়িৎ কেয়ূরে
বাহিরিল শ্বেতবাহু, ঝলসি নয়ন
দীপ্তি-শুভ্র বহ্নিতেজে। অদূরে যথায়
ভাস্বর তপন কান্তি হেমচন্দ্র কবি
বঙ্গ কাব্যাকাশে রাজে, ঢালি জ্বালাময়
কিরণ প্রপাত. যাহে ঘুরিছে ফিরিছে
উজলি রয়েছে ঊর্দ্ধে চারু ইন্দ্রধনু
কল্পনার মহাবর্ত্ত, দিগন্ত আলোড়ি,
সেই দিকে গতিশীল সে প্রদৃপ্ত বাহু.
ছুটাইয়া ব্যোমঊর্ম্মি স্ফুলিঙ্গরচিত।

অমনি বিমানমার্গে অশনি-নিঃস্বনে
ধ্বনিল গম্ভীর বাণী জড় বিজড়িত,
"প্রতিভার দীপ্ত সূর্য্য! পার না সহিতে
সৌর কলঙ্কের ভার অমঙ্গল সূচি,
কালিমা নিবিড় যাহে মূঢ় উপেক্ষায়,
অকৃতজ্ঞ পূজা ব্যতিক্রমে? এস তবে,
জড় যেথা চিৎ, আর কলঙ্ক মণ্ডন।"
স্তম্ভিত মরতবাসী সে রুষ্ট নিনাদে।
না খুলিতে আঁখি পাতা বিহ্বলে মুদিত
না মিলাতে প্রতিধ্বনি চক্রবাল-সীমে,
গ্রহিল সে দিব্যহস্ত নিমেষ-মাঝারে,

হেমচন্দ্র

দীপ্তি শস্তুশূল সম অঙ্গুলিতে যিনি
বঙ্গ কবিতায় সূর্য্য। কিম্বা যেন কোন
করুণার শুভ্ররাহু গ্রাসিল তাহায়।
বঙ্গভূমিলগ্ন পদ উর্দ্ধনেত্র যত
নরনারী দেখিল সে আকাশে চাহিয়া।
সেই চিরপরিচিত উজ্জ্বল পরিধি,
কোথা এবে? কোথা সেই প্রণম্য মহিমা?
মুণ্ডমাত্র, শিথিলিত কপিশ গগনে
আকুঞ্চিত শ্বেতবাহু, জ্বলন্ত ভয়াল,
বিধাতার ক্ষুরদগ্নি ভ্রুকুটির মত।

ত্রাসিত অযুত হৃদে শোণিত প্রবাহ
সহসা থামিল, যেন আকুল আবেগে;
অনুতাপ অশ্রুযুত অযুত নয়ন;
উচ্ছ্বসিত অবরুদ্ধ অযুত কণ্ঠেতে
তপ্তশ্বাসে অর্দ্ধস্ফুট "হেমচন্দ্র কোথা।"
জানু পাতি উর্দ্ধনেত্রে যতেক পরাণী
বসিল যাচিবে বলি কাতরে করুণা।
ভয়ে, গুরু পরিতাপে, স্মৃতির দংশনে।
অর্চ্চনায় ত্রুটি-জাত কঠিন পাতকে,
প্রকট বিধাতৃ-রোষে বিরাট বিয়োগে,
যুগপৎ উদ্বেলিত যতেক হৃদয়।
কি বচনে রচিয়া সে বিবিধ বেদনা

নিবেদিবে দেবতার বেদীপাদ পাটে,
নাহি জানে, নিরাশার ভাষাহীন মোহে,
স্থাপিত কাতর দৃষ্টি কপিশ আকাশে।
আবার জীমূত মন্দ্রে দীর্ণ নভস্থল,
করালীর জিহ্বা শত ক্রূর সৌদামিনী,
স্ফুলিঙ্গিয়া রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকান আবার,
আবার ধ্বনিল বাণী শূন্যপথ হতে,
"ভাগ্যহীন বঙ্গদেশ। ভুঞ্জিছ কি এবে
নিজকর্ম্মফলজাত পাতক যাতনা?
ক্ষরিছে কি শোণিতাশ্রু, স্রোতে গণ্ডে বহি,
হৃৎপিণ্ড ফাটি ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড আঘাতে?
ধ্রুব সত্য, পরিতাপ পাপ মহৌষধি।

হেমচন্দ্র লুপ্ত নহে, লুক্কায়িত শুধু;
তব দৃষ্টিযোগ্য কভু সেই দিব্যবিভা?
নিষ্কলঙ্ক কর আঁখি; স্বার্থমুক্ত হৃদি;
ব্রত ধরি, মহাভাবে পুষ্ট করি প্রাণ,
কর তায় ভক্তিপূত, অর্চ্চণা প্রবণ,
ভাবিতে নয়নে পুনঃ সেই মহাগ্রহ।
ভাস্বর তপন কান্তি হেমচন্দ্র কবি
বঙ্গের কবিতাকাশে চির জ্যোতিষ্মান।"
থামিল ভৈরব রব; নিবিল সহসা
দীপ্ত সেই শ্বেতবাহু গগন মাঝারে;

নিবিড় রজনী আসি গ্রাসিল সংসার।
মাস্ত্রীভূত অন্ধকার, মসীবিন্দু হয়ে,
কলঙ্ক বরষা ঢালে বঙ্গের বদনে ;
অধোমুখে, অন্ধভাবে, কৃষ্ণ ঝটিকায়,
সপ্ত দিবানিশি বঙ্গ কাঁদিল নীরবে।

সুপরিচিত সাহিত্যিক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছিলেন—

ঘুমাও মৃত্যুর কোলে, হে সিদ্ধচারণ,
ঘুমাও নিশ্চিন্তে কবি, ভারত-গৌরব-রবি,
ঘুমাক তোমার সনে বিস্মৃতি মগন ;
ঘুমাও মৃত্যুর কোলে হে সিদ্ধচারণ।

ঘুমাও অমর কবি অনন্ত শয়নে
অনন্ত কালের কূলে কীর্ত্তি কল্পতরু মূলে,
অনন্ত নয়ন মুদে যশের স্বপনে
ঘুমাও অমর কবি অনন্ত শয়নে।

হায়রে নীরব বীণা কে বাজাবে আর,
তুলিবে স্বাধীন তান, গাইবে গভীর গান,
শবদেহে নব প্রাণ করিবে সঞ্চার,
হায়রে নীরব বীণা কে বাজাবে আর!

হেমচন্দ্র

মানবের কণ্ঠে গান জন্মে দেব বরে।
শুনেছিল সেই গান অবশ্য অপরে।
বুঝিবা জাপানে কেউ
নিয়ে গিয়েছিল ঢেউ,
'অসভ্য' জাপানী তাই আজি বজ্রপাণি।
পাশ্চাত্য জগৎ মত্ত মহিমা বাখানি॥

মধুদত্ত মৃত্যুশোকে প্রবোধিতে মনে।
বঙ্কিম বসালে যারে দর্পে সিংহাসনে॥
চক্ষু অর্থ নষ্ট ক'রে,
সে হেম গেছে গো ম'রে,
দুর্ভাগ্য দশায় ক'রে গ্রহদোষে ভর।
রেখেছিল দেহখানা এ কয় বছর॥

বিধিরে বুঝায়ে বুঝি আজি সরস্বতী,
পুত্রের প্রেতত্ব নাশি করালেন গতি॥
চুপি চুপি চল ভাই
খাটে তুলে ঘাটে যাই,
মরা মড়া পোড়াইতে কাজ নাই গোল।
মনে মনে কাঁদ বল ধীরে হরিবোল॥

বাঙ্গালা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও "প্রদীপে" কবিগুরু

হেমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন ;—

হেমচন্দ্র অস্ত গেল অনন্তের কোলে
বঙ্গ কাব্যাকাশ হতে, গেল কবি চলে'
দিব্যধামে, অন্ধতার দারুণ আঁধার
সেথা নাই, দারিদ্র্যের ভীষণ আকার
সেথা নাহি যায় দেখা। সেথা শুধু আলো,
স্বচ্ছলতা সুখশান্তি যত কিছু ভাল।
যাও কবি রাখি পিছে গুঞ্জরিত গানে
বাণীপদ কোকনদে, মত্ত মধুপানে।
শুনি শুনি সেই গান ভারত নিদ্রিত
যদি জাগে কোন দিন, তা হ'লে নিশ্চিত
তুমি তব স্বর্গ ছাড়ি অন্য কবিমুখে
আবার গাহিবে গান। যার সুখে দুখে
যে কবির হৃদি-তন্ত্রী করিবে ঝঙ্কার
জন্মভুমি-দুঃখাতুর তব আত্মা তাঁর।

আমরা আর একটি মাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিব। হেমচন্দ্রের মৃত্যুর বহুদিন পরে প্রকাশিত হইলেও বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্যরচয়িতা অক্ষয়-কুমার বড়াল মহাশয়ের এই সুন্দর চতুর্দ্দশপদী কবিতাটী এইস্থানে উদ্ধৃত করা অশোভন হইবে না :—

হে কবি, হে পূজ্য কবি, চির-দুঃখিনীর
ভক্তিমান্ কীর্ত্তিমান্ কৃতজ্ঞসন্তান।
অন্ধনেত্র—আজীবন ঢালি নেত্রনীর
ক্রীতদাসী জননীর হেরি' অসম্মান।
অক্ষরে অক্ষরে তব হৃদয়-রুধির
কি গৌরবে মহাযজ্ঞে করিছে আহ্বান।
নিরাশা নির্ভীক আহ—বিশ্বাস গভীর,
অন্ধ বর্ত্তমান হেরে ভবিষ্য মহান্।

হে দরিদ্র, একদিন ক্ষোভে শোকে দুখে
আলোড়িলে জীবনের উদ্দেশ্য অতল।
হে অমৃত, তব যশোমুকুট-ময়ুখে
জটিল কর্ত্তব্য আজ সরল উজ্জ্বল।
স্বর্ণ সিংহাসনে নৃপ দু'দিন জীবনে
চির প্রতিষ্ঠিত তুমি বঙ্গ-হৃদাসনে।

স্মৃতি সভা। হেমচন্দ্রের মৃত্যুতে তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ বাঙ্গালার সমস্ত প্রধান-প্রধান নগরে স্মৃতিসভা আহূত হইয়াছিল। ইতঃ-পূর্ব্বে আর কোনও সাহিত্য-সেবকের মৃত্যুতে এরূপ দেশব্যাপী শোকের প্রবাহ পরিদৃষ্ট হয় নাই। হেমচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি এইরূপ সম্মান প্রদর্শন

অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ আর কোনও কবি ইতঃপূর্ব্বে জাতীয় ঐক্যসাধনার্থে তাঁহার ন্যায় প্রয়াস পান নাই বা তাঁহার ন্যায় সাফল্য লাভ করেন নাই। কলিকাতা মহানগরীতেই অনেকগুলি বিরাট শোক সভা আহূত হইয়াছিল। আমরা কয়েকটি মাত্র সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করিব।

(ক) 'সাহিত্য সম্মিলনে'র উদ্যোগে—কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ২৯ জ্যৈষ্ঠ (১৩১০) ক্লাসিক থিয়েটারে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। থিয়েটার গৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাগমে সভা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। সভাধিবেশনের প্রথমেই সুকবি বিহারীলাল সরকার রচিত একটি সঙ্গীত সুগায়ক অমৃতলাল সর্ব্বাধিকারী কর্ত্তৃক গীত হয়। তৎপরে 'সাহিত্য সম্মিলনের' স্থায়ী সভাপতি, ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রের সুবিখ্যাত সম্পাদক রায় নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় একটি সুলিখিত বক্তৃতা

পাঠ করেন। এই সভায় যোগদান করিবার জন্য তার-যোগে অনুরুদ্ধ হইয়া রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। ইনি কবিবরের জীবিতকালে তাঁহার বিপন্ন অবস্থায় সাহায্য করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া মফঃস্বলের মধ্যে ঢাকায় প্রথম সভা আহ্বান করিয়া কবিবরকে প্রথম সাহায্য করেন। ইনিই সভাপতি পদে বৃত হন। অতঃপর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সভায় গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব—"কবিবর হেমচন্দ্রের পরলোকগমনে এই সভা গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকাকুল পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন। এই প্রস্তাবের অনুলিপি তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

প্রস্তাবক।—কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন।

সমর্থক। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল।

শোকসমবেদনাজ্ঞাপক প্রথম প্রস্তাব সর্ব্বজনসম্মতি-ক্রমে পরিগৃহীত হইবার সময় রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কহিলেন,—"এই প্রস্তাব পরিগ্রহণকালে কবিবরের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ আমাদের সকলের দণ্ডায়মান হওয়া কর্ত্তব্য।" সভাস্থ সকলে তৎক্ষণাৎ

রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর

দণ্ডায়মান হইলেন। ইহার পর দ্বিতীয় প্রস্তাবের অবতারণা হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।—"কবিবর হেমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন অক্ষয় রাখিবার নিমিত্ত 'হেমচন্দ্র-স্মৃতিভাণ্ডার' নামে একটী স্বতন্ত্র ভাণ্ডার স্থাপিত হউক। এই ভাণ্ডারের অর্থসংগ্রহাদি ও কার্য্য-ব্যবস্থার নিমিত্ত বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের চেষ্টায় যে মহতী সভার আয়োজন হইতেছে, 'সাহিত্যসম্মিলন তাহার সহিত মিলিত হইয়া একযোগে কার্য্য করিবেন।

প্রস্তাবক।—শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমর্থক।—রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর।

অনুমোদক। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

অতঃপর সভাপতি রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় একটি সময়োচিত বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর বিহারীলালের আর একটি সঙ্গীত গীত হয়। সর্ব্বশেষে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর সমর্থনে সভাপতি রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে (ঢাকা হইতে আসিয়া এই সভায় যোগদান জন্য), রায় নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে (সাহিত্যসম্মিলনের স্থায়িসভাপতিরূপে

সভার কার্য্য-নির্ব্বাহ-কল্পে সমূহ সাহায্য জন্ত), অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে (বিনাখরচায় মায় গ্যাসের খরচাটী পর্য্যন্ত না লইয়া তাঁহার ক্লাসিক থিয়েটারে সভার অধিবেশন-স্থান প্রদান করায়) এবং পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে (সভার কার্য্য নির্ব্বাহে যথেষ্টভাবে সাহায্য করায়) ধন্তবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়। সভাভঙ্গের সময় আর একটী সঙ্গীত গীত হয়। সন্ধ্যা ৭টা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য চলিয়াছিল। কিন্তু এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত, সভা মন্ত্র-মুগ্ধের ন্তায় নীরবে কার্য্য সম্পাদনে যোগদান করিয়াছিল।

(খ) সাহিত্যসভা'র উদ্যোগে—রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে হেমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা হইয়াছিল। ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ (ইং ১৪ই জুন ১৯০৩) সাহিত্যসভার ৪র্থবার্ষিক ১ম অধিবেশনে ৺হেম-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মরণার্থ 'সভার' কি করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, কিঞ্চিৎ আলোচনার পর পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে,—

হেমচন্দ্র

১।—কবিবরের জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁহার গ্রন্থাদির সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ, সভার কোন অধিবেশনে পঠিত হউক ও সেই প্রবন্ধ, 'সাহিত্য-সংহিতায়" মুদ্রিত হউক।

২। এই সভার পক্ষ হইতে ৺কবিবরের কোন স্মরণ-চিহ্ন সভাগৃহে স্থাপনের চেষ্টা করা হউক। পরে পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্.এ মহাশয়ের প্রস্তাব সম্বন্ধে স্থির হইল যে, ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষা সম্বন্ধে যে সকল প্রকাশ্য সভার অধিবেশন হইতেছে, তাহার সহিত "সাহিত্যসভার" সমবেদনা আছে।

প্রথম প্রস্তাব অনুসারে সাহিত্যসভার ৩য় অধিবেশনে (৩রা শ্রাবণ ১৩১০ ইং ১৯শে জুলাই ১৯০) রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত "বঙ্গসাহিত্যে হেমচন্দ্র"-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি ১৩১০ সালের 'সাহিত্যসংহিতা'য় ও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতাকারে "প্রদীপে" প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধপাঠান্তে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী, পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং

রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর

সভাপতি পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রত্যেকে এক একটি বক্তৃতা করেন। তৎপরে দুইটী শোক-সঙ্গীত গীত হইলে এবং শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু ও পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির প্রস্তাবে সভাপতি, প্রবন্ধপাঠক, প্রভৃতিকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইলে সভাভঙ্গ হয়।

সাহিত্যসভার উদ্যোগে হেমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য ১১৯৭/১০ সংগৃহীত হয়। সাহিত্যপরিষদও একটি বিরাট সভা আহ্বান করিয়া এই উদ্দেশ্যে অর্থ-সংগ্রহ করিতেছিলেন এবং অনেকের ইচ্ছা হয় সমস্ত টাকা একত্র করিয়া একটী উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হয়। রাজা বিনয়কৃষ্ণ ৩০০৲ চাঁদা দিয়াছিলেন। তিনি নিজের অভিপ্রায়ানুসারে কবির স্মৃতিরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ঐ টাকা পুনর্গ্রহণ করেন। এবং সাহিত্যসভা হইতে "Hem Chandra Memorial Series" নাম দিয়া কতকগুলি পুস্তিকা প্রকাশিত করেন।

(গ) 'সাহিত্য-পরিষদে'র উদ্যোগে—স্বর্গীয় কবিবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ একটি সাধারণ শোক সভার অধিবেশন হয়। সম্প্রতি-

পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাক্ষরিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রে সাধারণকে এই সভায় যোগদান করিতে অনুরোধ করা হয়।

কলিকাতা
১৩১০ বঙ্গাব্দ, ১৩ই আষাঢ়।

সবিনয় নিবেদন,—

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালা সাহিত্য অশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও বঙ্গবাসী মাত্রেই অতিশয় শোকসন্তপ্ত। আগামী ১৮ই আষাঢ় ১৩১০, ৩রা জুলাই ১৯০৩, শুক্রবার অপরাহ্ণ ৬॥ টার সময় পটলডাঙ্গা, হ্যারিসন রোড চৌরাস্তার উপর ওভার টুন হলে একটি সাধারণ শোকসভার অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, সি এস্ আই, মহোদয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন। মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক যথাসময়ে সভায় উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্যে যোগদান করিলে অনুগৃহীত হইব; ইতি।

বশংবদ
স্বাঃ শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর।
৺হেমবাবুর শোক সভার
কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

উক্ত বিজ্ঞাপনানুসারে যথাসময়ে ওভারটুন হলে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, সি-এস-আই মহোদয় অদ্যকার সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।

প্রস্তাবক—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-এ।

সমর্থক—বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—

মহাকবি ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীয় অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যের শোভা ও সমৃদ্ধি সম্পাদন এবং বাঙ্গালীর অবসন্ন জাতীয় জীবনে উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার লোকান্তর গমনে বঙ্গ সাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত, এবং সমগ্র বঙ্গবাসী শোকসন্তপ্ত। অদ্য বঙ্গের সকল সম্প্রদায় এই সভায় সমবেত হইয়া তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর।

সমর্থক—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্ এ, ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

তৃতীয় প্রস্তাব—

মহাকবি ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের প্রতি এই সভা আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন এবং স্থির করিতেছেন যে, এই সভার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষর সংবলিত এই মন্তব্যের প্রতিলিপি মহাকবির পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।

প্রস্তাবক—মাননীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্।

সমর্থক—বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এস্।

চতুর্থ প্রস্তাব—

মহাকবি ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্যে সুব্যবস্থা করিবার জন্য নিম্ন-লিখিত মহোদয়গণকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হউক এবং সেই সমিতির সদস্যগণকে প্রয়োজন মত সভ্য-সংখ্যা বর্দ্ধিত করিবার অধিকার দেওয়া হউক।

প্রস্তাবক—নরেন্দ্রনাথ সেন।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

(সমিতির সদস্য প্রায় দুইশত গণ্য মান্য ব্যক্তির নাম এস্থলে অপ্রয়োজনীয় বোধে সন্নিবিষ্ট হইল না।)

পঞ্চম প্রস্তাব—

শ্রীযুক্ত রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, সি এস্ আই, মহোদয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া এই সভাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। সভা তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—উমেশচন্দ্র দত্ত বি এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।

হেমচন্দ্র স্মৃতি রক্ষণ সমিতির চেষ্টায় সর্ব্বসমেত ২১৮১।৶৬ সংগৃহীত হয়। সমিতির ব্যয় ৪৫৲৵৩ বাদে অবশিষ্ট টাকা হইতে কবির স্বর্গারোহণের অনতিকাল পরে স্বর্গগতা কবিপত্নীর শ্রাদ্ধের সাহায্যে ৫০৲ প্রদত্ত হয়। পরে কবিবরের আবক্ষ মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ জন্য ১২০০৲ এবং কবির জীবনী ও গ্রন্থসমালোচনা মূলক প্রবন্ধ (৺অক্ষয় চন্দ্র সরকার লিখিত) খরিদ বাবদ ২০০৲ ব্যয় হয়। বাকী ৫৭৫৶৩ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হস্তে নিম্নলিখিত সর্ত্তে প্রদত্ত হয়—"অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রস্তাবটী সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত করিবেন এবং বক্রী টাকার সুদ হইতে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গদ্য বা পদ্য রচনার জন্য "হেমচন্দ্র বৃত্তি বা পুরস্কার বা পদক প্রদান করিবেন।"

সাহিত্য পরিষৎ ১৪৮৬/ ব্যয়ে অক্ষয় চন্দ্রের প্রবন্ধটি "কবি হেমচন্দ্র" নামে পরিষৎ গ্রন্থাবলী ভুক্ত করিয়া প্রকাশিত করেন এবং বাকী টাকা হইতে প্রতিবৎসর কবিবরের নামে এক একটি স্বর্ণ পদক প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের মর্ম্মরময়ী প্রতিমূর্ত্তিটী অতি সুন্দর হইয়াছে এবং সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের সম্মুখেই উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অক্ষয় চন্দ্রের গ্রন্থখানিতে তিনি কবিবরের জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে যে ব্যক্তিগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা সাহিত্যপরিষদের ন্যায় সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হওয়া উচিত হয় নাই। উহাতে কবিবরের স্মৃতির প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে তাহা অক্ষয়চন্দ্রের অক্ষয় কলঙ্ক স্বরূপ বিবেচিত হইবে। গ্রন্থের ভূমিকায় অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন যে তাঁহার ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পরিষৎ ছয় বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া পরে প্রকাশিত করেন। কোনও সদস্য উহা প্রকাশিত করিতে আপত্তি করিয়াছিলেন কি না জানি না। অক্ষয়চন্দ্র ভূমিকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

"১৩১০ সালের ১০ জ্যৈষ্ঠ কবি হেমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। অচিরকাল মধ্যে কলিকাতায় হেমচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতি

সাহিত্য পরিষৎ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হেমচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তি

প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি রাজা শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে কবি হেমচন্দ্রের জীবনী লিখিতে অনুরোধ করেন। আমি সেই বৎসরের মধ্যেই 'কবি হেমচন্দ্র' লিখিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করি; তিনি আমাকে ২০০ টাকা দেন। ইত্যাদি।"

আমরা যথাস্থানে অক্ষয়চন্দ্রের অন্যায় অভিমতগুলির বিচার করিয়াছি, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। হেমচন্দ্রের প্রতি অন্যায়ভাবে অক্ষয়চন্দ্র যে সকল কলঙ্কের আরোপ করিয়াছেন তাহা সত্ত্বেও রাজা প্যারীমোহনের ন্যায় বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি কিরূপে প্রবন্ধটি পুরস্কারযোগ্য বা প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহা ধারণা করিতে না পারিয়া আমরা কিছুকাল পূর্ব্বে অক্ষয়চন্দ্রের গ্রন্থ হইতে কয়েক স্থল উদ্ধৃত করিয়া রাজা প্যারীমোহনকে এই সম্বন্ধে পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি উত্তরে লিখিয়াছিলেন—

"সাহিত্যসভায় অক্ষয় বাবুকে যে ২০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছিল তাহা তাহাদিগের নিযুক্তির Judge দিগের অভিপ্রায়ে দেওয়া হয়; আমি অক্ষয় বাবুর পুস্তক পড়ি নাই; যে সকল কথা অক্ষয়বাবুর পুস্তক

রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি-এস-আই

হইতে আপনি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হেমবাবুর অন্যায় কলঙ্ক, আমার মতের সম্পূর্ণ বিপরীত।"

ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। প্রবন্ধ বিচারক-দিগের নাম, তাঁহারা অক্ষয় বাবুর প্রস্তাটী পাঠ করিয়া-ছিলেন কি না, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কয়জন সেই সাহিত্যমহারথীর রচনা সম্বন্ধে নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিবার যোগ্য ছিলেন তাহা অনুসন্ধান করাও আমরা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

হেমচন্দ্র পাঠাগার। খিদিরপুরের অধিবাসি-গণ তাঁহাদের প্রিয় কবি হেমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান আমাদের পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় কর্তৃক উক্ত পাঠাগারের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

চরিত্র ও রুচি। আমরা পূর্ব্বেই হেমচন্দ্রের জীবনের বিবিধ ঘটনা ও তাঁহার আচরণাদির কথা লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার চরিত্র ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছি। এক্ষণে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলিব।

হেমচন্দ্র অতিশয় স্বাধীন ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। স্যর গুরুদাস আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ন্যায় উদার প্রকৃতির ব্যক্তি তিনি অতি অল্পই দেখিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় অমায়িক ও অহঙ্কারশূন্য ব্যক্তিও অতি বিরল। তিনি কাহারও অনধিগম্য ছিলেন না। তাঁহার কাব্যে যেমন তিনি মহান্ ও উচ্চ আদর্শ দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবনেও তিনি সেইরূপ উচ্চ ও মহান আদর্শ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আচরণে কৃত্রিমতার লেশ ছিল না। কি পারিবারিক জীবনে, কি সামাজিক জীবনে, তিনি সর্ব্বত্রই যাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহারই হৃদয়পটে তাঁহার মধুর ও উদার চরিত্রের স্মৃতি সমুজ্জ্বল রাখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বার্থপরতা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি কখনও আত্মপর বিচার করেন নাই। স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে একখানি পত্রে আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন, "He (Hem Chandra) was a high-minded gentleman and took pleasure in doing good to others" দাস দাসীগণকে তিনি পুত্র কন্যার ন্যায় পালন করিতেন, তাহাদের সুখে আনন্দিত ও বিপদে ব্যথিত হইতেন। তাঁহার

শ্রীমান্ ললিতমোহন, ও উক্ত শ্রীমান্ অনুকূলের তিন পুত্র শ্রীমান জ্যোতিঃমোহন, মধ্যম শ্রীমান্ কিশোরীমোহন ও কনিষ্ঠ অতি শিশু (এখনও নাম হয় নাই) বর্ত্তমান আছে। ইহারা সকলেই আমার সংসারে আমার পূর্ব্বোক্ত খিদিরপুরের বাটীতে আমার সহিত একত্র বাস করিতেছে। আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা নিম্নের (ক) তপশীলে লিখিত হইল। এবং অস্থাবর সম্পত্তি মধ্যে আমার যে সকল Govt Promissory notes আছে তাহা (খ) তপশীলে লিখিত হইল।

আমার অবর্ত্তমানে আমার ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা হইবে নিম্ন দফা ওয়ারিতে প্রকাশ করিতেছি। এই উইল আমার শেষ উইল বলিয়া গণ্য হইবেক।

১ দফা—। আমার জামাতা অর্থাৎ আমার মৃতা জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলাসুন্দরীর স্বামী শ্রীমান্ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে Executor নিযুক্ত করিলাম। আমার লোকান্তে আমার এষ্টেটের খরচে সম্ভবমত আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করাইবেন এবং এই উইলের Probate লইবেন।

২ দফা। নিম্নের (ক) তপশীলে লিখিত প...

পুকুরের উত্তর পূর্ব্ব কোণস্থিত ২নং পদ্মপুকুর ষ্ট্রীটস্থিত বাটী আমার পূর্ব্বোক্ত বিধবা পুত্রবধূ শ্রীমতী চারুশীলা দেবীকে জীবন স্বত্বে স্বত্ববতী করিলাম, উক্ত বাটীর উপস্বত্ব হইতে তাঁহার যাবজ্জীবন ভরণ পোষণ হইবে। কিন্তু ঐ বাটী তিনি দান বিক্রয় বা কোন প্রকার হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। উক্ত বাটীর Vested remainder আমার উপরিউক্ত তিন বর্ত্তমান পুত্রকে তুল্যাংশে দিলাম।

৩ দফা। (খ) তপশীলের লিখিত আমার যে সকল গবর্ণমেণ্ট প্রমিঃ নোট আছে তাহার সুদ আমার উপরিউক্ত একজিকিউটার আমার পত্নীর চিকিৎসা ও ভরণপোষণে ব্যয় করিবেন এবং যাহা তিনি আবশ্যক ও ভাল বিবেচনা করিবেন তাহাতে ব্যয় করিতে পারিবেন। আমার পত্নীর পরলোক হইলে উক্ত একজিকিউটার ঐ সকল প্রমিঃ নোট সমান অংশে তিন পুত্রকে ভাগ করিয়া দিবেন।

৪ দফা। "ক" তপশীলের লিখিত আমার ভদ্রাসন বাটী ১নং পদ্মপুকুর স্কোয়ার আমার বর্ত্তমান তিন পুত্রকে তুল্যাংশে দিলাম। আমার একজিকিউটার উক্ত বাটী তাহাদিগকে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিবেন; কিম্বা

তাহা বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য তুল্যাংশে ভাগ করিয়া দিবেন। আমার পত্নী বর্ত্তমানে বাটী বিভাগ বা বিক্রয় হইবে না।

৫ দফা। উল্লিখিত ২ ও ৪ দফার লিখিত সম্পত্তি সেওয়ায় অবশিষ্ট সম্পত্তি যাবৎ আমার পৌত্র শ্রীমান্ ললিতমোহন ২১ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত না হন তাবৎ উক্ত এক্‌জিকিউটার স্বীয় দখলে রাখিয়া আদায় তহসিল করিবেন। এবং ঐ সকল সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে আমার উক্ত পৌত্রের ভরণপোষণ ও বিদ্যাশিক্ষার জন্য মাসিক ১৫৲ পনর টাকার অনধিক খরচ করিবেন; অবশিষ্ট টাকা আমার বর্ত্তমান তিন পুত্রকে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিবেন। আমার উক্ত পৌত্রের ২১ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলে এক্‌জিকিউটার ঐ সকল সম্পত্তি আমার ঐ তিন পুত্রকে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিবেন। কিন্তু আমার পত্নী বর্ত্তমান থাকিতে কোন বাটী বিক্রয় বা বিভাগ হইবে না, কেবল উপস্বত্ব বিভাগ হইবে মাত্র।

৬ দফা। যদি আবশ্যক বিবেচনা করেন তাহা হইলে উক্ত এক্‌জিকিউটার আমার স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি ও

স্থাবর সম্পত্তির অংশ যাহা আমায় বর্ত্তে বিক্রয় করিতে পারিবেন।

৭ দফা। "খ" তপশীলের বিবরিত সম্পত্তি ভিন্ন আমার অন্য যে কিছু অস্থাবর সম্পত্তি থাকিবেক তাহা আমার বর্ত্তমান তিন পুত্র তুল্যাংশে লইবেন।

৮ দফা। "খ" তপশীলের লিখিত প্রমিঃ নোট ভিন্ন আমার নিকট ১৮৫৪-৫৫ সালের এক কেতা ৫০০৲ পাঁচশত টাকার গবর্ণমেণ্ট প্রমিঃ নোট আছে। তাহার নম্বর ০৬২৪৫৭। ঐ প্রমিঃ নোট আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অনুশীলাকে দিলাম। ঐ কাগজ আমার ঐ কন্যার সম্পূর্ণ অধিকারে রহিল, দান বিক্রয় সমুদয় করিতে পারিবেন।

৯ দফা। আমার পরলোক গমনের পর এক্‌জিকউটার আমার বাটীর কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন চট্টোপাধ্যায়কে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা ও হরি নামক আমার চাকরকে ১০০৲ একশত টাকা দিবেন।

১০ দফা। আমার পত্নীকে পূর্ব্বে আমি ১০০০৲ এক হাজার টাকা দিয়াছি। ঐ টাকা এক্ষণে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আছে ও হাতচিঠায় জমা আছে। ঐ টাকার উপর আমার স্ত্রীর সম্পূর্ণ

অধিকার রহিল। আমার পুত্রদের তাহাতে কোন অধিকার নাই। আমার পত্নী তাহা ইচ্ছামত সমস্ত দান করিতে পারেন, আমার পুত্রদিগের সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না।

১১ দফা। আমার স্থাবর সম্পত্তি বিভাগাদি করিতে ও অন্যান্য সরঞ্জামি খরচা সমস্ত আমার এষ্টেট হইতে নির্ব্বাহ হইবে।

১২ দফা। আমার একজিকিউটার শ্রীমান বিনোদ-বিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁহার স্থানে যাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন তিনি তাঁহার অবর্ত্তমানে একজিকিউটার হইবেন। ইতি তাং ১৩ই চৈত্র ১৩০৯ সাল, ইংরাজী ২৭শে মার্চ্চ ১৯০৩।

(স্বাক্ষর)

বিনোদবিহারীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে এই উইল অনুসারে হেমচন্দ্রের বিষয়াদি বিভক্ত হইলে হেমচন্দ্রের প্রত্যেক পুত্র বা পুত্রের ওয়ারিশগণ পাঁচ সহস্র টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং কনিষ্ঠা কন্যা অনুশীলা দেবী পাঁচশত টাকার কাগজ প্রাপ্ত হন। স্থাবর সম্পত্তি এই ভাবে বিভক্ত হয়—

১নং পদ্মপুকুর স্কোয়ার স্থিত ভদ্রাসন বাটী তুল্যাংশে তিন পুত্র (বা পুত্রের অবর্ত্তমানে পৌত্র)

২নং পদ্মপুকুর ষ্ট্রীটস্থ বাটী—হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ চারুশীলা দেবী

১-১ পদ্মপুকুর স্কোয়ারস্থিত বাটী মণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র)

১৯ পদ্মপুকুর রোডস্থিত বাটী তৃতীয় পুত্র অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫ পদ্মপুকুর রোড স্থিত বাটী শ্রীযুক্ত ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃতীয় পুত্রের পুত্র)

হেমচন্দ্র কিরূপ সত্যপ্রিয় ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, তৎসম্বন্ধে দুইটী কাহিনী লিপিবদ্ধ করিব। হেমচন্দ্রের মধ্যমা কন্যা সুরবালা যখন পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকা, সেই সময় তিনি একদিন একতলার ছাদে একটি ঘটীর উপর হাত রাখিয়া বসিয়াছিলেন, হঠাৎ দোতলার কার্ণিসের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া তাঁহার হাতের উপর পড়িয়া যায়। ফলে তাঁহার দুইটী অঙ্গুলির দুইটী করিয়া পর্ব্ব কাটিয়া যায়।* সেই কন্যা বিবাহোপ-

* বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার "অঙ্গহীনা" নামক গল্পের

৺মণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগী হইলে যখন পাত্রপক্ষ কন্যা দেখিতে আসিতেন তখন হেমচন্দ্র সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাদিগকে সেই অঙ্গুলিদ্বয় দেখাইয়া দিতেন, পরে অন্য কথাবার্ত্তা কহিতেন।

হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র অতুলচন্দ্রের একমাত্র পুত্র মণিমোহনের একস্থানে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয় কিন্তু পাত্রীর পিতা অতুলচন্দ্রের ইচ্ছামত অর্থ ব্যয় করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হয়। তখন হেমচন্দ্র অন্ধ। হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ কৃষ্ণমতী দেবী প্রত্যহ তাঁহার অন্ন ব্যঞ্জনের থালা তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া, গ্রাস প্রস্তুত করিয়া, হেমচন্দ্রের হস্তে তুলিয়া দিতেন, হেমচন্দ্র আহার করিতেন। একদিন ঐরূপ আহার কালে হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণির বিবাহের কি হইল?"

কৃষ্ণমতী উত্তর দিলেন, "বিবাহ বোধ হয় আপাততঃ স্থগিত রহিল।"

"কেন? কন্যা কি পছন্দ হয় নাই?"

"কন্যাটী পছন্দ হইয়াছে, কিন্তু পাত্রীর পিতা অধিক অর্থ ব্যয় করিতে অসম্মত।"

নায়িকার সৃষ্টি করিয়াছেন। বলা বাহুল্য সেই গল্পের অন্যান্য ঘটনা তাঁহার কল্পনাপ্রসূত।

৺কৃষ্ণমতী দেবী

"কন্যাটী পছন্দ হইয়াছে অথচ টাকার জন্য বিবাহ হইবে না? আমি অন্ধ হইয়াছি, কাহাকেও বল আমাকে কন্যার বাটীতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে, আমি স্বয়ং কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিব।"

বলা বাহুল্য, হেমচন্দ্রকে যাইতে হয় নাই, তাঁহার পিতার এই কথা শুনিয়া চন্দ্র সেই স্থানেই অতুল পুত্রের বিবাহ স্থির করিয়া বৈদ্যবাটী নিবাসী জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী জীবনবালা দেবীর সহিত ১৩০৯ সালে ২৬ বৈশাখ শুভকার্য্য সম্পন্ন করেন।

হেমচন্দ্র বন্ধু বান্ধব আত্মীয় অনাত্মীয় সকলকেই ভাল খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার বাটীতে প্রায়ই তিনি ভোজ দিতেন এবং এই সকল অনুষ্ঠানে প্রভূত পরিমাণে দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী নানাস্থান হইতে সংগৃহীত হইত। বন্ধুগণকে লিখিত নিমন্ত্রণ পত্রগুলিও কম রসাল ছিল না। কবিবরের পৌত্র শ্রীযুক্ত ললিত-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত এক-খানি পত্রের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"তপ্ত তপ্ত তপ্‌সে মাছ, গরম গরম লুচি,
অজমাংস, ভাজা কপি, আলু কুচি কুচি,

শীতের দিনে তুলে যদি খাবে থাবা থাবা
এক নম্বর পদ্মপুকুর শীগ্‌গির এস বাবা।"

পানাহারের প্রসঙ্গে সত্যানুরোধে হেমচন্দ্রের একটি দোষেরও উল্লেখ করিতে হয়। তাৎকালীন অধিকাংশ শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের ন্যায় হেমচন্দ্রেরও মদ্যপান দোষ ছিল। স্বর্গীয় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ছাত্রজীবনের একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে করিতে একস্থানে লিখিয়াছেন:—

"একদিন শুনিলাম যে জোড়াঘাটের ঠিক উপরের বাড়ীতে [হেমচন্দ্র] বঙ্কিমবাবুর বাসায় আসিয়াছেন। দুজনকে ডাকিয়া লইয়া যাইতে পিতৃদেবের আদেশে গিয়া দেখিলাম যে হেমবাবু দাঁড়াইয়া একটা বোতল মুখে ধরিয়া সুরাপান করিতেছেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন "দেখ! তোমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির কাণ্ড দেখ।" হেমবাবু বোতল নামাইয়া বলিলেন, "তোমাদের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের অতিথি সৎকার দেখ! Guests cannot be choosers (অতিথি ইচ্ছামত খাইতে পায় না!)।" তাঁহারা দুজনে খুব হাসিলেন এবং বলিলেন একটু পরেই আমরা যাইব।

রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুর

তখন ইঁহাদের পান ভোজনের দোষ ছিল—সেটা সকলের জানা কথা—সেই জন্য এই বিষয়ের উল্লেখে সঙ্কোচ করিলাম না। কিন্তু উঁহাদের দুই জনের 'ভারতসঙ্গীত' এবং "বন্দে মাতরং' যে বাঙ্গালীকে 'জন্মভূমি পূজার স্তোত্র' দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল, হেমচন্দ্রের পরম স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, হেমচন্দ্র মদ্য পান করিতেন বটে কিন্তু অত্যধিক মদ্যপান করিয়া কখনও প্রমত্ত হইতেন না। নূতন কবিতাদি রচিত হইলে হেমচন্দ্র প্রায়ই শ্রীশচন্দ্রকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া কবিতাগুলি পাঠ করিয়া শুনাইতেন। শ্রীশবাবু লক্ষ্য করিতেন যে পড়িতে পড়িতে হেমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে উঠিয়া যাইতেন এবং অত্যল্প মদ্যপান করিয়া আসিতেন। তিনি যদি পরিমিত ভাবে পান না করিতেন তাহা হইলে প্রমত্ত হইতেন। বয়ঃকনিষ্ঠের সম্মুখে মদ্য রাখিয়া পান করা যে দোষাবহ তাহাও তাঁহার বোধগম্য ছিল—এই ঘটনা হইতে বুঝা যাইত। সেকালে অনেকের ধারণা ছিল যে মদ্যপান করিয়া লিখিতে বসিলে রচনা ভাল হয়।

হেমচন্দ্র যৌবনকালাবধি মদ্যপানে অভ্যস্ত থাকিলেও ইহা যে দোষের তাহা জানিতেন এবং বয়ঃকনিষ্ঠগণ যাহাতে এই দোষে লিপ্ত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। একবার একজন তরুণ কবি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মদ্যপান করিলে কি কল্পনাশক্তি উদ্বোধিত হয়?" হেমচন্দ্র এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। শেষ জীবনে চিকিৎসকগণের আদেশে তিনি মদ্যপান ত্যাগ করিয়াছিলেন। অল্প পরিমাণে অহিফেন সেবন করিতেন।

হেমচন্দ্রের পাঠানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি পুস্তকের কীট ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি সর্ব্বদাই একখানি না একখানি পুস্তক হস্তে করিয়া থাকিতেন। এমন কি কোনও পুস্তকে মন বসিলে আহার কালেও পুস্তক খুলিয়া পাঠ করিতে করিতে আহার করিতেন। তাঁহার গার্হস্থ্য পুস্তকাগারে অসংখ্য কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও স্মৃতি সম্বন্ধীয় বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক ছিল। কত সহস্র মুদ্রাব্যয়ে তাঁহার পুস্তকগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। তিনি বলিতেন তাঁহার পুস্তকগুলির মূল্য চল্লিশ সহস্র মুদ্রার কম নহে। শেষ জীবনে যখন তিনি দেখিলেন

যে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার পুস্তকাগারের সদ্ব্যবহার করিবেন না, তখন সমস্ত পুস্তক তিনি তাঁহার কোনও বন্ধুকে প্রদান করেন। এই বহুমূল্য পুস্তকগুলি বিক্রয় করিলে যথেষ্ট অর্থ পাওয়া যাইত, কিন্তু হেমচন্দ্র তাঁহার বন্ধুর নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন।

ভ্রমণে হেমচন্দ্রের বিশেষ আনন্দ ছিল। তিনি প্রায় প্রতিবৎসরই নানা স্থানে বন্ধুগণের সহিত বেড়াইতে যাইতেন। তাঁহার সাহচর্য্য লাভ করিয়া বন্ধুগণের দেশভ্রমণ অতিশয় আনন্দদায়ক হইত। কারণ রহস্যালাপে হেমচন্দ্র অদ্বিতীয় ছিলেন। অধুনা বাঙ্গালার অন্যতম মন্ত্রী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র সি-আই-ই মহোদয় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, একবার তিনি পিতৃবন্ধু হেমচন্দ্রের সহিত লক্ষ্ণৌ নগরীতে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে হামামে (স্নানাগারে) নবাবেরা কিরূপে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মর্দ্দন করিয়া স্নান করিতেন তাহা দেখিবার জন্য হেমচন্দ্র হামাম-রক্ষককে পারিতোষিক প্রদান করিয়া তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মর্দ্দন করিয়া দিতে বলেন। হামাম-রক্ষক হস্তদ্বারা ও জানুদ্বারা তাঁহাকে সবলে মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল।

মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র সি-আই-ই

হেমচন্দ্র হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "একটু থামো বাবা, আমার ব্রাহ্মণত্বটা আগে রক্ষা করি, আমার পৈতাতে চরণস্পর্শ করিও না।" এই বলিয়া উঠিয়া উপবীতটা খুলিয়া দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিলেন।

হেমচন্দ্র দেশীয় পরিচ্ছদাদি পরিধানের পক্ষপাতী ছিলেন। হেমচন্দ্রের মধ্যম জামাতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে কিছুকাল পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন :—

"হেমচন্দ্র সাহেবী পোষাক পরিচ্ছদ বড় ঘৃণা করিতেন। নিজে ত কখনও তাহা পরেন নাই, বাটীর কাহাকেও পরিতে দিতেন না। আমি একবার কোট পেণ্টেলুন পরিয়া ফটো তুলিয়াছিলাম। টাই পর্য্যন্ত ব্যবহার করি নাই। ফটোখানি দেখাইয়া আমি হেমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 'কেমন হইয়াছে ?' তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন 'ঠিক হইয়াছে, তবে ব্যাটারা যেন ফিংগি করিয়া দিয়াছে।' আমি বলিলাম 'সে আর তাদের দোষ কি ? দোষ হয়ত আমার।' তিনি বলিলেন 'তাই বলিতেছি।' আমি বুঝিলাম।"

এই সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের বন্ধুপুত্র শ্রীযুক্ত সুশীল-কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শ্রুত একটি গল্প

উল্লেখযোগ্য।—একদিন হেমচন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও উমাকালী মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের সহিত ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যান। উক্ত উদ্যানের একটি দ্বারে একজন ইংরাজ প্রহরী থাকিত এবং সেই দিক দিয়া পেণ্টেলুন পরিহিত ব্যক্তিগণেরই প্রবেশাধিকার ছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্র ও উমাকালী ইংরাজীপোষাক পরিধান করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা বিনা বাধায় উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গেলেন। হেমচন্দ্র ধূতি পরিধান করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। অবশেষে হেমচন্দ্র বস্ত্রের কিয়দংশ উত্তোলিত করিয়া তন্মধ্যস্থ ড্রয়ার দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে উদ্যানের ভিতর প্রবেশ করিয়া গেলেন।

হেমচন্দ্র ইংরাজী ও বাঙ্গালা কবিতা আবৃত্তি করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার আবৃত্তি শক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। স্বর্গীয় প্রমথচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বলেন তিনি sing-song wayতে পাঠ বা আবৃত্তি করিতেন। নট-রাজ অমৃতলাল বসু বলেন যে কাশীধামে অবস্থান কালে হেমচন্দ্রের ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র তাঁহাকে দিয়া হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত' প্রভৃতি আবৃত্তি করাইতেন এবং বলিতেন

পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তদীয় পুত্রগণ

হেমচন্দ্রের পাঠ বা আবৃত্তি তত ভাল লাগেনা। অনেকে আবার হেমচন্দ্রের আবৃত্তিশক্তির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি-আই-ই, মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন "হেমচন্দ্রের মোটা গলায় ভারত-সঙ্গীত-আবৃত্তি যে শুনিয়াছে সে অমর পদবী লাভের যোগ্য।" স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা' আবৃত্তির যে সুখ্যাতি করিয়াছেন তাহা 'দশমহাবিদ্যা'র আলোচনা প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী বলেন, এদেশে চণ্ডীর গানে যেমন লয় দিয়া গীতের আবৃত্তি করা হয়, হেমচন্দ্র অনেকটা সেই রকম করিতেন, তাহাতে শ্রোতার কর্ণে একপ্রকার বিশেষ মাধুর্য্য ঝঙ্কৃত হইত। মাননীয়া শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের সহিত কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের এই বিষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল। তিনিও হেমচন্দ্রের আবৃত্তির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। Sing-song wayতে পাঠ করা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন রবীন্দ্রনাথও অনেকটা sing-song wayতে পাঠ বা আবৃত্তি করেন।" আমাদের যতদূর স্মরণ আছে, তিনি বলেন, আমাদের গান বা গানের সুর

হেমচন্দ্রের তৃতীয় ভ্রাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

বিদেশীদের কাণে ভাল লাগে না, তাহাদেরও গান বা গানের সুর সব সময়ে আমাদের কাণে মধুবর্ষণ করে না। ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে কাহারও আবৃত্তি ভাল লাগা বা না লাগা মানুষের শিক্ষা, রুচি ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। অনেক সুর সেকালের লোকের যত ভাল লাগিত এ কালের লোকের তত ভাল লাগে না। হেমচন্দ্রের আবৃত্তির একটা বিশেষ পদ্ধতি ছিল যাহা অনেকের নিকট ভাল লাগিত, কাহারও কাহারও ভাল লাগিত না।

ইহা বিস্ময়ের বিষয় যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবৃত্তি শক্তি সম্বন্ধেও এইরূপ মতদ্বৈধ আছে। সম্প্রতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন —"যেমন কবি বা যেমন কাব্য তাঁহার [মাইকেলের] কবিতার আবৃত্তি তেমন হইত না। সে আবৃত্তিতে কোন প্রকার ভাব-প্রকাশের চেষ্টা থাকিত না।" অথচ মাইকেলের সমসাময়িক অনেকেই তাঁহার আবৃত্তির প্রশংসাই করিয়াছেন।

হেমচন্দ্রের পুত্রকন্যাগণের কথা পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত বংশলতা দৃষ্টে পাঠকগণ তাঁহার

- ৺কৈলাসচন্দ্র
  - ৺হেমচন্দ্র
    - তুলচন্দ্র
      - ণিমোহন
        - বিজয়মোহন
    - ৺প্রতুলচন্দ্র
      - শ্রীললিত মোহন
      - শ্রীমতী লবঙ্গ লতা
    - শ্রীঅনুকূলচন্দ্র
      - শ্রীজ্যোতিঃ মোহন
      - শ্রীকিশোরী মোহন
      - শ্রীমনো মোহন
    - ৺অকূলচন্দ্র
      - শ্রীমোহিত মোহন
      - শ্রীভুবন মোহন
      - শ্রীমদন মোহন
  - ৺পূর্ণচন্দ্র
    - ৺অমূল্যচন্দ্র
      - অজয়চন্দ্র প্রভৃতি
    - ৺প্রফুল্লচন্দ্র
      - প্রতাপ
      - ৺প্রবোধ
      - প্রভাস
      - প্রকাশ
    - ৺অনিলচন্দ্র
      - শ্রীঅরুণচন্দ্র
      - শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র
  - ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র
    - বংশাভাব
  - ৺ঈশানচন্দ্র
    - শ্রীবিমানচন্দ্র
    - শ্রীশ্রীমানচন্দ্র
    - শ্রীধীমানচ

৺প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের উত্তরপুরুষগণের নাম অবগত হইতে পারিবেন। হেমচন্দ্রের ভ্রাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে পরলোক গমন করেন।

উপরি উদ্ধৃত বংশলতা হইতে প্রতীত হইবে যে এক্ষণে হেমচন্দ্রের একজন মাত্র পুত্র অনুকূলচন্দ্র এবং অনেক-গুলি পৌত্র জীবিত আছেন। হেমচন্দ্রের মধ্যম পুত্র প্রফুল্লচন্দ্রের কন্যা শ্রীমতী লবঙ্গলতা দেবী কবিবরের একমাত্র পৌত্রী।

হেমচন্দ্রের কন্যারা সকলেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার দৌহিত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলাদেবীর একটি মাত্র পুত্র শ্রীমান সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় এবং কনিষ্ঠা কন্যা অনুশীলা দেবীর একটি মাত্র পুত্র শ্রীমান্ মনোমোহন মুখোপাধ্যায় জীবিত আছেন।

ধর্ম্মবিশ্বাস। হেমচন্দ্র হিন্দুর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মেই আস্থাবান ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন হিন্দুশাস্ত্রাদি পাঠ করিয়াছিলেন অপরদিকে তেমনই পাশ্চাত্য ধর্ম্মবিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কেহ যথা, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কোমতের ধ্রুববাদের

শ্রীমতী লবঙ্গলতা দেবী

পক্ষপাতী ছিলেন। হেমচন্দ্র ধ্রুবদর্শনসংক্রান্ত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু যোগেন্দ্রচন্দ্রের সহিত ঐ বিষয়ে আলোচনা করিয়াও হিন্দুধর্ম্মে শিথিলবিশ্বাস হন নাই। হেমচন্দ্রের মধ্যম জামাতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এতৎপ্রসঙ্গে আমাদিগকে কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন :—

"তিনি (হেমচন্দ্র) যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের পরম বন্ধু হইলেও বোধ হয় Positivist ছিলেন না। তবে কি যে ছিলেন তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। তাঁহার সহিত একদিন মাত্র আমার ধর্ম্মের কথা হইয়াছিল, সে দিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা বিনোদ বাবু হেমবাবুর খিদিরপুরের বাটীতে উপস্থিত ছিলেন। আমাকেই প্রথম জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ত ব্রাহ্ম?" আমি বলিলাম, "আমি ব্রাহ্ম কেন হইতে গেলাম?" জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি?" আমি বলিলাম, "হিন্দু।" আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর দেবতা সব মান?" আমি বলিলাম, "ঠাকুর দেবতার কথা বলিতে পারি না, আমি এক ভগবান মানি।" উত্তরে বলিলেন, "তা হ'লেই এক রকম ব্রাহ্ম হ'লে।" তার পর বিনোদ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো বাবু, তোমার কি?"

বিনোদ বাবু খাঁটি হিন্দু ছিলেন, আর শ্বশুরের তর্ক-শক্তিকে বড় ভয় করিতেন। তিনি বলিলেন, "আমি কালী দুর্গা সব মানি। আপনি রক্ষা করুন,আমার বিশ্বাস টুকু টলিয়ে দেবেন না।" হেমচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তোমাকে কিছু বলব না।" তার পর আমার সঙ্গে আরও কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল কিন্তু তাহা ঠিক মনে নাই। ভাবে আমি বুঝিয়াছিলাম যে হেমচন্দ্র তখনকার অনেকের মত Refined Hindu ছিলেন।"

যখন ৺ রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রচার' মাসিকপত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হইতেছিল তখন হেমচন্দ্রের সহিত আর একবার আশুবাবুর ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল। আশুবাবু আমাদিগকে লিখিয়াছেন—

"একদিন বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া তাঁহার সহিত আমার কথা হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবু সেদিন হেমবাবুর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তিনি চলিয়া যাইবার পর আমার ডাক পড়িল। আমি বলিলাম, "যা হোক বঙ্কিম বাবু হঠাৎ খুব হিন্দু হয়ে গেলেন।" হেমচন্দ্র হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে জানলে?" আমি বলিলাম, "এই যে কৃষ্ণ-চরিত্র লিখেছেন।" তিনি

"প্রচার"-সম্পাদক রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বলিলেন, 'এইজন্তে ? বঙ্কিম যা ছিলেন তাই আছেন, তবে উনি একটা intellectual giant, যা ধরেন তাই masterly ভাবে deal করতে পারেন। ওতে ভুল না।' পরে কিন্তু বঙ্কিম বাবুর বাস্তবিক একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। হেম বাবু কিন্তু শাস্ত্র বিহিত সামাজিক ক্রিয়া কলাপ করিতেন।"

যৌবনে হেমচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে একটু প্রবণতা দেখা দিয়াছিল। 'চিন্তাতরঙ্গিণী'তে একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন :—

"দুর্ব্বল মানব মন সেই সে কারণ।
পূজে ভবদেব করি প্রতিমা গঠন ॥
সাকার স্বরূপে তাই নিরাকার ভাবে।
মাটী পূজা করি ভাবে মোক্ষপদ পাবে ॥
একবার এরা যদি প্রকৃতি-মন্দিরে।
প্রবেশি ডাকিতে পারে জগত-বন্ধুরে ॥
শিব দুর্গা কালী নাম ভুলিবে সকল।
পরব্রহ্ম নাম মাত্র জপিবে কেবল ॥
কি প্রতিমা দশভুজা করেছে গঠন।
সে কি তাঁর রূপ যাঁর ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ॥

কথায় সৃজন যাঁর কথায় প্রলয়।
দশভুজা নারীরূপ তাঁরে কি সাজয়॥
কিবা জবা বিল্বদলে তুষিবে সে জনে।
ধরা পূর্ণ ফলে ফুলে করেছে যে জনে॥
কিবা ধূপ দীপ গন্ধ তাঁর যোগ্য দান।
যেই জন ধূপ ধুনা কস্তুরি নিদান॥
কি মন্দিরে তাঁর মূর্ত্তি করিবে ধারণ।
সসাগরা ক্ষিতি ব্যোম যাঁহার রচন॥
সার মন্ত্র জানি এক পরব্রহ্ম নাম।
মুক্তি পদ জানি সেই পরব্রহ্ম ধাম॥*

এই ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন নহে—উহার একটী শাখা মাত্র। হেমচন্দ্র এই সময়ে একেশ্বরবাদী হিন্দু ছিলেন বলিলেই ঠিক বলা হয়। কিন্তু তিনি আজীবন হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী প্রচলিত আচারাদি মানিয়া চলিতেন। বিচারপতি দ্বারকানাথ ধ্রুববাদের পক্ষপাতী হইয়া পিতৃশ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত করেন নাই। হেমচন্দ্র হিন্দু-ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া এই সকল ক্রিয়া কলাপাদি করিয়া গিয়াছেন। হেমচন্দ্রের পিতৃশ্রাদ্ধের পর কেশব-চন্দ্র সেন একটি বক্তৃতায় হেমচন্দ্রের ন্যায় শিক্ষিত

ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া 'কুসংস্কারপূর্ণ' হিন্দু আচারাদি পালন করিয়া যে নিজ নিজ বিবেক-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছেন এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে হেমচন্দ্র Brahmo Theism in India নামক একখানি পুস্তকায় কিজন্য শিক্ষিত হিন্দু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার কোনও কারণ দেখিতে পান না এবং কি জন্য তিনি হিন্দু আচারাদি মানিয়া চলেন তাহা প্রদর্শিত করেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পাঠ করিলে হেমচন্দ্র ধর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কত গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন এবং এই বিষয় লইয়া কত গভীর চিন্তা করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা কিছুকাল পূর্ব্বে 'মালঞ্চ' মাসিক পত্রে (কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩২৫) এই পুস্তকখানির সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। প্রস্তাবটীর উপসংহারাংশের নিম্নোদ্ধৃত অনুবাদ হইতে হেমচন্দ্র এই বিষয়ে কি মত পোষণ করিতেন তাহা পাঠকগণ জানিতে পারিবেন :—

"শিক্ষিত দেশবাসিগণ ধর্ম্মকে একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান মনে করেন। তাঁহারা কোনও ধর্ম্মবাদকে ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের দৃষ্টিতে খ্রীষ্টান, মুসলমান, হিন্দু বা ব্রাহ্ম কেহই

ভ্রান্ত সংস্কার বা অযৌক্তিকতা হইতে মুক্ত নহেন। তাঁহারা ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টান হইতে পারেন না, কারণ হিন্দু থাকিয়া বিশ্বাসের মান রক্ষা যেরূপ অসম্ভব, ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টান হইলেও সেইরূপ অসম্ভব। হিন্দু, হিন্দু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—পিতা, মাতা, স্ত্রী, ভগিনী ও ভ্রাতা সকলেই হিন্দু। এ ক্ষেত্রে যে সমাজে জন্ম সেই সমাজে অবস্থান ভিন্ন গতি কি? মনুষ্য বিদ্বেষী হইয়া মানব সমাজ পরিত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যে বাস? যাঁহারা তাঁহাদিগকে ভণ্ড বলেন, তাঁহাদিগের কি এই অভিপ্রায়? জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে, যে সমাজে বাস করিতে হইবে, সেই সমাজের আচার ব্যবহারাদি পদদলিত করাই কি কর্ত্তব্য? এই তর্ক আরও একটু প্রসারিত করা যাউক। এক ব্যক্তির স্থির ধারণা হইল, রাজতন্ত্র দূষ্য ও অহিতকর। তবে কি তাহার পক্ষে রাজহত্যাই কর্ত্তব্য হইল? এবং সকল দেশে ও সকল কালে রাজা অতি ঘৃণ্য রাক্ষস বিশেষ ইত্যাকার নিজমত প্রচার করাই কি তাহার উচিত? আমার ত মনে হয়, প্রত্যেক নগরবাসীর উচিত, রাজতন্ত্র বিষয়ে নিজের মত ভিতরে যাহাই হউক, যে দেশে বাস করিতে হইতেছে সেই দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-

গুলির প্রতি অন্ততঃ বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শন করা, এবং যতদিন উক্ত দেশে বাস করিতে হইবে ততদিন প্রচলিত রাজবিধানগুলি যতই অসঙ্গত বোধ হউক না কেন, তাহার বশ্যতা স্বীকার করা। অন্ততঃ ধর্ম্মান্ধ বা উন্মাদ ব্যক্তি ভিন্ন প্রত্যেক নগরবাসীরই এই নিয়ম প্রতিপালন করা সাধারণতঃ উচিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। শিক্ষিত দেশীয়গণ উন্মাদও নহেন, ধর্ম্মান্ধও নহেন, সুতরাং তাঁহারা মানবজাতি-সাধারণ সদ্‌বুদ্ধির প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। হিন্দুদিগের ধর্ম্মোৎসবাদি তাঁহারা সামাজিক ব্যবস্থার অঙ্গ স্বরূপ বিবেচনা করেন। তাঁহারা ইহার দোষ দেখিতে পান, এবং তাহার জন্য আক্ষেপ করেন। কিন্তু বাধ্য হইয়া তাহা সহ্য করেন। তাঁহারা দোষটার প্রতিবিধানের চেষ্টাও করেন কিন্তু বল প্রকাশদ্বারা নহে। সামাজিক রীতি ও আচারাদি, এবং তাহারই অঙ্গস্বরূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আচারাদি তাঁহারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমোদন করেন, সংশোধনেরও ইচ্ছা করেন, কিন্তু যাঁহাদিগকে প্রেম ও ভক্তি করেন, এবং যাঁহাদিগের সহিত জীবনের নানারূপ সম্বন্ধে সম্বন্ধ আছেন, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তিকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া সংশোধন

করিতে চাহেন না। তাঁহারা বিনা বর্ণ প্রয়োগে অথচ সম্যক্রূপে ঐ কার্য্য সমাধা করেন। আমাদের নিজ গার্হস্থ্য চক্রের মধ্যে এবং কখন কখনও অধিকতর প্রকাশ্য ভাবে প্রচলিত শিষ্টাচারঘটিত বহু বিষয়ে শিক্ষিত দেশীয়গণ পুরাতন প্রথা অগ্রাহ্য করেন; মাতা, পিতা, ভগিনী, বন্ধু ও আত্মীয়গণ তাঁহাদের কার্য্য দেখিয়াও দেখেন না, অতি মন্থর গতিতে ক্রমশঃ গভীরমূল প্রথার আধিপত্য শিথিল হইয়া যায়, এবং তাঁহাদের চরিত্রপ্রভাবে নূতন ও বিরোধী মতগুলি ক্রমশঃ অধিকতর প্রতিপত্তি ও বিস্তার লাভ করে। হিন্দু সমাজের বিষয় যে কেহ অবগত আছেন, সত্য করিয়া বলুন, উক্ত সমাজে কত বিরোধী ভাব অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছে এবং উহা শিক্ষিত দেশবাসিগণের কার্য্যের ফল কি না? বাস্তবিক কোন ব্যক্তিকে নিজ বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিতে হইবে বলিলে এই মাত্রই বলা হয় যে, তাহার নিজের চরিত্রে এবং সাধারণ কার্য্য পরম্পরায় নিজের বিশ্বাস ও অভিমত কি তাহা ব্যক্ত করিতে হইবে এবং দেখাইতে হইবে যে তদ্বিরুদ্ধে যাহা ঘটিয়াছে তাহা নিবারণের উপায় না থাকায় বাধ্য হইয়া সহ্য করিতে হইয়াছে। এবং আমি প্রতিবাদের আশঙ্কা না করিয়া

নির্ভয়ে বলিতেছি যে, শিক্ষিত দেশীয়গণ ইহা সম্পূর্ণরূপে এবং সরল ভাবে করিয়া থাকেন। তাঁহারা হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কারণ, তাহাহইলে মনুষ্য সমাজ পরিত্যাগ করিতে হয়। যেহেতু এরূপ কোন সমাজ নাই যাহার সামাজিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত আচার ব্যবহারাদির সহিত তাঁহাদের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। কিন্তু তাঁহারা মনুষ্যবিদ্বেষী হইতে বিশেষ ইচ্ছুক নহেন এবং সকল প্রিয়তম এবং নিকটতম আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার কোন আবশ্যকতা বা প্রশংসনীয়তা দেখেন না। সুতরাং যে সমাজে তাঁহারা অদৃষ্টক্রমে পড়িয়াছেন, সেই সমাজেই থাকিয়া এবং যে সকল ব্যক্তিকে প্রেম ও ভক্তির উপযুক্ত পাত্র বলিয়া তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছে তাঁহাদিগকে প্রেম ও ভক্তি করিয়াই তাঁহারা সন্তোষলাভ করেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে কোন কোন সময়ে হিন্দু সমাজের প্রচলিত যুক্তিবিরুদ্ধ আচারের (কারণ অনেকগুলি আচার যুক্তিবিরুদ্ধই বটে) অধীনতা স্বীকার অপেক্ষা পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা—যাঁহারা প্রত্যক্ষ ও স্পর্শক্ষম ও বাস্তব দেবতা স্বরূপ—যাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে মহত্তম, পবিত্রতম এবং মধুরতম—

তাঁহাদের বন্ধন ছিন্ন করা অধিকতর পাপজনক ও অকর্ত্তব্য।"

হেমচন্দ্রের ব্যক্তিগত ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা আমাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে না, কিন্তু যে উচ্চ নৈতিক জীবন যাপন করা, যে সকল সদ্‌গুণের অনুশীলন করা, সকল সভ্যজাতির ধর্ম্মেই উপদেশ দেয় হেমচন্দ্র যে সেইরূপ উচ্চ নৈতিক জীবন যাপন করিয়াছিলেন এবং সেই সকল সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই।

বঙ্গসাহিত্যে হেমচন্দ্রের স্থান। হেমচন্দ্রের অলৌকিকী প্রতিভা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে কতদূর উন্নতি সাধিত করিয়াছে, তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ সমূহে যথাসাধ্য প্রদান করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। পাশ্চাত্য গীতিকাব্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব-সম্পদ-সমৃদ্ধ ছন্দোবৈচিত্র্যপূর্ণ রচনাপদ্ধতি হেমচন্দ্রের কবিতাবলীর দ্বারাই বাঙ্গালা সাহিত্যে অসাধারণ সাফল্যের সহিত প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত হয়। আধুনিক গীতিকাব্যের তিনি অন্যতম জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গীতি কবিতার ক্ষেত্রে হেমচন্দ্রের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার কবিতাগুলির বিশেষত্ব এই যে সেগুলি

ভাবপ্রধান। "শবদে শবদে বিয়া" দিবার জন্য কিংবা "কথা গেঁথে শুধু নিতে করতালি" হেমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি উচ্চতম ভাবের প্রেরণায় লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্যকে অনেক উর্দ্ধে সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ, তাঁহার লক্ষ্য, অতি উচ্চে অবস্থিত ছিল এবং তিনি তাঁহার প্রেমঘটিত কবিতাগুলিকেও "যামিনী না যেতে জাগালে না কেন" প্রভৃতি কুৎসিৎ ভাবদ্যোতক টপ্পায় পর্য্যাসিত হইতে দেন নাই। একজন সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন—"হেমবাবুর রুচি ও নীতি অতি উচ্চ ও অতি বিশুদ্ধ। পাপের প্রতি বিদ্বেষ, অত্যাচারের প্রতি ক্রোধ, সাধুতার প্রতি শ্রদ্ধা, দুঃখীর প্রতি দয়া, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, কাপুরুষতার প্রতি ঘৃণা, পবিত্রতার প্রতি ভক্তির সঞ্চার, হেমচন্দ্রের কবিতাপাঠে পাঠক উপলব্ধি করিবেন। হেমবাবুর কবিতা কখনও বা বোধ হয় ধর্ম্ম মন্দিরে বেদী হইতে পঠিত হইবার নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে—কখনও বা বোধ হয় নির্ব্বাসিত ম্যাটসিনীর জ্বলন্ত হৃদয়ভেদী রচনাবলীর ন্যায় ভূতগৌরব-বিস্মৃত সুষুপ্ত অধীন জাতিদিগকে জাগরিত করিবার জন্য রচিত হইয়াছে।"

হেমচন্দ্র

হেমচন্দ্র যে গীতি কবিতার ক্ষেত্রে চিরদিন একটি বিশিষ্ট ও গৌরবান্বিত আসন অধিকার করিয়া থাকিবেন তাহা একটি বিষয় চিন্তা করিলেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে। 'জগৎ কবি সভায় মোরা যাঁহার করি গর্ব্ব' সেই 'গানের রাজা' রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার বিশাল সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশেই তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা প্রযুক্ত করিয়া বিশ্ববাসীকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন। তিনি এত সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ভাব এত বৈচিত্র্যপূর্ণ ছন্দে আবদ্ধ করিয়া এত রকম সুরে আমাদিগকে শুনাইয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা তাঁহার পরবর্ত্তী কেহ তাঁহার অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন সে আশা অল্প। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ যত জটিল ও সূক্ষ্মভাব লইয়া গীতিকাব্য রচনা করিয়াছেন, হেমচন্দ্র তত করেন নাই। হেমচন্দ্র যে সকল ভাব তাঁহার কাব্যে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা অতি সরল, অতি সনাতন। কিন্তু তিনি যে যে গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা সংখ্যায় অল্প হইলেও, তাহার মধ্যে এমন একটু বিশেষত্ব আছে যাহা রবীন্দ্রনাথেও নাই। কোন কোন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। হেমচন্দ্রের বিশেষত্বগুলি শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত

যদুনাথ সরকার মহাশয় কিছুকাল পূর্ব্বে 'দুই রকম কবি হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক সুচিন্তিত প্রবন্ধে অতি সুন্দর ও বিস্তারিত ভাবে আলোচিত করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার সহিত সর্ব্বত্র একমত না হইলেও তাঁহার সেই সুললিত সন্দর্ভের কোন কোন অংশ নিম্নে সঙ্কলন-যোগ্য বিবেচনা করি :—

সামাজিকতা (Collectivism) হেমচন্দ্রের "কাব্যে সামাজিকতা অতি সুন্দর পরিস্ফুট হয় ; তিনি যাহা ভাবেন যাহা করেন, তাহা দশের জন্য, লোক সমষ্টির জন্য, একাকী ঘরের কোণায় বসিয়া চিন্তা করিতেছে এমন লোকের বা 'পর্ণকুটীরে অতি বিষণ্ণ' নির্জ্জন বনবাসীর প্রতি উদ্দেশ করিয়া হেমচন্দ্রের কবিতা গীত হয় নাই। তাঁহার প্রতি ছত্রে দেখা যায় যে তিনি সর্ব্বদা মনে রাখিতেন যে তিনি জনসমষ্টির মধ্যে একজন ; যেন এ জগৎ ছাড়িয়া বাহিরে একা দাঁড়াইয়া নীরবে অন্য সব লোককে দেখিতেছেন, এ রকম তাঁহার মনের ভাব নহে। সপ্তকোটী ভ্রাতার সঙ্গে একত্র দলবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতেছেন, সপ্তকোটী কণ্ঠের কলকল নিনাদের সুর তিনি ধরাইয়া দিতেছেন এবং নিজেও তাহাতে যোগ দিতেছেন, ইহাই তাঁহার

ভাব। * * * এই ভাবের পূর্ণ বিকাশ তাঁহার স্বদেশ-প্রেমমূলক পদ্যগুলিতে। এক্ষেত্রে হেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এগুলি আমাদের সকলেরই হৃদয়ে গাঁথা আছে, সুতরাং বেশী কথা বলার প্রয়োজন নাই।

হেমচন্দ্রের রাজনৈতিক কবিতাগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই মত কবিতার তুলনা করিলেই বুঝা যায় হেমচন্দ্র কত সামাজিক, রবীন্দ্র কত একক (individualistic)। রবীন্দ্র দেশের দশা ভাবিয়া যেন একা একধারে দাঁড়াইয়া থাকেন, দলে মেশেন না। তাঁহার এই শ্রেণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ্য 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী' এবং 'সে যে আমার জননীরে।'

প্রথমটীতে কবি দেশের কথা বলেন; আকাশ, নদী, সমুদ্র, ক্ষেত্র, বনের কথা আছে, এদেশের মানুষদের কথা নাই। সপ্তকোটী কণ্ঠ কলকল নিনাদের একটু শব্দও নাই। 'আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা সেই বংশোদ্ভব জাতির' নাম গন্ধও নাই। পদ্যটি পড়িয়া মনে হয় ভুবনমনোমোহিনী বুঝি নিঃসন্তান।

'সে যে আমার জননীরে!' এই পদ্যের বিশেষত্ব 'আমার এই কথাটিতে' কবি একা এক পাশে দাঁড়াইয়া দূর হইতে জননীর কুপুত্রদের ব্যবহার দেখিতেছেন,

লজ্জায় অধোবদন, কিন্তু হৃদয় দৃঢ়, একা হইয়াও জননীর সেবায় ব্রতী। আর সমস্ত লোক যাহাই করুক না কেন, তিনি একা নিজ কর্ত্তব্য করিবেন, কাহারও মুখ চাহিবেন না। এই মনের তেজ, এই এককত্ব, ধর্ম্মসংস্কারকের হৃদয়ে পূত অগ্নিশিখা। To be in the minority of one কম সাহসের কথা নহে।

হেমচন্দ্র, কিন্তু কুলাঙ্গার ভ্রাতাদিগকেও আহ্বান করিতেছেন, তাঁহাদের কাছে যাইয়া হাত ধরিয়া টানিতেছেন। হেমচন্দ্র বলেন "আমরা," রবীন্দ্র বলেন "আমি"; ইহাই উভয়ের পার্থক্য। এই জন্য রবীন্দ্রকে aristocrat হেমচন্দ্রকে democrat বলি। [একথা তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া নহে, কারণ মিল্টন মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক হইলেও aristocrat, এবং শেলী রায় বাহাদুরের (baronet) জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও democrat] হেমচন্দ্রের সামাজিকতার আর একটী অবশ্যম্ভাবী ফল তাঁহার রচনার ধরণ। তাঁহার ছবিগুলি বড় বড়, পটখানি পরিপূর্ণ, দৃশ্য সুদূরব্যাপী, যেন প্রাসাদ গবাক্ষ হইতে জনসমষ্টি দেখিতেছি, যেন পর্ব্বতশিখর হইতে দেশ জনপদ নদনদীর ছবি আঁকা হইয়াছে।

তাঁহার রং অতি স্পষ্ট, পরিসীমার রেখাগুলি অতি পরিষ্কার।

কাব্যে চিরন্তন সহজ ভাব

(Eternal Primary Feeling) । হেমচন্দ্র যে সকল ভাব তাঁহার কাব্যে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা অতি সরল, অতি সনাতন; তাহা প্রাচীন কালেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও অনেক লোকের হৃদয়ে থাকিবে। মুটে মজুরেও তাহা বুঝিতে পারে। দয়া, প্রেম, ঘৃণা, প্রতিহিংসা, পুত্রস্নেহ, প্রভৃতি মানব জাতির প্রাথমিক ভাবগুলিতে কিছু কঠিনতা নাই, বুঝিতে বিদ্যা বা সভ্যতার আবশ্যকতা হয় না। প্রাচীন জগতের প্রশ্নগুলি (problems) বড় সহজ ছিল, লোকের মনের বাসনাগুলি বড় স্পষ্ট অবিকৃত ও অমিশ্র ছিল। এই জন্য হোমার ও বাল্মীকির এত পশার।

বর্ত্তমান জগতের প্রশ্নগুলি এত সহজ নহে; সমাজ ও শিক্ষা যেমন বাড়িয়াছে, প্রশ্নগুলিও সেই সঙ্গে বড় জটিল ও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

হেমচন্দ্র যখন আসরে নামেন তাহার আগে এসব নূতন প্রশ্ন এদেশের কাব্যে কেন, ইংলণ্ডেও বড় স্থান পায় নাই, তাই তাঁহার লেখায় এদের আভাস নাই।

আমাদের মধ্যে কেবল রবীন্দ্র এই নূতনতম যুগের ভাব অভিব্যক্ত করার চেষ্টা করিয়াছেন এবং আশ্চর্য্য সফলও হইয়াছেন। যদি পদ্য বলিতে 'জীবনের সমালোচনা' বুঝি তবে হেমের অনেক কবিতা পদ্য নহে। আর যদি পদ্য ভাবময়ী চিন্তা (pmiassioned thought) হয় তবে হেমের পদ্য কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। তিনি অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর পদ্য লিখিয়াছেন। তাঁর এক একটা রচনা পড়িয়া উঠিবার সময়, বোধ হয় না যে আগে যাহা ছিলাম সেই মানুষই রহিয়াছি; অনুভব করি যে মনটা বিচলিত, উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, এই নীচ ধূলা মাখা জগৎ হইতে উচু হইতে ইচ্ছা হয়,—ইহাই পদ্যের কাজ।

কাব্যগঠন ক্ষমতা (Construction)।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সূক্ষ্মে আবদ্ধ থাকায় তাঁহার কাব্যগঠন ক্ষমতা খাট হয়েছে। যেমন তাঁহার ছোটগল্পগুলি বড় সুন্দর, উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌছিয়াছে, কিন্তু দীর্ঘ নভেল গুলি তাহা নহে। কাব্যগঠন অর্থাৎ মাল মশলার ঠিক আয়োজন ও বিন্যাস করিতে মাইকেল প্রথম, তার পর হেম, তারপর রবি। কিন্তু মাইকেলও প্রথম শ্রেণীর নহেন।

যে শিল্পী তাজ মহলের নক্সা (plan) আঁকিয়াছিল তাহার প্রতিভা একমত, আর যে কারিগর তাজের একটি প্রস্তর ফলক লইয়া তাহাতে অতি সূক্ষ্ম বিশ রকম পাথর বসাইয়াছে (mosaic) তাহার প্রতিভা অন্যমত।

অথবা যেমন একজন ওলন্দাজ চিত্রকর ছয় মাস ধরিয়া একটি কপিগাছ আঁকে, প্রত্যেক পাতার প্রত্যেক ভাঁজটি রংটি রেখাটি সযত্নে নকল করে; অথচ সেই সময়ের মধ্যে মাইকেল এঞ্জেলোর মত ইতালীয় চিত্রকর রোমের প্রকাণ্ড ধর্ম্ম প্রাসাদের ভিতরের ছাদ কত সাধু যোগী ও দেবদূতের চিত্রে পূর্ণ করিয়া ফেলেন।

প্রকৃতিবর্ণন। হেমের স্বভাব বর্ণনার প্রধান লক্ষণ এই দুটী—ইহা উপমামূলক এবং মানব সংসৃষ্ট। কবি পদ্মের মৃণাল দেখিলেন আর অমনি তাহার সাদৃশ্যে জাতীয় উত্থান পতনের কথা মনে হইল; বিন্ধ্য-গিরি দেখিয়া অমনি সেকাল ও একালের পার্থক্য মনে পড়িয়া গেল। কোন একটি পাখীর ডাক শুনিয়া সেই মত প্রেয়সীর কথা হৃদয়ে জাগিল। অশোক তরু, যমুনা-তট সকলই গাছ বা নদী ছাড়া অন্য ভাবনা কবির হৃদয়ে জাগ্রত করে। অর্থাৎ বৃক্ষ নদী পর্ব্বত প্রভৃতিতে কবি

যেন জীবন দেখিতে পান না ; ও গুলির নিজের কোন মূল্য বা আদর নাই ; তাহারা কেবল এই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে যে উপমার পদার্থ হইয়া কবির হৃদয়ে অপর কোন দ্রব্যের—জাতি, দেশ, মানবজীবন, অতীত স্মৃতি প্রভৃতির ভাব আনিয়া দিবে, অথবা উহাদের রঙ্গ, গন্ধ, শব্দ, আমাদের বাহেন্দ্রিয় তৃপ্ত করিবে। হেমচন্দ্র প্রকৃতি বর্ণনা করিতে গিয়া সুধু প্রকৃতির দৃশ্য লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না ; উহার সঙ্গে মানবকে সংযোগ করিয়া দিতে না পারিলে অসুখী হন। অর্থাৎ প্রকৃতি মানবের কাজের, মানবের মনোবৃত্তির পট (Background) মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। * * * এ বিষয়ে হেম নবীন বাইরণের শ্রেণীর। দুই জনেরই Reflective landscape painting.

কিন্তু রবির প্রকৃতি বর্ণনা সম্পূর্ণ ভিন্ন ; ইহা সূক্ষ্ম, আধ্যাত্মিক, idealised—তাঁহার চক্ষে প্রকৃতি নিজেই আদরের জিনিষ। উহার জীবন আছে, মনোবৃত্তি আছে, অনুভবক্ষমতা আছে, হৃদয় আছে। জগৎ জড় নহে, সেও একটা প্রাণী।

ভাষা—ভাষার ঝঙ্কারে ও বেগে, লালিত্য ও তেজের সম্মিলনে হেমচন্দ্র অদ্বিতীয়। যখন তিনি

লিখিতে আরম্ভ করেন, আমাদের দেশের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের পাঠকগণ আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন যে বাঙ্গালা ভাষায়ও এমন জিনিষ হইতে পারে!”

উদ্দীপনায় হেমচন্দ্র অতুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী। একজন সমালোচক লিখিয়াছেন “তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে উদিত হইয়া যে অমৃতময় মৃতসঞ্জীবনী গীতাবলি বর্ষণ করিয়াছেন, তেমন গম্ভীর তেমন তেজোময় স্বরলহরী কেহ কখন শুনে নাই। বাঙ্গালার সেই গীত অভূতপূর্ব্ব—অননুভূতপূর্ব্ব। হেমচন্দ্র বাঙ্গালায় ধ্রুপদ আরোপ করিলেন—সমস্ত বাঙ্গালা স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইল—কিয়ৎক্ষণের জন্য বাঙ্গালীর মৃতদেহে শোণিত সঞ্চার হইল—কিয়ৎকালের জন্য বাঙ্গালীর শীতল হৃদয়ও উষ্ণ হইয়া উঠিল।”

সুপণ্ডিত বরদাচরণ মিত্র এই জন্য বলিতেন ‘রবীন্দ্রকে কাব্যকুঞ্জের কোকিল’ বলিলে হেমচন্দ্রকে কাব্যাকাশের সূর্য্য বলিতে হয়।’ কারণ, হেমচন্দ্রের কবিতার বিশেষত্ব এই তেজ, এই উদ্দীপনা। অধ্যাপক ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী লিখিয়াছেন, “তিনি যেরূপ উদ্দীপিত করিতে পারিতেন, নিদ্রিতকে জাগরিত, অলসকে শ্রমপরায়ণ, রোগীকে সুস্থ, বৃদ্ধকে যুবা, এমন

আর কেহ পারেন নাই। অন্যান্য ভাবে কেহ তাঁহার সমকক্ষ, কেহ তাঁহার শ্রেষ্ঠ আছেন, কিন্তু উদ্দীপনায় তাঁহার তুল্য কেহ বঙ্গদেশে জন্মে নাই। তিনি বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতেন না, আবশ্যক বুঝিয়া পিঠের উপর জোরে কশাঘাত করিতেন। কখন শ্লেষে কখন ক্রোধে, কখন দর্পে, কখন তেজে যখন যা কিছু বলিতেন, মর্ম্মে মর্ম্মে স্পর্শ করিত, দেহ মন প্রাণ কাঁপাইয়া দিত। যেন মূর্ত্তিমান পবন ঝটিকাঘাতে পৃথিবী কাঁপাইতে সমুদ্যত। তাঁহার সম্বোধন তুরী ভেরীর ন্যায়—কোমল নহে। জলদ গম্ভীর ভীষণতায় উচ্ছ্বসিত জলপ্রপাতের ন্যায় ভাসাইয়া লইত।"

ডাক্তার রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর লিখিয়াছেন—

"ইংরাজাগমনের পূর্ব্বে বঙ্গীয় পদ্য-সাহিত্য-কাননে কোমল ব্রততীর অভাব ছিল না; উহাতে সুন্দর ফুল গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়াছিল। বামাকণ্ঠের ধ্বনির ন্যায় মৃদু মনোরম স্বরে কবিগণ প্রেম ও গার্হস্থ্য সুখ দুঃখের কথা গান করিয়া গিয়াছেন। কবিগণ যুদ্ধগীতি গাহিতে যাইয়া সমরাঙ্গনকে সংকীর্ত্তন ভূমিতে পরিণত করিয়াছেন, যুদ্ধযাত্রী রাক্ষস রাম নামাঙ্কিত দেহে নূপুর পায়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, রাক্ষসের কর্ত্তিত

মৃগু রাম নাম উচ্চারণ করিয়াছে। কখনও বা সমর ক্ষেত্রে দেবী ভগবতী আসিয়া ভক্ত বীরের শরীরে হাত বুলাইয়া দিয়াছেন, গলদশ্রুনেত্রে যোদ্ধার মুখোচ্চারিত চৌত্রিশ অক্ষর স্তোত্র শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া গিয়াছি, ভাবিয়াছি এত যুদ্ধক্ষেত্র নহে; কবি আমাদিগকে রণবাদ্যে ভুলাইয়া কোন দেবমন্দির বা পীঠস্থলের নিকট লইয়া আসিয়াছেন।

বঙ্গীয় কবিতা-কুঞ্জ এইরূপ মৃদু ও মনোরম ছিল, ইহা যেন সর্ব্বত্র রমণীকণ্ঠের ধ্বনিতে মুখরিত ছিল,—ইহার এক অভাব ছিল। এই কবিতা সাহিত্যে পৌরুষের অত্যন্ত অভাব দৃষ্ট হইত, ইহা যেন অতি মাত্রায় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, যেন করুণ-রসাত্মক একতন্ত্রী অনবরত একটা একঘেয়ে মধুর স্বর গাহিয়া গাহিয়া আমাদের মিষ্টত্ব সম্ভোগে কতকটা অবসাদ আনয়ন করিয়াছিল।

মধুসূদন ও হেমচন্দ্র, এই দুই কবি বাঙ্গালা কবিতার গীতির প্রবাহ ফিরাইয়া দিয়াছেন। করুণরসের একতন্ত্রীটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ইঁহারা গম্ভীর তানপুরার সঙ্গে তাঁহাদের ওজস্বী পুরুষোচিত কণ্ঠ মিলাইয়া বাঙ্গালীকে এক নূতন সঙ্গীত রসের রসিক করিয়া তুলিয়াছেন।"

পাশ্চাত্য কবিগণের ওজস্বিতা, বাঙ্গালায় আধুনিক কাব্য সাহিত্যে প্রবর্ত্তিত করিতে রঙ্গলাল, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র তিনজনেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র যতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, আর কেহই সেইরূপ পারেন নাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দ বীররসের সমধিক উপযোগী, কিন্তু মিত্রাক্ষরেও যে উদ্দীপনা চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে তাহা হেমচন্দ্র দেখাইয়া গিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি হেমচন্দ্রের কাব্য ভাবপ্রধান। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিরা সকলেই শব্দের ঝঙ্কার ও সুরের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখেন। হেমচন্দ্রের কবিতা অতি সরল ও মধুর হইলেও সময়ে সময়ে ভাবের উত্তেজনায় হেমচন্দ্র ছন্দ যতি সমস্ত বিস্মৃত হন, তাঁহার বক্তব্য বিসুবিয়সের অগ্নিস্রাবের ন্যায় বা নায়েগ্রার জল-প্রপাতের ন্যায় উদ্দাম শক্তিতে নির্গত হয়। হেমচন্দ্র প্রধানতঃ কবি, রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ সঙ্গীতকার। রবীন্দ্র-নাথ একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "কবিতা যেমন ভাবের ভাষা, সঙ্গীতও তেমনি ভাবের ভাষা। তবে কবিতা ভাব প্রকাশ সম্বন্ধে যতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে, সঙ্গীত ততখানি করে নাই। তাহার একটি প্রধান কারণ আছে শূন্যগর্ভ কথায় কোন আকর্ষণ নাই, না তাহার অর্থ

আছে, না তাহা তেমন মিঠা লাগে। কিন্তু ভাবশূন্য সুরের একটা আকর্ষণ আছে তাহা কাণে মিষ্ট শুনায়। এই জন্য ভাবের অভাব হইলেও একটা ইন্দ্রিয়সুখ তাহা হইতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত সঙ্গীতে ভাবের প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। উত্তরোত্তর আস্কারা পাইয়া সুর বিদ্রোহী হইয়া ভাবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এক কালে যে দাস ছিল, আর এক কালে সেই প্রভু হইয়াছে। মিষ্ট সুর শুনিবামাত্রই ভাল লাগে, সেই নিমিত্ত সঙ্গীতকে আর পরিশ্রম করিয়া ভাবাকর্ষণ করিতে হয় নাই—কিন্তু শুদ্ধ মাত্র কথায় যথেষ্ট মিষ্টতা নাই বলিয়া কবিতাকে প্রাণের দায়ে ভাবের চর্চ্চা করিতে হইয়াছে, সেই নিমিত্তই কবিতার এমন উন্নতি ও সঙ্গীতের এমন অবনতি।"

রবীন্দ্রনাথের আধুনিক সঙ্গীতে সুর বড় বেশী আধিপত্য বিস্তার করিতেছে' কেহ কেহ এইরূপ অনুযোগ করিয়া থাকেন।

ভাষার ওজস্বিতায় এবং ভাবের উচ্চতায় হেমচন্দ্রের দ্রববহ্নিসদৃশ গীতিকবিতানিচয় যে বঙ্গসাহিত্যে চিরদিন এক গৌরবময় উচ্চস্থান অধিকৃত করিয়া থাকিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার কাব্যসমূহে,

বিশেষতঃ দশমহাবিদ্যায়, তিনি যে জীবন সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন তাহাও যে চিরদিন তাঁহার দেশবাসীর জীবনযাত্রার সহায়ক হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যথার্থই বলিয়াছেন, "যাঁহারা দশমহাবিদ্যা পড়িয়াছেন ও বুঝিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মজিয়াছেন, কিন্তু পড়িয়া বুঝা একটু বিশেষ শিক্ষা সাপেক্ষ।" কিন্তু কেবল গীতিকাব্যরচয়িতা বলিয়া হেমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবেন তাহাই নহে, তিনি মাতৃভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রচয়িতা বলিয়া চিরদিন বাঙ্গালীর পূজা প্রাপ্ত হইবেন।

বাঙ্গালার একজন বিখ্যাত সমালোচক লিখিয়াছেন:—

"আমাদিগের বিবেচনায় মহাকাব্য রচনায় যে শক্তির পরীক্ষা ও পরিচয় হয়, খণ্ডকাব্য রচনায় তাহা কখনও হইতে পারে না। খণ্ডকাব্যের কবি আপনার ভাবে আপনি বিভোর, আত্মকথা লইয়াই ব্যস্ত। তাঁহার কবিতা দুঃখের গীত কি হর্ষের উচ্ছ্বাস। উহাতে শুদ্ধ কবি হৃদয়ই প্রতিবিম্বিত হয় কিন্তু মানব-হৃদয় রূপ অনন্ত জগতের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না। কবি প্রণয়ে নিরাশ হইয়া প্রীতির মর্ম্ম স্থলে আঘাত করেন,

প্রণয়ে প্রতারিত হইয়া মনুষ্য জাতিকেই শঠ, কপট, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর বলিয়া বাষ্প-গদ্‌গদ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তিরস্কার করিতে থাকেন। মহাকাব্যের কবি আত্মচিন্তারহিত, আত্মবিস্মৃত এবং আপনা হইতে দূরে অবস্থিত। তাঁহাকে তাঁহার কাব্যে আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহার সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, তাঁহার ঘৃণা, তাঁহার দ্বেষ, তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হয় এবং তিনি পরের প্রাণে আপনার প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, পরের হৃদয়কে আপনার করিয়া, একেবারে সর্ব্বময়ত্ব লাভে যত্নপর হন। তাঁহার ভাষা ভীমের জিহ্বায় বজ্রাভিঘাতের ন্যায় গর্জ্জন করে, দ্রৌপদীর অভিমান-পূর্ণ উদ্বেল অন্তরে ক্রোধ তরঙ্গের ন্যায় উথলিয়া উঠে, রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখে 'সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্' ইত্যাদি সদর্থযুক্ত হিতকথা স্মরণ করিতে থাকে, এবং প্রকৃতির সায়ন্তন শোভামুগ্ধ দিব্যাঙ্গনাদিগের স্ফুরিতাধরে শৈল প্রস্থবাহিনী স্রোতস্বিনীর ন্যায়, অথবা প্রেম কি বিরহের কণ্ঠধ্বনির ন্যায়, আপনার ভরেই ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে।"

আমরা 'বৃত্রসংহার' সমালোচনাকালে দেখিয়াছি, হেমচন্দ্র মহাকাব্য রচনায় যে প্রতিভা ও শক্তির পরিচয়

দিয়াছেন, মধুসূদনও সে শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অমর লেখনী এ পর্য্যন্ত মহাকাব্য রচনায় নিযুক্ত করেন নাই, ভবিষ্যতে যে করিবেন সে আশাও অল্প। *

হেমচন্দ্রের অনন্যসাধারণ প্রতিভা সম্বন্ধে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

কাব্যজগতে হেমচন্দ্র যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা নশ্বর নহে। তাহা অচল ভিত্তির উপর শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত অভ্রভেদী দেব মন্দিরের ন্যায় চিরকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া বহুদূর হইতে অসংখ্য যাত্রী আহ্বান

* শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন "রবীন্দ্রনাথ কখনই একটা মহাকাব্য রচনা করিতে পারেন নাই, কেবল 'বটন হোল' বা ফুলের ছোট তোড়া রচিয়াছেন। ছোট গল্পে এবং গীতি কবিতায় তাঁহার হাত বেশ খুলিয়াছিল। তাঁহার এক একটি কবিতা যেন মিছরীর বুকনী, অতি মধুর অতি নির্ম্মল, অতি সুন্দর। কিন্তু তিনি মিছরীর কুঁদা রচিতে পারেন নাই। তিনি রাজমিস্ত্রী, কেবল সুন্দর ক্রোটন মঞ্চ রচিয়াছেন, ভাবের মান মন্দির রচিতে পারেন নাই। তিনি সাহিত্যের architect বা নির্ম্মাণ কুশলী বড় কারিকর নহেন।"

করিবে এবং স্বীয় বিরাট আয়তন ও অতুল সৌন্দর্য্যগুণে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিবে। ক্ষণিক রুচিবিকার জনিত কুজ্ঝটিকা আসিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার অদ্ভুত কীর্ত্তি লোকনয়ন হইতে আবৃত করিতে পারে, কিন্তু পরক্ষণেই উহা উজ্জ্বলতর জ্যোতিতে স্নাত হইয়া দিগন্ত উদ্ভাসিত করিবে।

আমাদের বিশ্বাস যে বত্রিশ লক্ষ শিক্ষিত বঙ্গবাসীর শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ের উপর কাব্য সাম্রাজ্যের এই অমিত-পরাক্রম বিক্রমাদিত্য যে অপূর্ব্ব গৌরবময় সিংহাসন প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন,সেই সিংহাসন অধিকার মানসে যদি ভবিষ্যতে কেহ অগ্রসর হন, তবে হেমচন্দ্রর লক্ষ লক্ষ ভক্ত কণ্ঠ বিনিঃসৃত যশোগান শ্রবণান্তে তিনি আপন অনুপযুক্ততা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই সিংহাসন সম্মুখে সম্ভ্রমে নতজানু ও শ্রদ্ধায় অবনতশির হইবেন।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট।

প্রভাতকুমারের স্মৃতিকথা।

পঠদ্দশায় আমি পশ্চিমাঞ্চলে থাকিতাম। একবার কি একটা ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া, কবিবর হেমচন্দ্রকে দেখিবার জন্য হাইকোর্টে গিয়াছিলাম। শামলা মাথায় দিয়া, এজলাসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে দেখিয়া ছিলাম।

P.G. Hamerton তাঁহার "Intellectual Life" পুস্তকে লিখিয়াছেন, সকল দেশের ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায়, আঙুরের চাষ আরম্ভ হইবার পরে সে দেশের লোকের মধ্যে মস্তিষ্কশক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে। একথা Wine সম্বন্ধেই তিনি লিখিয়াছেন, Spirits (হুইস্কি ব্র্যাণ্ডি ইত্যাদি) সম্বন্ধে লেখেন নাই। ঐ গ্রন্থোক্ত মতবাদের উল্লেখ করিয়া আমি হেম বাবুকে পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত কি? হেমবাবু আমায় উত্তরে লিখিয়াছিলেন, "এদেশের লোকের Wines এবং Spirits এর মধ্যে

প্রভেদজ্ঞান নাই। সুতরাং আমার মত আমি ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি না।"

তাহার পর—সে বোধ হয় ১২৯৬ সালের কথা। আমি তখন কবিযশঃপ্রার্থী নব্য যুবক। মাসিক পত্রে মাঝে মাঝে আমার দুই একটা কবিতা বাহির হয়। রবীন্দ্র বাবুর সহিত আলাপ করিয়া লইয়াছি, মাঝে মাঝে ঠাকুরবাড়ীতে গিয়া তাঁহার এক আধ ঘণ্টা সময় নষ্ট করিয়া দিই। সে বৎসর চৈত্র সংক্রান্তির দিন, মাথায় এক খেয়াল উঠিল। একটা পাত্রে খানিকটা খুনখারাপী রঙ গুলিয়া, খান কতক পোষ্ট কার্ড তাহাতে বেশ করিয়া ভিজাইয়া লইলাম। তখন রঙ-বেরঙের প্রাইভেট পোষ্ট কার্ডও বাজারে পাওয়া যাইত না, এক পয়সার টিকিটও উঠে নাই। পোষ্ট কার্ডগুলি শুকাইলে, এক এক খানিতে এক একজন বড় সাহিত্যি-কের নাম ও ঠিকানা লিখিলাম, ভিতরে, নববর্ষের অভিবাদন সূচক দুই লাইন কবিতা—তাহা প্রত্যেক সাহিত্যিকের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে রচনা করিয়াছিলাম। একখানি লিখিলাম কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আভিবাদনিক কবিতায় তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যকুঞ্জের কোকিল বলিয়াছিলাম মনে হয় যেন। পোষ্ট কার্ড

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

গুলি বিকালে পোষ্ট করিয়া দিলাম—যাহাতে ১লা বৈশাখ সেগুলি যথাস্থানে পৌছায়।

আমি তখন আলিপুরে আমার মাতুলালয়ে থাকি। কয়েক মাস পরে, একদিন রবিবার প্রাতে, আমি, আমার মামাতো ভাই ও ভগিনীপতি, তিন বামুনে মিলিয়া হেমবাবুকে দেখিবার জন্য খিদিরপুর যাত্রা করিলাম। তৎপূর্ব্বে একদিন তাঁহার বাড়ীটি দেখিয়া আসিয়াছিলাম। সদর দরজায় ঢুকিয়া দপ্তরখানা, একজন কর্ম্মচারী বসিয়া কাজ করিতেছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হেমবাবু কি বাড়ী আছেন মশাই? দেখা করতে চাই।"

তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, তিনি উপরে আছেন।"

আমার কার্ড দিলাম। তিনি কাহাকেও দিয়া কার্ডখানি উপরে পাঠাইয়া দিলেন। দুই মিনিট পরেই আহ্বান আসিল—আমরা তিনজনে উপরে গেলাম। একটি প্রশস্ত কক্ষে, টেবিলের নিকট বসিয়া, হেমবাবু ব্রীফ দেখিতেছিলেন। গা খোলা, বেশ মোটা সোটা চেহারা। আমরা তিনজনে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

তিনি আদর করিয়া আমাদিগকে বসাইলেন।

পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার নাম শুনিয়া বলিলেন, "আপনিই কি ১লা বৈশাখ একখানি লাল পোষ্ট কার্ডে আমায় নববর্ষের অভিবাদন পাঠিয়েছিলেন?" তাঁহার স্মরণশক্তির নিদর্শনে আমরা বিস্মিত হইলাম।

বোধ হয় ১৫।২০ মিনিটের অধিক সময় আমরা সেখানে থাকি নাই। সকল কথাবার্তা মনে নাই। যাহা মনে আছে তাহা নিম্নে লিখিলাম।

আমি। "ওরে দুরাচার হিন্দুকুলাঙ্গার" ইত্যাদি কবিতায় বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আপনি যে মত প্রকাশ করেছিলেন, এখনও কি আপনার সেই মত আছে?

হেমবাবু। সেই মতই আছে, তবে কিছু modified হয়েছে।

আমি। নবীন সেন মহাশয়ের "কুরুক্ষেত্র" কাব্য সম্বন্ধে আপনার মত কি?

হেমবাবু। মহাভারতকে আধুনিক বেশে সজ্জিত করায় ওর গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয়েছে। সুলোচনা, হিন্দু পরিচ্ছদে একজন ইউরোপীয় 'নার্স' ছাড়া আর কি?

আমি। রবি বাবুর কবিতা আপনি পড়েন?

হেমবাবু। পড়ি; কিন্তু দেখ, ভাল বুঝতে পারি নে বাপু!

(পরে রবি বাবুর নিকট এই কথা আমি গল্প করিয়াছিলাম। শুনিয়া তিনি হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিলেন।)

আমি। লোকে বলে, এদেশে কবিতার বই বিকায় না; বিকায় কেবল উপন্যাস। এ সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা কি?

হেমবাবু। এতদিন বহি ছাপিয়ে আমি কিছুই পাই নি। কয়েক বৎসর হল আমায় ৬০০৲ টাকা দিবেন কড়ারে এক পাব্লিশার আমার গ্রন্থাবলী ছাপিয়েছিলেন, কিন্তু টাকা দিলেন না। বঙ্কিম বেশ টাকা পেতেন। ইদানী বই থেকে মাসে ৭৷৮ শত টাকা তাঁর আয় দাঁড়িয়েছিল।

আর কি কি কথা হইয়াছিল, তাহা এখন আর স্মরণ করিতে পারিতেছি না।

হেমচন্দ্র অন্ধ হইবার পর কাশীতে বাস করিতে লাগিলেন। সে সময় তাঁহাকে আমি এক পত্র লিখিয়া, তাঁহার জীবনচরিত লিখিবার বাসনা জ্ঞাপন করি, এবং তাহার উপকরণ সংগ্রহ সম্বন্ধে সাহায্য ও পরামর্শ

প্রার্থনা করি। উত্তরে হেম বাবু আমাকে লিখিয়াছিলেন, "প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় কাশীতে আমায় প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছেন যে আমার জীবন চরিত সম্বন্ধে কোন উপকরণ তিনি ভিন্ন আর কাহাকেও আমি দিব না, তিনিই আমার জীবনী লিখিবেন। সুতরাং আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম।"

তাহার পর আমি সিমলায় চলিয়া যাই। অন্ধাবস্থায় কাশী হইতে হেমবাবু খিদিরপুরের বাটীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া আমার পূর্ব্বোল্লিখিত ভাই ও ভগিনীপতি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি, হেম বাবুর অমন যে মোটা সোটা চেহারা ছিল, তাহার কিছুই আর তখন নাই, শীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। "আর কি দেখতে এসেছ বাবা!"—বলিতে বলিতে তাঁহার অন্ধ চক্ষু হইতে জল পড়িয়াছিল।

৩১শে বৈশাখ ১৩১০ } শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।